কবি যতীন্দ্রনাথ

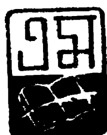
ও

আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়

* * *

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লিঃ :: কলিকাতা—১২



প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ—মাঘ, ১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

আমার অধ্যাপক

শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

প্রাক্-কথন

কবি হিসাবে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রতি আমি শ্রদ্ধাবান্। তাঁহার মৃত্যুর পরে সাময়িক-পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া তাঁহার সমগ্র কবিধর্ম এবং কবিকর্ম সম্বন্ধেই একখানি বই লিখিবার সঙ্কল্প মনে জাগে। তাহারই ফলে এই গ্রন্থের রচনা। যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মনে হইল আধুনিক বাঙলা কবিতার ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে,—সমসাময়িক কবিগণের কবিধর্মের আলোচনা ব্যতীত যতীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের এই বৈশিষ্ট্যকে ভাল করিয়া গ্রহণ করা যায় না। সেই জন্য আমি এই গ্রন্থে যতীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের কবিধর্ম সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবেশ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং নজরুল ইস্‌লামকে লইয়া আমাদের আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায় আরম্ভ। এখানে আধুনিক বাঙলা কবিতা বলিতে এবং তাহার প্রথম পর্যায় বলিতে আমি কি বুঝিয়াছি গ্রন্থমধ্যেই সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। গ্রন্থের প্রথমাংশে আমি যতীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার বিশিষ্ট কবিধর্মকে সবদিক্ হইতে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থের শেষাংশে আমি প্রথম পর্যায়ের আধুনিক বাঙলা-

কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সামগ্রিক পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

গ্রন্থের বহু অংশ ইহার পূর্বে 'দেশ', 'কথাসাহিত্য', 'মাসিক বসুমতী', 'জয়শ্রী', 'একক', 'হোমশিখা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—বেশি অংশই প্রকাশিত হইয়াছিল 'মসিক বসুমতী'তে পাঁচটি প্রবন্ধে। পত্র-সম্পাদকগণকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাইতেছি। গ্রন্থ রচনায় কবিশেখর শ্রীযুং কালিদাস রায় এবং কবিপুত্র অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীলকান্তি সেনের নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য লাভ করিয়াছি। গ্রন্থমধ্যে কবির যে দুইখানি প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার শ্রীযুত গজেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুত সুমথ ঘোষ এবং শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের এবং 'শনিবারের চিঠি'র শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাঁহাদের নিকট আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বন্ধুবর শ্রীযুত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাগ্রহে এবং সযত্নে গ্রন্থখানির প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইতি

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত



কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

॥ ১ ॥

কবিতা জীবন-মন্থন-জাত বিষামৃত। বিষটা সত্য না অমৃত সত্য—এ জিজ্ঞাসার স্পষ্ট জবাব নাই। আসল জিনিসটা হইল ঐ মন্থন—কবির সমগ্র সত্তার ভিতরে গভীরতম আলোড়ন। উপরিভাগের ঢেউবিলাসে যে ফেনা ভাসিয়া আসে, পাঠক-চিত্তের উপরিভাগ দিয়াই তাহা অমন করিয়া অবহেলায় ভাসিয়া যায়। তাই চাই আলোড়নের অমোঘতায় অথৈ তল হইতে উদ্ভূত কিছু —সে বিষ হোক--অমৃত হোক—যাহাকে আকণ্ঠ পান করিয়া আর একটি গভীর আলোড়নে সত্তার অতলতম দেশ পর্যন্ত অনুরণিত হইয়া ওঠে। সৌন্দর্য, মাধুর্য, বিশ্বাস, সুখ যেমন জাগাইয়া তুলিতে পারে এই আলোড়ন,—সংশয়, অবিশ্বাস, দুঃখ, বেদনা, অতৃপ্তিও তেমনিই জাগাইয়া তুলিতে পারে এই জীবনজোড়া আলোড়ন। এই শেষের অংশটাই সত্য হইয়া উঠিয়াছিল কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জীবনে। সেই মন্থন—সেই আলোড়ন ছিল দুর্বার—তাই তাঁহার কবি-মানসে যাহা ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহার কিছুই ফেন-বুদ্বুদের ন্যায় আমাদের চিত্তের উপরিভাগেই অবজ্ঞায় বিলীন হইয়া যাইতে পারে নাই, আমাদের চৈতন্যকে গভীর-ভাবে নাড়া দিয়া তাহা আমাদিগকে সদাজাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ঝিমাইতে ঝিমাইতে যতীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িবার উপায় নাই; হয় তীব্র আঘাতের প্রতিক্রিয়ায়

বিক্ষোভের বিরূপতায় তাহাকে সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, নতুবা সদাজাগ্রত চৈতন্য লইয়া দুই হাত ভরিয়া সেই তপ্ত বিষ পান করিয়া নিজে জ্বলিয়া জ্বলিয়া তীব্রানুভূতির শৈব মত্ততাকে উপভোগ করিতে হইবে।

যতীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'মরীচিকা'র (১৩১৭-১৩২৯) অন্তর্গত কবিতাগুলি যখন লিখিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা মধ্য-গগনে, এবং যতীন্দ্রনাথের কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য-সূচক কবিতাগুলি প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথেব জীবদ্দশায় লিখিত। কিন্তু একান্ত ভাবে রবীন্দ্র-যুগের কবি হইয়াও কবি-মানসের ধাতুতে এবং গঠনে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন একান্তভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী। অথচ যতীন্দ্রনাথের সহিত ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ফলে আমি নিজেই জানি পাঠক-হিসাবে তিনি কতখানি রবীন্দ্র-ভক্ত ছিলেন। একদিন একমুহূর্তের জন্যও তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথের সব লেখা তিনি অতি আগ্রহ-সহকারে পড়িতেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি তাঁহার জলদ-গম্ভীর স্বরে যখন আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন তখন সেই বহু-পরিচিত কবিতার ভিতরেও যেন নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করিতাম। কিন্তু আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা চারিদিক্ হইতে এমন করিয়া ঘেরা থাকা সত্ত্বেও অন্ততঃ কবির মধ্য-বয়স পর্যন্ত রবি-রশ্মি যতীন্দ্রনাথের চিত্তের পরিমণ্ডলে রঙ ধরাইতে গিয়া জাগাইয়াছে তীব্র প্রতিক্রিয়া—যে প্রতিক্রিয়ার অস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার বহু কবিতাতে—স্পষ্ট পরিচয়ও রহিয়াছে

অনেক কবিতায়। পরিণত বয়সে কবি তাঁহার একটি কবিতায় 'পাঁকাল-বন্দনা' ('সায়ম্‌') করিয়াছেন; তাহাতে দেখি—

পাঁকের মাঝে বসত্‌, তবু পাঁক লাগে না গায়ে তার,
ধরতে গেলে পিছ্‌লে চলে, ধন্য পাঁকাল নির্বিকার।
পাঁক-হারামি নয়কো এ তার, ভণ্ডামি তাব নয়কো এ,
পঙ্ক-আহার পঙ্ক-বিহার, চামড়া তবু চক্‌চকে।

* * *

গভীর জলের পাঁকালগুলি শুদ্ধ জগদ্ধিতায়
পঙ্কবিলাস ক'বে থাকেন, লেখা আছে গীতায়ও!
পাঁকাল নহে ভণ্ড ভাই।—
ছন্দে গাঁথা বন্দনাতে সেই কথাটা বল্‌তে চাই।

কবির এই পাঁকাল বন্দনা আশ্চর্য ভাবে কবির নিজের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কবি যতীন্দ্রনাথের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি-পুরুষ বাস করিতেন; সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তি-পুরুষের পরিচয় সমভাবে ছিল তাঁহার কাব্য-জীবনে এবং বাস্তব জীবনে। আমরা যাঁহারা জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম তাঁহাদের অনেক সময়ই মনে হইয়াছে, —আমাদের ভিতবে এই লোকটি একান্ত ভাবে 'একক'। স্ব-রূপে নির্বিকার এবং অনড় থাকিবার তাঁহার এমন একটা সহজাত প্রবণতা ও সামর্থ্য ছিল যে, তাঁহার কথা শুনিয়া যাওয়া ছাড়া আমরা কদাচিৎ নিজেদের মত যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাঁহার কাছে গ্রহণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। নিতান্ত ব্যক্তি-

গত হইলেও এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করিতেছি—যাহা তাঁহার বিশিষ্ট চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্যদ্যোতক। একখানি 'কথিকা' প্রকাশিত করিয়া যতীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করিলাম এব ডাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। কিছুদিন পরে তাঁহার একখানি চিঠি পাইলাম; লিখিয়াছেন,—'তোমার বই প্রথম পড়িয়া আমার তেমন ভাল লাগে নাই, কারণটি বোধ হয় এই ছিল যে, বইয়ের প্রথম পাতাটি খুলিয়াই দেখিয়াছিলাম, 'বইখানি তুমি আমার নামেই উৎসর্গ করিয়াছ। বইখানি তাই ক দিন ফেলিয়া রাখিলাম,—তাহার পরে আবার ভাল করিয়া পড়িলাম,—এইবারে আমার যাহা মনে হইয়াছে তাহা তোমাকে লিখিতেছি।' এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে কোনও দিন প্রচলিত সৌজন্য বা কারুণ্যের পন্থা অবলম্বন করিতে দেখি নাই—অতিশয় আত্ম-সচেতন ভাবেই স্ব-প্রতিষ্ঠ থাকিতে দেখিয়াছি। নিজের মতামত প্রকাশে তাঁহার কোনও দিন কোন সংশয় বা কুণ্ঠা ছিল না—ফল প্রিয় হইল কি অপ্রিয় হইল তাহা তিনি গ্রাহ্য করিতেন খুব কমই। সমাজ-জীবনেও তাই তাঁহাকে অনেকটা এইরূপ একক-পন্থীই দেখিয়াছি। ব্যবহারিক জীবনেই হোক, আর মৌলিক বিশ্বাসেই হোক, আপোষ-রফা জিনিসটিই যেন তাঁহার ধাত-বিরোধী ছিল।

কবিরা সাধারণতঃ সুন্দরের এবং মধুরের উপাসক—কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কবি প্রথমাবধিই রুদ্রের উপাসক। আসলে তিনি জীবনে এবং বহির্বিশ্বে সুন্দরকে এবং মধুরকে কোথাও যেন

খুঁজিয়াই পান নাই,—সর্বত্র ছড়ানো দেখিয়াছেন শুধু রুদ্রের বহ্নিজ্বালা। তাই বোধ হয় 'বহ্নিস্তুতি' দিয়াই তাঁহার কাব্যারম্ভ।

শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধরো মরীচিকা।
নিখিল বিশ্বে খুঁজে ফিরি' তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবিনশ্বর ভস্মে শান্তি লভে।
বিদ্যুতে তব ইঙ্গিত ঝলে, বজ্রে জাগিছে বাণী,
মানব-চিত্তে, আণবনৃত্যে তোমারি সে টানাটানি।
(বহ্নিস্তুতি, মরীচিকা)

এই 'বহ্নিস্তুতি'র ভিতর দিয়াই কবির জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহার চির-আবাধ্য দেবতা শ্মশানবাসী বিভূতিভূষণ শঙ্কর; তাই 'বহ্নিস্তুতি'তেই দেখি—

মিলন বিরহ, ভাব ও অভাব, যোগবিয়োগের কাজ
থেমে গিয়ে যবে এ-বিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ,
বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেই কালে,
তখনো কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাঁহারি ভালে?(ঐ)

ঔপনিষদিক বিশ্বাসে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা যেমন মনে করেন,—একমাত্র আনন্দ হইতেই এই ভূত-সকল জাত হয়, জাত জীব আনন্দের দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, আনন্দেই শেষ পর্যন্ত গমন করে এবং প্রবেশ করে,—তেমনি কবি যতীন্দ্র-নাথের বিশ্বাস ছিল, দুঃখের বহ্নিজ্বালাই হইল সকল সত্তার

আদি আলয়,—সেইখান হইতেই বিশ্বভুবনের এবং বিশ্বভুবনের ভিতরকার সকল প্রাণীর আগম—দুঃখের দাবদাহের দ্বারাই সকল বাঁচিয়া থাকা—এই বাঁচার যেখানে শেষ সেখানেই নিখিল শূন্য জুড়িয়া থাকিবে এক রুদ্রদেবতার অন্তহীন দুঃসহ বহ্নিজ্বালা। মানব-জীবনের এই যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখদাহন—কবির দৃষ্টিতে ইহার তিলমাত্রও আগন্তুক নহে, ইহা মায়াচ্ছন্ন জীবের ভ্রমজনিত কর্মভোগও নয়—ইহাই ব্যক্তি-জীবনের স্বরূপ, ইহাই বিশ্ব-জীবনেরও স্বরূপ। কবির প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'মরীচিকা' যেমন 'বহ্নিস্তুতি' দিয়া আরম্ভ হইয়াছে, দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ 'মরুশিখা'ও তেমনিই এই দুঃখের দেবতা শিবের স্তোত্র লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনে শিব কিন্তু অবিমিশ্র রুদ্র-দেবতা নহেন ; তিনি 'শঙ্কর' (শম্ = মঙ্গল), তিনি 'স্বর্গমোক্ষদাতা', তিনি 'কৃপাময়', 'সর্বদুঃখত্রাতা', 'চির-সুন্দর', 'শুভঙ্কর', 'ব্যথাহারী' ; তিনি 'চন্দ্রশেখর', 'পাপ-তাপহর', 'ভবকাণ্ডারী' ; কিন্তু কবি বলিতেছেন—

এ সব মন্ত্রে জাগে না হৃদয়, লাগে যেন পরিহাস ;
ব্যথার দেবতা কহ গো গোপন বেদনার ইতিহাস।
ভালে ছিল লিখা সুধাকর-টীকা, ফলে মিলে কালকূট ;
তরুণ ললাট ঘেরি বাঁধা কেন দুঃখের জটাজূট ?
সে জটার বাঁধে কুলুকুলু নাদে কাঁদে চির-ক্রন্দন,
চাপা বেদনার হাসি কাঁপে মুখে, ব্যথাতুর ত্রিনয়ন
নবনী-নিন্দী সুন্দর তনু—কামেরও কামনা-ঠাঁই,
কত অভিমানে লেপিলে কে জানে অজানা চিতার ছাই !

কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া প'রেছ হাড়ের মালা,
কটির কাপড় দিয়েছ ফেলিয়া,—না জানি সে কত জ্বালা!

সকল দেবতার মধ্যে একমাত্র শিবই 'মৃত্যুঞ্জয়' খ্যাতি লাভ করিয়াছেন কেন? তাহার কারণ অন্য সব দেবতা সুখের দেবতা, সুখ ত নিখিলের সত্য নয়, যাহা সত্য নয় তাহা ত শাশ্বত হইতে পারে না। নিখিলের সত্য শুধু দুঃখের বহ্নিজ্বালা—শিব সেই দুঃখের দেবতা হইয়াই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া রহিয়াছেন।

সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির-দুখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর,—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
বিরাট বক্ষে চিরনিরুপায় বিশ্বের ব্যথা বহি',
মাঝে মাঝে বুঝি ববম্ ববম্ জেগে ওঠে বিদ্রোহী!

সৃষ্টির মহাপ্রলয় কি? এই দুঃখের দেবতা যেদিন আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন না—দুঃখ-সিন্ধু যেদিন সহসা ছাপাইয়া উঠিয়া এই দেবতার ধৈর্যবেলা অতিক্রম করিয়া যায়—সেদিন জাগে রুদ্রের মহাতাণ্ডব—সেদিন রক্তরাঙা কল্লোলে তাঁহার ভীষণ বিষাণ-রব জাগিয়া ওঠে—'সহস্র-ফণ অনন্ত ফণী' লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া নৃত্যের ঘূর্ণাবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এইভাবে একদিন সুখের লক্ষ বাতি পলকে লেলিহ শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া এক ফুৎকারে পলকে আবার প্রলয়-অন্ধকার ঘনীভূত করিয়া তুলিবে; বিশ্বজোড়া সেই লণ্ডভণ্ডের মধ্যে একাকী জাগিয়া থাকিবে কে?

জাগিবে একক বিরাট দুঃখী রাখি দুঃখের মান,
মহাশব-বুকে মহাশিব সুখে জাগাবে মহাশ্মশান!
সেদিনের আশে পরম নিরাশে বাজা রে বগল বাজা,
—জয় শঙ্কর; প্রলয়ঙ্কর জয় দুঃখের রাজা!

সহজাত প্রবণতা এবং কবি-আদর্শে রবীন্দ্রনাথও শৈব ছিলেন; শুধু তিনি নিজেই শৈব ছিলেন না, তাঁহার 'কালের যাত্রা'র 'কবির দীক্ষা' কবিতাটিতে দেখি—

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা।

শিল্পের ধর্মে মঙ্গলের আদর্শকে স্বীকার করিয়া রবীন্দ্রনাথ যেমন শৈব ছিলেন, তেমনই দেখিতে পাই—হিন্দুধর্মের ভিতরকার দেবতার মধ্যে যে দেবতাটি ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার ভাবে বর্ণনায় উপমায় রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির মধ্যে দেখা দিয়াছেন তিনি হইলেন নটরাজ শিব। কিন্তু সে ধূর্জটির মুখখানি পার্বতীর মুখের হাসিতে মধুর হইয়া উঠিয়াছে; সেই 'শ্মশানবাসীর কলকল' গৌরীর ছলছল আঁখি এবং তাঁহার নিচোলাবরণের ঈষৎ কম্পনের দ্বারা কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের ভৈরব রুদ্র বৈশাখ রূপে 'ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল' বিস্তার করিয়া তপঃক্লিষ্ট মূর্তিতে ভয়াল বিষাণে ডাক দেন বটে—কিন্তু দাহনতপ্ত কৃচ্ছ্র তপস্যার পরে তিনি শান্তি পাঠ করেন—যে শান্তিবাণীর—

উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক্ নদী পার হ'য়ে, যাক্ চলি গ্রাম হ'তে গ্রামে,
পূর্ণ করি' মাঠ।

'রসের বর্ষণে' এই রুদ্রের 'তপের তাপের বাঁধন' কাটিয়া যায়। তপোমগ্ন যে রুদ্রের

চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিস্তব্ধ হ'য়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হ'য়ে আসে॥

তাঁহারই সম্বন্ধে পরক্ষণে কবি বলিয়াছেন

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ-দাহে।
ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণা-তন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি॥

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কবি, তিনি নটরাজ শিবের 'দক্ষিণ মুখ'টি কখনই দেখিতে পান নাই। নটরাজ শিবের সাক্ষাৎ তিনি মাত্র দু'একবারই পাইয়াছেন—তাহাও মানুষের জীবনের ভিতর দিয়া। একদিন সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন এক শীতের সন্ধ্যায় কলিকাতার কোন অখ্যাত গলিতে এক অশ্রুসজল, অস্থিচর্মসার, দরিদ্র বৃদ্ধ ডাবওয়ালার ভিতর দিয়া।

অঘ্রাণের শ্বাসরোধী ধূম্রগন্ধা শীতসন্ধ্যা সেদিন শহরের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে, হাঁপের টানের মত হিমাঙ্গ উত্তর বায়ু গলিটার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া ফুঁকিতেছিল; সেই শীতের সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে হাঁকিতেছিল এক বৃদ্ধ—'ডাব, কচি ডাব।' এই শীতের সন্ধ্যায় অন্নাভাবক্লিষ্ট এই গলিতে কে কিনিবে কচি ডাব? কিন্তু—

কাঁদিয়া কহিল বুড়া— 'তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা, মাজাটা করিব সোজা
ডাব তুমি নাও বা না নাও।'

তখন—

বাহিরিয়া দ্বার খুলি' দু'হাত ঝাঁকায় তুলি'
নামাইয়া দিনু তার ভার;
বসে' পড়ি' ভাঙা ধাপে থর থর বুড়া কাঁপে,
নগ্ন বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।

তখন এই বৃদ্ধ ডাবওয়ালা কবির চোখে ধরা দিল কি বেশে?—

দারুণ শীতের সাঁঝ হে আমার নটরাজ,
কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে?
অশ্রুর সাগরমন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ!
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে!
শীতাতপে দিগম্বর, দিশাহীন পথচর,
দেহ টলে ক্ষুধার নেশায়;

অন্তর-শ্মশানে চিতা সারি সারি নির্বাপিতা,
তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।
সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা, শিরায় ফণীর জ্বালা,
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।
কৃষ্ণা চতুর্দশী শেষে তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশিকলা।
(কচি ডাব—সায়ম্)

অগ্রাণের শীতের সন্ধ্যায় কচি ডাব মাথায় করিয়া হাড়সার এই বৃদ্ধাটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল কবির দুয়ারে হাড়ের মালা পরিহিত ভিখারী শিবের মতন,--তাহার কপোলের একবিন্দু স্বেদজলে ছিল গঙ্গার প্রবাহ, তাহার রুক্ষ ধূসর দেহে ছিল বিভূতির ভূষণ; মানুষের মধ্যে এই যে ক্ষুধাক্লিষ্ট, দুঃখজর্জর, অভিজাত-সুরগণ-পরিত্যক্ত ভিখারী—এ-ই ত দুঃখের রাজা—এ-ই ত নটরাজ শঙ্কর!

॥ ২ ॥

কবি যতীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা বাঙলা দেশে প্রথম পাইলাম একটি কবি যিনি কবি অথচ জীবনে বা বাহিরের বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে কোথাও কিছু সুন্দর বা মধুর দেখিলেন না। অন্ততঃ তাঁহার কাব্যজীবনের প্রথম দিকে ত একেবারেই না। তাঁহার প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'মরীচিকা'র কবিতা রচনার আরম্ভকাল ১৩১৭ সাল। তখন তাঁহার ভরা-যৌবন। কিন্তু

যে জিনিসটা অসীম কৌতুকপ্রদ তাহা এই, ঠিক ভরা যৌবনেই তাঁহার তীব্র বিষয়-বিরক্তি এবং ভস্ম-ভূষণ রুক্ষ জটা-ধারী বিদ্রোহী মূর্তি। জীবন-জিজ্ঞাসার কঠোর তপের তাপে ইন্দ্রিয়গুলিকে তিনি যৌবনেই যেন শুষ্ক করিয়া আত্ম-সংহরণ করিয়া লইয়াছিলেন, একটি সহজাত তীক্ষ্ণধ্যানবৃত্তির মধ্যে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেন আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। একদিকে অন্তবিহীন জীবন-জিজ্ঞাসার উদগ্রতা—অন্যদিকে সত্যকার সমাধান লাভের ব্যর্থতা এবং তাহারই সঙ্গে চারিদিক হইতে শুধু সত্য, শিব ও সুন্দরের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনার আয়োজন ও প্রলোভন যৌবনেই কবিকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। ফলে বিশ্ব-সংসারের 'রূপ'টাকে তিনি কোথাও উপভোগ করিতে পারিলেন না,—'বিরূপ'টাই তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিল। মরণের অন্ধকার নিশার বুকে তিনি জীবনের বিকশিত শতদলকে দেখিতে পারিলেন না, জীবন-বৃন্তে মরণের ফুলকেই সত্য করিয়া দেখিলেন।—

ক্ষণ-মিলনের অনলে তোদের পোড়াতে প্রাণের আশ
তারায় তারায় কাঁপে ইসারায় মরণের ভ্রূ-বিলাস।
জীবন-বৃন্তে মরণই ত ফুটে, কেন সন্দেহাকুল?
দীপালী রাতের জ্যোতিরুদ্যানে তোরা মরসুমী ফুল।

(দীপ-পতঙ্গ, মরুমায়া)

রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ প্রভৃতিকেই যাঁহারা উপভোগ করিয়া রসে মশগুল এবং এই জীবন ও জগৎ হইতে লব্ধ এই নিরন্তর আনন্দানুভূতির কৃতজ্ঞতায় যাঁহারা পরম সুন্দর এবং

পরম মধুরের স্তুতিবন্দনায় মুখর, সে-জাতীয় ভক্ত কবিগণের প্রতি কবি যতীন্দ্রনাথের রহিয়াছে বিশুদ্ধ বিদ্রূপাত্মক অনুকম্পা; কবি ইঁহাদের জন্য কৃপা প্রার্থনাই করিয়াছেন। কবি তাঁহাদিগকে কবি বলিয়াও স্বীকার করেন নাই, 'ছন্দানন্দ-স্বামী' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন :—

বন্ধু, তবু সে ছাড়ে নি যখন রূপ-রস-গন্ধামি,—
সে তোমারই অনুকম্পান্বিত ছন্দানন্দস্বামী।
ক্ষম শুধু ওর যৌবনভোর প্রেমের মুক্তি চাওয়া,—
গোলাপ-ধাঁধার পাকে-পাকে কাঁদা অন্ধ-গন্ধ-হাওয়া।
ক্ষমা কোরো ওর সন্ধ্যার ঘোর, দুরূহ আকিঞ্চন,—
মরীচিকা-পান-মত্ত মৃগের আলেয়া-আলিঙ্গন!
(দুঃখের কবি, মরুমায়া)

অসীম নীল আকাশের দিকে তাকাইয়াও কবি তাঁহার চিত্তে কোনও মুক্তির স্বাদ অনুভব করিতে পারেন নাই, সেখানেও—

চারি পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো-আঁধারের গরাদে বসানো অপার বিশ্ব-কারা!
এরি মাঝে ঘোরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা;
এরি মাঝে ওড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়িচাঁচা, কাদাখোঁচা:
পথ নাই পালাবার;
উঠে প'ড়ে ছুটে, ঘুরে ঘুরে লুটে, কেবল শ্রান্তি সার
যুগ যুগান্ত ভ্রমণক্লান্ত নিশ্চল কত গতি,
ফাঁকি খুঁজে কত মহা-তপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি!

তবু নাই কারো ছুটি।
অভ্যাস-ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি।
অসীমের কারাগার ;
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ার মিলে না পার।
(ঘুমের ঘোরে, মরীচিকা)

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই সৃষ্টি-প্রবাহের ভিতরে শুধু মুক্তিই দেখিয়াছেন, স্রষ্টারও মুক্তি—সৃষ্টিরও মুক্তি। অসীম অনন্ত কালের প্রতি মুহূর্তে আত্ম-সর্জনের মুক্তি - নিজের ভিতরে নিহিত অনন্ত সম্ভাবনার বহিঃপ্রকাশে মুক্তি ; আর সৃষ্ট যাহা কিছু তাহার মুক্তি নিরন্তর আত্ম-বিকাশে। সুতরাং সৃষ্টির সেই অখণ্ড ছন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেখানেই নিজেকে যুক্ত করিতে পারিয়াছেন সেইখানেই তিনি মুক্তির আনন্দ-লাভ করিয়াছেন। তত্ত্বশিরোমণির 'উক্তি-রাশির বিকিকিনি'কে অবলম্বন করিয়া যে মুক্তির আদর্শ, তাহাকে রবীন্দ্রনাথও উপহাস করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন,—"অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধন-মুক্ত হয়।" তিনি আরও পরিষ্কার আরও বিস্তৃত করিয়া এই মুক্তিতত্ত্ব বলিয়াছেন তাঁহার বহু কবিতায়। মূলেই তিনি নটরাজে'র 'চেলা' বনিয়া গিয়াছিলেন, এবং মহাকালের বিপুল নাচের ভিতর দিয়াই বাঁধন খোলার সাধন শিখিয়া লইয়াছিলেন। সেখানে তিনি নটরাজের মুক্তির দিক হইতে দেখিয়াছেন,

দেখচি, ও যা'র অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপনাতে যার আপনি আছে।
যে নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়
কবির বাণী অবাক্ মানি
তা'রি নাচের প্রসাদ যাচে।

এই ত গেল নটরাজের আত্ম-সর্জনের মুক্তি। অন্যদিকে সৃষ্ট যাহা কিছু সে-সকলের মুক্তিতত্ত্বও এই সৃষ্টি-প্রবাহেই।-

শুনাব রে আয় কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।
রবির মুক্তি দেখা না চেয়ে
আলোক জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে

উভয়ক্ষেত্রে এই এক দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এই দৃষ্টিতেই দেখিলেন নিখিল প্রবাহকে। ঠিক তাহার বিপরীত দৃষ্টিই দেখিতে পাই যতীন্দ্রনাথের। তিনি বলিতেছেন,—

তন্দ্রার ভারে পাশ ফিরে চোখে পড়িল পুনর্বার,
আলো-আঁধারের গরাদে বসানো অনন্ত কারাগার।
ওঠে চারিদিকে চিরবন্ধনে ক্রন্দন কোলাহল,
চরণে চরণে বাজে ঝন্ ঝন্ সুকঠিন শৃঙ্খল।
বন্ধু, কী তব ফন্দি,—
প্রহরে প্রহরে প্রহরায় ফিরে—তারাও কারারই বন্দী।
সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি।
খ্যাওড়া-তলায় ফুটে চেয়ে থাকে সখের সূর্যমুখী।
বন্ধু, আমারে খাটো পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখো,
এত বড় খাঁচা মুক্তির ধাঁচা—বিদ্রূপ কোরো নাকো।
(ঘুমের ঘোরে, মরীচিকা)

যতীন্দ্রনাথও নটরাজের নৃত্য দেখিযাছেন সৃষ্টির মধ্যে, কিন্তু সে নৃত্যে কোনও ছন্দ নাই, কোনও কিছুর সঙ্গে সে নাচের 'সংগৎ' নাই। নিরন্তর বিষের জ্বালায় তাঁহার প্রলয় নাচন। বিশ্বজোড়া বিরাট প্রাণের ব্যথায় ব্যথায় জীবনের সেই নটরাজ বেতালে বেসুরে শুধু তাথৈ তাথৈ নাচিয়া চলিয়াছেন—সুরে, সঙ্গতিতে, ছন্দে তাঁহার সেই নৃত্যকে ধরিতে বুঝিতে চেষ্টা করা শুধু বৃথা নয়, অসঙ্গতও।

সেই গুরু তোর সেই ভোলানাথ
বিষের জ্বালায় প্রলয় নাচে,—
তুই কিনা তার ছন্দ খুঁজিস
অসংগৎ তাণ্ডবের মাঝে!

অভিনয়ের মঞ্চ নয় এ,
নয় আঁখির প্রবঞ্চনা এ,
সুরবাহারের ঝঞ্চনায় এ
দেড়গজীদের নৃত্য নয়।
যে বিরাট আজ প্রাণের ব্যথায়
বেতাল পায়ে হানে তাথ্যয়,
সেই নটরাজ বিশ্বরাজের
নাট্যশালার ভৃত্য নয়।
(ত্রিযামা, ভাঙা বছর)

॥ ৩ ॥

যে পৌরুষের সচেতনতা লইয়া বাঙলা-কবিতার ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাহা আমাদের স্বভাবকোমল চিত্ত-ভূমিতে হয়ত প্রথমে কর্কশ অনুভূতিই জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কাব্যের চিরপ্রচলিত রাজপথ যে তাঁহার নহে কবি তাহা জানিতেন,—রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া জীবনের ইট-বাহির-করা নট-খটে পথে চলিবার গান যে তেমন প্রীতিপ্রদ নাও হইতে পারে, কবি এ-বিষয়েও সচেতন ছিলেন। কিন্তু এ বোধ তাঁহার ভিতরে কোনও দোলায়মান দুর্বলতার সৃষ্টি না করিয়া বরং স্বভাবধর্মে তাঁহাকে দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে :—

বঙ্গবাণীর সাথ
যেদিন অকস্মাৎ
কমল-দ্বীপান্তরে হ'য়ে গেল সাক্ষাৎ,

যেমনি ছুঁয়েছি পা,
চমকি উঠিল মা ;
কঠিন পরশে মা'র চরণে লাগিল ঘা।
কমল হ'তেও যার অধিক কোমল পাণি—
তারাই পূজিছে আর পূজিবে বঙ্গবাণী।
তা ব'লে কি কর্‌বি—
ওরে হতগর্বী ?
কিছুদিন ধ'রে হাতে লাগা তেল চর্বি।
পেতে নে রে শয্যা,
দেখে শেখ, চারদিকে ঘট্‌তেছে রোজ যা।
অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
মামুলি প্রেমের নেট-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শু'য়ে বল মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

(মন-কবি, মরীচিকা)

এইখানেই কবির বিদ্রোহ। নিজে যাহাকে মিথ্যা দেখিলাম, পরের চোখের ভিতর দিয়া তাহাকেই সত্য বলিয়া অনুভব করিতে হইবে ? বেদনার আগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া শুধু আনন্দের গান গাহিতে হইবে ? খাম-খেয়ালী সৃষ্টির উলট-পালটের সঙ্গে নিরন্তর প্রাণান্ত পাক খাইয়া গভীর প্রশান্তির নেশায় বুঁদ হইয়া থাকিতে হইবে এবং সব কিছুই আনন্দময় শান্তিময় বলিয়া প্রশস্তি-গানে মাতিয়া উঠিতে হইবে ? বিষে যখন দেহ-মন ছাইয়া যাইতেছে এবং সেই বিষজ্বালার ভিতর

দিয়া মৃত্যুকেই যখন একমাত্র সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি তখনও কি চোখ বুজিয়া মনে করিতে হইবে—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—শান্তংশিবমদ্বৈতম্? এই আপোষ-শর্তে কবি যোগ দিতে পারিলেন না,—ক্ষুব্ধ চিত্তে জাগিয়াছিল তাঁহার কঠোর আত্মজিজ্ঞাসা—

যদিও এ জগতের কল্‌জেটা জ্বলছে,
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে;
তুইও তাই বল্‌বি,
বাঁধাপথে চল্‌বি—
আগে পিছে আগাগোড়া আপনাকে ছল্‌বি?

(মন-কবি, মরীচিকা)

উহা তিনি পারিলেন না বলিয়াই 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া'র পথ তিনি বাছিয়া লইলেন। সেই বলিষ্ঠ একক-বৃত্তি—কাব্যের ক্ষেত্রেও—বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রেও! কোমল শতদলে তাঁহার বাণী-বন্দনা আর সম্ভব হইল না; কঠিন-কণ্টকদেহ রুদ্রাক্ষের মালা জপ করিয়া তিনি ব্যথার রাজা পাগলা-ভোলারই ভক্ত বনিয়া গেলেন। তাঁহার আদর্শ দেবতা মহাদেবেরও দেব-সমাজে ঠাঁই ছিল না—একাকী তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন শ্মশানে—ভক্তেরও তৎকালীন কবি-সমাজের সঙ্গে খুব একটা ব্যাপক অন্তরঙ্গতা ছিল না, আপন গৃহে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাস জীবনে চলিত তাঁহার একক সাধনা। নিঃসঙ্গ ভোলানাথ যেমন ভাঙের নেশায় সকল অসহ জ্বালা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন, ভক্তও তেমনি ঘুমের নেশায় চোখ বুজিয়া ভুলের

নেশায় মত্ত থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; আবার অসহ জ্বালা দেবতা যেমন ডমরুনাদের সঙ্গে ববম্ ববম্ রবে ধ্বনি করিয় উঠিয়াছেন—ভক্তও তেমনি আপন চিত্ত-বিলোড়নে যে কাব্য ধ্বনি করিয়াছেন তাহার সহিত ক্ষেপা মহাদেবের ডমরুনা এবং ববম্ ধ্বনির রেশ মিলিয়া গিয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ যে যুগে কবিতা রচনার জন্য প্রথম লেখনী ধার করিয়াছিলেন বাঙলা কাব্য-কবিতার ইতিহাসে সেটা ছি আসল রোমান্টিক্ যুগ। বিহারীলাল যে বিশুদ্ধ রোমান্টিক্ বাদের পত্তন করিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথে উহার প্রতিষ্ঠা যতীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার বলে রোমান্টিক্-বাদ তখ বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যতীন্দ্রনাথের মানসিক সংগঠন কিন্তু রোমান্টিক-বাদকে গ্রহণে অনুকূল ছিল না ; তথাপি রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে শুধু স করিতে পারিতেন তাহাই নয়, তাঁহার সমস্ত রোমান্টিক্ এব মিস্টিক্ ভঙ্গি সত্ত্বেও তাঁহাকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন,— কার প্রাণহীন ভঙ্গিসর্বস্বতা সেখানে কবিতার কণ্ঠ রোধ করে নাই কিন্তু কবি চক্ষু কর্ণ নাসিকাকে সক্রিয় করিয়া যখন আশে পাশের দিকে লক্ষ্য করিলেন তখন বহুদিনের রাখি মালে একটা পচা গ্যাঁজলা-গন্ধ এবং বর্ণহীন বিস্বাদ তাঁহার মনবে বিরূপতায় বিষাক্ত করিয়া তুলিল।*

*কবি যতীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'মরীচিকা' প্রকাশিত হইবা পূর্বে 'যমুনা' পত্রিকায় এই কবিতা-গ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিজ্ঞাপ

তিনি কবি-সমাজে একটা দুর্বার প্রবণতা লক্ষ্য করিতে পারিলেন,—কল্পনার হাল্কা পাখায় ভর করিয়া সকলেই মাটির পৃথিবী ছাড়িয়া শূন্যের অজানায় উড়িয়া চলিতে উদ্‌গ্রীব; উড়িয়া কোথায় পৌঁছিবে কেহ জানে না, সকলেই সুদূরের পিয়াসী—অজানার অভিসারিকা! যতীন্দ্রনাথ নিজে যে শুধু এই স্রোতে গা ভাসাইতে পারিলেন না তাহা নয়, তিনি সাধারণ ভাবেই বলিয়া উঠিলেন,—

হির হইয়াছিল। ৺হেমন্ত সরকার মহাশয় তাঁহার একটি প্রবন্ধে এই াপনটিকে যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ্দ্ধৃতিটি 'হোমশিখা' পত্রিকার ১৩৬১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা হইতে ্হীত।

"কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় কাব্য-কালান্তক রস াবিষ্কার করিয়া 'যমুনা'য় কিছুকাল আগে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। হাতে 'নতুন কবিতা, পুরাতন কবিতা, ঘুষঘুষে কবিতা, প্রবল কম্প বিতা, পালা কবিতা, বিষম কবিতা, ধোঁয়া ধোঁয়া কবিতা, ছোঁয়াচে বিতা, চাকরী চাপা কবিতা' প্রভৃতি যেরূপ কবিতা-রোগই হউক না ্ন, নিশ্চয় ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। 'বুকজ্বালা, হু হু করা, চোখে ঝাপসা দেখা, প্রাণ কেমন করা, রাত্রে নিদ্রা না াসা, পেট ফাঁপা, মাঝে মাঝে হাত শুড় শুড় করা' ইত্যাদি উপসর্গ এক টকা সেবনেই উপশমিত হইবে। বিশেষ চেষ্টায় বেতস, বিছুটি প্রভৃতি ্স্রোক্ত কয়েকটি দেশীয় গাছগাছড়ায় এই মহৌষধ প্রস্তুত। পথ্যের ান ধরাকাট নাই। কেবল ঔষধ ব্যবহারের সময় ও পরেও একমাস জ্যোৎস্না লাগান, ফুল শোঁকা এবং মাসিকের সম্পাদকের সহিত পত্র-বিনিময় নিষিদ্ধ।"

ওগো কল্পনা, সাথে সাথে চল—হালকা তোমার পাখা,
কানে কানে তারে ব'লে দাও, ওরে! সামনে সকলি ফাঁকা
ধীরে গো বন্ধু, ধীরে!
দেহটা পিছিয়ে প'ড়ে গেল কিনা—দেখা ভালো ফিরে ফিরে
(ঘুমের ঘোরে, ষষ্ঠ ঝোঁকে, মরীচিকা)

এখানে দেখিতেছি দুইটি সাবধানবাণী; প্রথমতঃ কল্পনা: ভর করিয়া কবিরা যে অজানার অভিসারে রওনা হইয়াছে সেই অজানাটি হইল নিরেট ভুয়া; আর দ্বিতীয়তঃ অত লঘ চালে চলিবার কালে গুরুভার দেহটি পিছাইয়া পড়িল কিন সে জিনিসটি সম্বন্ধেও একটু অবহিত হইয়া উঠিতে হইবে। এ দুইটি বাণীই বিংশ শতাব্দীর দুইটি মোক্ষম বাণী। একটিতে বল হইল, কবিতা লিখিতে হইলে জানাশুনা এই মাটির পৃথিবীটি সহিত সম্পূর্ণভাবে সংস্পর্শবিহীন হইয়া উঠিবার কোন প্রয়োজন নাই; দ্বিতীয়টিতে বলা হইল, কবিতার মধ্য হইতে দেহটিকে—রূঢ় বাস্তব সত্যটাকে—একেবারে দূরীকৃত করিয় দিবার চেষ্টাও সাধু চেষ্টা নয়। আদিকাল হইতে কবিতার ক্ষেে কল্পনা বারোমাস লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস খাটিয়া খাটি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; শ্রান্তি-বিনোদনের পথ বিশ্রান্তিে নহে, ভিন্ন পথের সতেজ সক্রিয়তায়। তাই কবির আহ্বান,—

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস!
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি!

নব ফরমাস দেই তোমা, সাজো কল্‌কের পর কল্‌কে,
বুকের রক্ত ছল্‌কে উঠুক, হাড়গুলো যাক্‌ পল্‌কে !

* * * *

ঢেলে সাজো, সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা সব কালো !
(ঘুমের ঘোরে, ষষ্ঠ ঝোঁকে, মরীচিকা)

শুধু 'অলসরসে আবেশ বশে' পুরাতনের জের টানিয়া চলিবার কোনও উৎসাহ ছিল না যতীন্দ্রনাথের মধ্যে। তীব্রানুভূতির তীক্ষ্ণ আস্বাদন চাই, তাহা তিক্ত হোক আর ঝাঁঝালোই হোক ; এই জন্য প্রবণতা তাঁহার নূতন সৃষ্টি-পথে—সেইখানেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়। চিরাচরিতের এই একটানা বাঁধা পথকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উপলবন্ধুর করিয়া লইতেই তাঁহার আগ্রহ। সেই আগ্রহ লইয়াই তিনি বলিয়াছেন,—

এর কি উপায় কিছু নাই ?
এই যে ফাল্গুন এলে আচম্‌কা খুশি হ'য়ে ওঠা ?
ক্ষুদ্রপক্ষ হুলবান্‌ কীটের সমান
ফুল হ'তে ফুলান্তরে ছোটা ?
হাজার হাজার বর্ষ ধরি'
একই রস ভিন্ন ভাঁড়ে ভরি'
এই যে চলেছে বিতরণ,—
যুগে যুগে ভবজন যাহা
অগত্যা করিয়া চলে গলাধঃকরণ

কায়ক্লান্তিহর তাড়ির মতন,—
তাই নিয়ে ভাঙা ভাঁড়ে, ঘুরে মরা দ্বারে দ্বারে,—
একি অভিশাপ! একি নির্যাতন!
(দোলে দুলে উঠি, ত্রিযামা)

যাহা ভাল মন্দ কোনও অনুভূতিই জাগায় না, অভ্যাস-বশে রীতি-প্রথার আনুগত্যে তাহারই অনুবর্তন যে জীবনে একটা নির্যাতনেরই সামিল। জীবনে আজ নূতন বোধ—নূতন স্বাদ চাই। তাই—

তবু আজ ক্ষম প্রিয়তম!
শ্লথছিপি বোতলের সোডাজল সম
বিস্বাদ জীবন মম—ঢেলে ফেলে দাও।
আশ্বাস দিও না আর ফিরিবে না স্বাদ তার
মিশাও যদি বা বন্ধু মামুলি সুধাও। (ঐ)

এই মামুলি কাব্যদৃষ্টি যে আমাদের জীবনকে শুধু বিবর্ণ এবং বিস্বাদ করিয়া তোলে তাহাই নহে, সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে—মানুষকে তাহার সত্যকার সুখদুঃখের জীবনকে দেখিতেই দেয় না। কতগুলি চিরাচরিত সংস্কার ও ভাবানুষঙ্গ. কতগুলি বাঁধাধরা বুলিই জীবনের রক্ততাজা কথাগুলিকে ছাপিয়া রাখে। এই কথাটির সুন্দর প্রকাশ দেখিতে পাই কবির 'নবান্ন' (মরু-মায়া) কবিতাটির মধ্যে। নবান্নের দিনে গরিব চাষীর বাড়িতে কুটুম আসিয়াছে,—ঘরে কিন্তু একটিও চা'ল নাই। এই চা'ল না

থাকিবার পিছনে চাষীজীবনের বড় একটি করুণ ইতিহাস রহিয়াছে, নবান্নের দিনে আগত বন্ধুর কাছে সেই করুণ ইতিহাসই সে বলিতেছিল। তাহার ছোট খাটো একটু ভুঁইও ছিল—তাহাতে সে যথাসাধ্য যত্ন চেষ্টায় ধানও বপন করিয়াছিল। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন—আশা-আতঙ্কে কোথা দিয়া যে কৃষাণের দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে নিজেই সে খেয়াল করিতে পারে নাই। যেদিন প্লাবনের দুর্যোগ আসিয়া দেখা দিয়াছিল সেদিনও

দুর্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল ক'রে কভু সেচিনু পাণ্ডু চারা।

আশ্বিন গিয়া কার্ত্তিক মাস আসিল—কৃষাণের মনের আশা-আনন্দের সে আবার নূতন পর্যায়—

কার্ত্তিকে দেখি চারিদিকে,—একি! এবার ত নহে ফাঁকি!
পাঁচরঙা ধানে ছক্ কাটা মাঠ জুড়ায় চাষার আঁখি।

তারপর আবার—

অগ্রাণে থাকে থাকে
কাটিয়া তোলায় খামারে গোলায় যাহার যেমন পাকে।
আমি রোজ ভাবি—ফসলটা নাবী, আরও ক'টা দিন যাক্,
ভরা অগ্রাণে ঘটে না-ত কোনো দৈব দুর্বিপাক।
মরাই সারাই শেষ করে, সবে খামারে দিইছি হাত্,
কালকে হঠাৎ,—
বন্ধু, দোহাই, তুলোনাকো হাই, হইনু অপ্রগল্ভ,—
ক্ষমা করো সখা,—বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।

এইখানেই কবি যতীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক কঠোর অভিযোগ বাঙলার কবি-সমাজ এবং পাঠক-সমাজ উভয়েরই বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগকেই কাব্য-কৌশলে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া বিদ্রূপ-ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিয়াছেন পরের পংক্তিগুলিতে—

তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূর দূরে,
বাঁকানদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জরির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে নেমে আসে মানস-মরাল শ্রেণী,
যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল বেণী।

এই দৃষ্টিতেই বাঙলা দেশের কবি ও পাঠক-সমাজ এখনও অভ্যস্ত এবং আসক্ত! বাঙলার মাঠের বুকে গিয়া সেই প্রভাত-আলোকে দূর দূরে চাহিয়া থাকা, সেই বাঁকানদীর জরির ডুরে-জড়িত প্রেম-বিলাস—সেই আকাশের মরাল শ্রেণী—সেই দিক্‌বালার এলায়িত আঁচল ও বেণী! কবি যতীন্দ্রনাথ বলিবেন, সেই মান্ধাতার আমল হইতে ত আমরা এই এক দেখাই দেখিয়া আসিলাম, সেই দৃষ্টির আর কি কোনও দিন এতটুকুও পরিবর্তন ঘটিবে না? বাঙলা দেশে মাঠের বুকে দাঁড়াইয়াও চিরদিন দূর-দূরকেই দেখিলাম—দিগন্তের বাঁকা নদী এবং আকাশের মরালকেই দেখিলাম (মরাল শ্রেণী আকাশে হয়ত কোনও দিন চোখে দেখিও নাই, সুদূর অতীত হইতে তাহার কথা শুধু শুনিয়াই আসিলাম এবং শুধুমাত্র শব্দজন্য-জ্ঞানেই মশগুল হইয়া রহিলাম), কিন্তু নিকটকে চোখে দেখিয়াও দেখিলাম না, এই মাঠের বুকে সবুজ-সতেজ প্রাণ সঞ্চার

করিয়া দিতেছে যে চাষী তাহার সকল রৌদ্র-বৃষ্টি-সহা পেশী বহুল বাহুর বলে ও মনে আশা-উৎসাহে, সেই মানুষটিকে কোনও দিনই দেখিলাম না,—তাহার সুখ-দুঃখের তুচ্ছ গল্প শুনিতে চিরদিনই আমরা হাই তুলিয়া যাইব? কবির মনে হইয়াছে, আমাদের সাহিত্য-জীবনে—আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা মস্তবড় একটা অভিশাপ।

জ্যোৎস্নাময়ী ফাল্গুনী রজনী কবি-কুলের মৌতাত বৃদ্ধির একটি সনাতন সামগ্রী। সেই মৌতাত আবার সমধিক বৃদ্ধি পায় জ্যোৎস্নার শুভ্র কিরণের সঙ্গে যদি রজনীগন্ধার শুভ্র বর্ণ ও স্নিগ্ধ গন্ধ মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার মদির আবেশে বিহ্বল হইয়াই জাগিয়া ওঠে হোরির উত্তেজনা এবং আনন্দ। কিন্তু এ-কথাটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে মানুষের জীবনের দ্বাপর যুগটা এবং কলি-যুগটা এক নয় এবং এই যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হোরি খেলার রূপও বদলাইয়া যায়। প্রথাসিদ্ধ দৃষ্টি বাধা দেয় এই যুগপরিবর্তন-জাত জীবন-ধারা-পরিবর্তনকে গ্রহণ করিতে। সেই জ্যোৎস্নাময়ী ফাল্গুনী রজনী দ্বাপরে সুখ-বৃন্দাবনে যাহা ছিল, কলির বহিরাকাশে এবং ভাগ্যাকাশে ঠিক তাহা নাই। সেই একই—

ফাল্গুনী রজনী
রজনী জ্যোৎস্নাময়ী,
জ্যোৎস্না ভরা রজনীগন্ধায়
মৌমাছি ঢুলে মধুতন্দ্রায়। (ফাল্গুনী রজনী, ত্রিযামা)

কিন্তু কলিযুগের বিংশ শতাব্দীতে ঠিক বাছিয়া এই জ্যোৎস্না-আলোকিত ফাল্গুনী রজনীতেই—

বোমারু বিমান হঠাৎ হল্লা করে,
সামারু কামান অমনি পাল্লা ধরে,
জান্ বাঁচাইতে জ্যান্ত মানুষ
কবরে কবরে ঢুকিয়া পড়ে,—
রজনীগন্ধা শুভ্র ঝাণ্ডা তুলিয়া ধরে। (ঐ)

এই ফাল্গুনী জ্যোৎস্নায় জীবনের যে হোরিখেলার মত্ততা তাহার এক দিকে যেমন—

কদম শাখে বাঁধা হিন্দোল তুলচে,
সখীরা সখার পানে পিচকারী তুলচে,
ছুঁড়ে মারে কুম্‌কুম্,
রুম রুম ঝুম ঝুম,
ফাগ মেখে চেনা দায়—
কে পড়েছে কার গায়? (ঐ)

অপর দিকে তেমনই—

কবরে ঢুকিয়া পাঁকের উপর পড়ি'
দেহ আর প্রাণ শুয়ে আছে জড়াজড়ি,—
(ফাল্গুনী রজনী, ত্রিযামা)

আজিকার দিনে জীবনের হোরিখেলায় এই দুইটি দিকই সত্য এবং সেই সত্যকে পূরাপুরি ভাবে গ্রহণ করিবার মত

বীর্যবান্ হইয়া উঠিতে হইবে কবিকেও। আজ নিম্নের জলে-স্থলে —'কালিন্দী তটনীপে বৃন্দাবনে' যেমন হোরিখেলা, তেমনই আবার উদার নীল গগনে 'জঙ্গী বিমানচারী মেশিন গ্যানে' এই রঙে-ভরা পিচকারী চলিতেছে। এই যে জলেস্থলে আকাশে হোরিখেলার মাতন তাহার মধ্যে এই সত্য স্বীকার করিতেই হইবে,—

যেথা, বুকে বুকে ধমনী ও শিরার তরঙ্গে
জীবন খেলছে হোরি মরণের সঙ্গে,
হৃদয়ের পিচকারী প্রতি হৃৎকম্পে
জীবনের হাতে উঠে লাল রঙে রাঙায়ে
মরণ ফিরায়ে মারে নীল রঙে নীলায়ে,
হৃদয়ের পাম্পে প্রতি হৃৎকম্পে
[illegible] আমরণ চলছে এ লীলা এ,—
চলছে হোরি, চির চলছে হোরি। (ঐ)

চারিদিকের জীবনের এত হোরিখেলার মধ্যে মন হয়ত শ্রান্ত এবং বিভ্রান্ত হইয়া ওঠে, হয়ত—

মথুরা বৃন্দাবন রাশিয়া ও চায়না
ঘুরে এসে কয় মন—এ সব সে চায় না।
আকাশের তারা ডাকে—আয় আয় আয় না;
কিসের হোরি, মিছে কিসের হোরি?
(ফাল্গুনী রজনী, ত্রিযামা)

আমরা তখন এই রূঢ় জীবনের কঠিন জিজ্ঞাসার ভিতর হইতে মনকে ঊর্ধ্বে উড়াইয়া দিই; সে মন বৃন্দাবন ছাড়াইয়া

যায়—জঙ্গী পতঙ্গদল ছাড়াইয়া যায়, চকোর-চন্দ্র, বিরহ-মিলনানন্দ সকল ছাড়াইয়া চলিয়া যায় সেই ঊর্ধ্বে উদাসীন নক্ষত্রমণ্ডলীর দেশে ; কিন্তু সেখানে গেলেই বা কি হইবে—এই গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার হাত হইতে মুক্তি কোথায় ? সেই ঊর্ধ্বে নক্ষত্রমণ্ডলের দেশেও—

বসিয়াছে ব্যোমে, সপ্তর্ষির মহা জিজ্ঞাসা-সভা—
'নভোমন্থন ঘূর্ণাবর্তে ওই কি ধ্রুব ?'
অসীমের সেই নিত্য প্রশ্নে চিত্ত ছুটিয়া চলে
আপন গানের দোটানা দু'খানি ডানার ভরে।

কাব্য-কবিতা জীবনের ক্ষেত্রে প্রাণপ্রদ এবং প্রাণ-বিধারক রস, ইহা কখনও বিলাস-ভোগ্য বস্তু নহে। যেখানেই বিলাস-ভোগ্যত্বে ইহার পর্যবসান সেইখানেই ইহার মৃত্যু। এই সত্যটিই চমৎকার রূপ লাভ করিয়াছে কবির 'ত্রিযামা'র মধ্যে 'কবিজাতক কথা' নামে একটি কবিতায়। অতি প্রাচীনকালের একটি অর্ধবিস্মৃত জাতক-গল্পের ভঙ্গিতে বিষয়বস্তুটিকে উপস্থাপিত করিয়া কবি শেষে গিয়া বলিয়াছেন,—'শপথ ক'রে বলছি তবু সত্য আছে মূলে।' কবিতাটিতে দেখিতে পাই, চন্দায়ুধ নামে ছিলেন এক কবি, আর ছন্দায়তী নামে ছিল তাঁহার প্রিয়া। পরস্পরের অনুরাগে ইহারা—

চম্পাবনে সঙ্গোপনে
মিলত দু'জনে,
জ্যোৎস্না-নিবিড় মৃদুলা-তীর
কোকিল-কূজনে,

চন্দায়ুধের বীণার তালে
ছন্দায়তী নাচে,
বনের শিখী নৃত্য ভুলে
পেখম তুলে আছে,
বীণার সুরে যেমন তনু
তরঙ্গিয়া উঠে
অশোক চাঁপা কমল-কলি,
অঙ্গ ভরি' ফুটে !

সমাজ-বন্ধনের বাইরে স্বাধীনভাবে নূপুর শিঞ্জন করিয়া বেড়াইত ছন্দায়তী—তাহার কাজ ছিল নৃত্যের ছন্দে ছন্দে বনের ফুল ফুটান।—

ঝন রন ঝন্---
শিরীষ কাঞ্চন,
ঝমক্ ঝম্ ঝম্—
বন্‌কেয়া কদম,
ছনক্ ছন্ ধা—
রজনীগন্ধা,
রিনিক্ রিন্ রুনুক্ রুন্
ঝুনুক্ ঝুন্ ঝুঁই—
শিউলি জাঁতি বকুল পাঁতি
চামেলি বেলী জুঁই।

এদিকে কাঞ্চীরাজ সর্বদমন গিয়াছিলেন বনে মৃগয়ায়—চম্পাবনে এই কবি ও কবিপ্রিয়া ছন্দায়তীকে দেখিয়া তিনি

মুগ্ধ হইলেন, বন হইতে তাহাদিগকে লইয়া আসিলেন তাঁহার রাজসভায়। রাজসভায় কবি চন্দায়ুধ বীণা বাজায় আর ছন্দায়তী নাচে। কিছু দিনের ভিতরেই—

লোকের মুখে দেশবিদেশে
বার্তা গেল রটি'
কাঞ্চীপুরের কবিপ্রিয়া
কাঞ্চীরাজের নটী।

অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কবিতার কাজ হইল বিলাসী রাজসভায় নিত্য নূতন মনোহর লাস্যে রাজার ভোগাকাঙ্ক্ষার একটি তির্যক্ চরিতার্থতা সাধন করা। যথার্থ কবি—যে কবিতাকে তাহার সর্বদেহমন দিয়া ভালবাসে—তাহার পক্ষে কবিতার এই অসম্মান সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে—নিজের প্রিয়াকে সে কিছুতেই রাজনটী হইতে দিতে পারে না। নিজের বীণাকে কবি তখন বদলাইয়া লয়—শুধু ভোগবর্ধক বিলাসবর্ধক মধুর ঝঙ্কারে ভরা ছিল যে বীণা তাহাতে কবি জীবনের বিষ মিশাইয়া লইল—বীণার সুরে যখন জীবনের মদিরার পরিবর্তে তীব্র হলাহল মিশিয়া গেল তখন তাহার স্পর্শে 'ছন্দায়তী লুটিয়ে প'ল ভুজঙ্গ রাগের সনে।' যতীন্দ্রনাথ নিজে কি এই চন্দায়ুধ কবি? তিনি কি গভীর অপমান এবং বেদনার সঙ্গে অনুভব করিয়াছিলেন যে কবিপ্রিয়া কবিতা বহুদিন হইতে কেবলমাত্র মদিরতায় মানুষকে বিহ্বল করিয়া রাখিতেছে; তাই কি 'মিল্‌লো কি না কবির বীণায় গুপ্তবিষের থলি!' এবং জীবনের সেই বিষের স্পর্শে 'ছন্দায়তী'কে নিজে ঢলাইয়া দিয়া

কবিতাকে সর্ব অসম্মানের হাত হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন ?

॥ ৪ ॥

বাঙলা দেশের কবি হইয়া বাঙলার শ্যামল স্নিগ্ধতা যাঁহার চোখে একটুকুও রঙ ধরাইয়া দিল না এমন কবি এই প্রথম দেখা গেল যতীন্দ্রনাথের মধ্যে। এই সুজলা-সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা বাঙলা মায়ের বুকে বসিয়াও এই কবি শুধু গোবি-সাহারার ভীষণা মরুমূর্তির ছবি দেখিলেন—বারিহীন দিগন্তবিস্তৃত তপ্তবালুকার অন্তহীন জ্বালা অনুভব করিলেন। তিনি দেখিতেছেন—

চারিদিকে মোর শ্যামলগন্ধ গীতি
কত হাসিমুখ কত স্নেহ কত প্রীতি,
আলো-ছায়া সুখ-দুখ ;
(কবি নহি, নিশান্তিকা)

কিন্তু ইহার কিছুতেই কবির চোখে নেশা ধরিল না, তাঁহার রিক্ত বুকে তৃপ্তি আসিল না।—

কে আমার বুকে চিরতৃষাজর্জর
চাহে শুধু দূর সুন্দর মরীচিকা ?
বৃথা ডাকে তারে বাপী কূপ সরোবর,
অন্তরে জ্বলে অনির্বাপ্য শিখা।
সে শিখা টলে না দুঃখের কালো ঝড়ে,
তর্জনী তুলি, জ্বলে তা বাসর ঘরে ;

কে তারে বুঝিবে বলো ?
সূর্যের মত নির্বাক আহ্বানে
শিশিরকণায় কহে সে যে কানে কানে
আমি জ্বলি তুমি জ্বলো।

(কবি নহি, নিশান্তিকা)

'আমি জ্বলি তুমি জ্বলো'—ইহার ভিতর দিয়াই কবির কবি-ধর্মের পরিচয়—পাঠক-হৃদয়ের কাছে তাঁহার অভিনব আহ্বান।

বাঙলার ছেলে হইয়া যতীন্দ্রনাথ কেন সুদূরের তপনতপ্ত মরুভূমিকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে তাহার গভীর তাৎপর্য ছিল। বাঙলা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেই পরিবেশের মধ্যে পরিবর্ধিত জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্ন শ্যামলের মৃদুস্পর্শ---মেঘের জল এবং চোখের জলের অবিরল বর্ষণে যে একটা জোলো স্যাঁতস্যাঁতে ভাব রহিয়াছে. কবির অন্তঃপ্রকৃতি তাহার সহিত কখনই যোগ দিতে পারে নাই, তাঁহার ভয় হইয়াছে. ইহার সহিত যোগ দিতে গেলে তাঁহার নিজের চিত্তের মধ্যে যে মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত ছিল সেটুকুও জলের ঝাপটায় নিভিয়া ঠাণ্ডা হিম হইয়া যাইবে।

বন্ধু জানো তো তুমি,—
বাংলার ছেলে ভালবেসেছিনু কেন আমি মরুভূমি।
শোনো গো বন্ধু, ঐ পশ্চিমে মামুলি মেঘের ডাক,—
দেহ ভেঙে দিল জোলো দুধ আর এই জোলো বৈশাখ।

মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ আজও জ্বলিছে যা ভাঙা বুকে,
শীকরসিক্ত ঝাপ্‌টা লাগিয়া কখন সে যায় চুকে।

(চিরবৈশাখ, সায়ম্‌)

তবে কবি কোন্‌ বৈশাখকে চান? যে-বৈশাখকে তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া কামনা করিয়াছেন তাহার ভিতরে তাঁহার ব্যক্তি-প্রকৃতি এবং তৎসঙ্গে তাঁহার কবি-ধর্মের বেশ একটি পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই ব্যক্তি-প্রকৃতি এবং কবি-ধর্মের কথা স্মরণ রাখিলে তাঁহার কবিতার শুধু মূল সুর নয়—বিস্তারিত ভাব-বিন্যাসেরও তাৎপর্য বোঝা যাইবে।

মোর অন্তর-প্রান্তরে বসি কাঁকরে' গুনেছি দিন,
কবে আসিবে সে চিরবৈশাখ কালবৈশাখী-হীন।
যার ঝঞ্ঝার মঞ্জীরে নাই মল্লার সুর-কণা,
অঙ্গ বেড়িয়া প্রতপ্ত মেঘে ফুঁসে বিদ্যুৎ-ফণা!
জগৎ-কেন্দ্রে প্রাণধারা যার বহিছে অনল-স্রোতে,
যার দুর্বার অগ্নি-বারতা ছুটিছে আলোক-রথে।
আনন্দ যার বহ্ন্যুৎসবে নাচে উচ্ছ্রিতশিখা,
যার চরণের ঘূর্ণীছন্দ নীহারিকা-বুকে লিখা।
মহাসূর্যেরা যে-বৈশাখের শঙ্খধ্বনি শুনে,
অন্তরীক্ষ ভরি' নব নব জগতের বীজ বুনে।

(চিরবৈশাখ, সায়ম্‌)

দেখা যাইতেছে, কবি শুধু একটা ক্ষণ-কালবৈশাখের আরাধনা করিতেছেন না, তিনি তাঁহার অন্তরে বাহিরে চাহেন একটি চিরবৈশাখের অচঞ্চল স্থিতি। এই চিরবৈশাখের ভিতর

দিয়া যে বহ্নি-স্তুতি, তাহা শুধুমাত্র একটি দুঃখের আগুনকে বরণ করিয়া লইবার আগ্রহ নয়—এই বহ্নি একটা অনির্বাণ বীর্যোদ্দীপ্ত জীবনাদর্শ। সুতরাং বার বার নানাভাবে এই বহ্নি-স্তুতির কথা দেখিয়া কবিকে শুধু দুঃখের কবি মনে করা উচিত হইবে না,—কবি চারিদিকের দুঃখের মধ্যে পঞ্চতপা কর্মযোগীর ন্যায় বলিষ্ঠতার—বীর্যবত্তার কবি। কবির কবিতাগুলি সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, তিনি অপরাজেয় মানবতাবাদী ; এই অপরাজেয় মানবতাবাদ আসিয়াছে বিশ্বাতীত দৈবের বিরুদ্ধে—এই বিদ্রোহই চারিদিকে জ্বালাইয়া রাখিতে চায় অনির্বাণ জ্বালা। কেন ? কারণ কবি তাঁহার অন্তরে বাহিরে যেখানেই চাহিয়া দেখিয়াছেন, সেখানেই দেখিতে পাইয়াছেন, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু যে একটা দুঃখের বহ্নিজ্বালাই বহন করিতেছে তাহা নহে—সেই বহ্নিজ্বালার ভিতর দিয়াই যেন একটা দাবী চলিতেছে, একটি কল্পিত সত্য —ছন্দোহীন অর্থহীন বিধানহীন বিধিহীন সৃষ্টির পিছনে একটি অলীক স্রষ্টা স্বীকার করিয়া মানুষ তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করুক—মানুষ প্রকৃতির বশ্যতা হাসিমুখে বরণ করিয়া লউক, শুধু নিজের মহিমায় সে যেন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারে—

বধির বিধাতা যেথা অনলাক্ষরে
লিখিয়া চলিছে তিমির-ললাট ’পরে
মানুষের দাসখৎ। (চিরবৈশাখ, সায়ম্)

কবি তাই শুধু দুঃখের কবি নন, তিনি কবি-বিদ্রোহী।

বিধাতা-পুরুষ সৃষ্টির পিছনে যদি কেহ থাকিয়া থাকেন তবে তিনি অন্ধ-বধির। তাঁহার যে বিধান তাহা পদে পদে মানুষের অপমান—অথচ তাহা প্রতিবিধানের অতীত। মানুষের সেই চিরন্তন অপমানকে সহ্য করিয়া সেই বিধাতার এবং সেই বিধি-বিধানের জয়গান করা—ইহা তিনি কিছুতেই পারেন নাই।

কবি নহি আমি, করি নি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত।
আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত॥ (কবি নহি, নিশান্তিকা)

সুদূর অতীত হইতে প্রণবমন্ত্র বা ওঁ-ধ্বনিকে সৃষ্টির প্রথম নাদ বলা হয়। এই প্রণব-নাদের ভিতর দিয়া বিন্দুরূপ পরম সত্যের প্রথম প্রকাশ। ওঁ-ধ্বনি তাই সৃষ্টি-প্রবাহের প্রথম স্পন্দন। অন্ধকার মহাশূন্যের ভিতরে প্রথম আলোর স্পন্দনের সহিত সৃষ্টির প্রথমধ্বনি ওঁ জাগিয়া উঠিয়াছিল। কবি কান পাতিয়া শুনিয়াছেন, সৃষ্টির এই যে প্রথম ধ্বনিময় স্পন্দন উহা আর কিছুই নয়, উহা সদ্যোজাত বিশ্ব-শিশুর প্রথম ক্রন্দনধ্বনি। অন্ধকারকে বন্দনা করিয়া কবি তাই বলিয়াছেন,—

তোমার নিঃশূন্য গর্ভ হ'তে,
রক্তালোক-স্রোতে
ভরি দিয়া ব্যোম্
যেদিন প্রথম
জন্মমাত্র শিশু-বিশ্ব করিল ক্রন্দন
ওম্ ওম্ ওম্ ;—

সম্মুখে আলোকে খুঁজে যতটুকু পাই,
পিছনে ছায়ায়,
অনন্তব্যাপিনী তব ঘুমন্ত মায়ায়
দ্বিগুণ হারাই।
জনম-ক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন
যুগে যুগে জীবে জীবে হ'ল চিরন্তন।
দিশাহারা বিদেশী সবাই,
কেহ নাই
ঘুচাইতে ভ্রমণের ভ্রম,
যত কাঁদি তত জপি আদি আলোকের
ক্রন্দনের বীজ,—ওম্ ওম্ ওম্।

(অন্ধকার, মরুশিখা)

এই সৃষ্টির আদিরূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

The eternal Dream
is borne on the wings of ageless Light
that rends the veil of the vague···

তাহারই পাশে বসিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

তড়িৎ যেমন মেঘে সঞ্চিত বেদনার শিহরণ,
আলোক যেমন অন্ধ ব্যোমের হাহাকার-কম্পন,···

(জীবন ও মৃত্যু, মরুশিখা)

মনের 'জমিন' এবং দৃষ্টিকোণের পার্থক্য এইখানেই প্রকট। সৃষ্টির পিছনে চরম সত্য রূপে যদি কেহ থাকিয়া থাকেন

তাঁহাকে কবির মনে হইয়াছে শুধুমাত্র একটি কর্মকার যাঁহাকে তিনি সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

ও ভাই কর্মকার,—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম আর ?
(লোহার ব্যথা, মরুশিখা)

সংসারের এই নিরন্তর হাপরের আগুন এবং হাতুড়ির পিটানির ভিতরে কবি নিজের পরাজয় কখনও স্বীকার করেন নাই—

আগুনের তাপে সাঁড়াশির চাপে আমি চিরনিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক্ না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ ? (ঐ)

ইহার পরেই কবির গভীর জিজ্ঞাসা : সৃষ্টি ব্যতীত স্রষ্টা মূল্যহীন—আপনাতে আপনি তিনি অসৎ—তিনি মিথ্যা ; সৃষ্টির প্রেরণা তাই স্রষ্টার নিজের আত্মানুভূতির প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এইখানেই জীবনের গভীর অর্থ এবং সেই অর্থের ভিতর দিয়াই গভীর আনন্দ খুঁজিয়া পাইয়াছেন—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নিচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,

মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধ'রে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরের 'উষ্মা' প্রকাশের ভণিতায় সৃষ্টির অন্তর্নিহিত এই অলীক কর্মকারটিকে প্রশ্ন করিতেছেন,—

ও ভাই কর্মকার!
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্মভার,—
কহ গো বন্ধু কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি?

(লোহার ব্যথা, মরুশিখা)

বিধাতার আত্মরতির তাগিদে তাঁহার এই বিশ্বলীলা,—যে বিশ্বলীলা সম্ভব হইয়াছে 'আমা'কে দিয়া ; কিন্তু সে আত্মরতির লীলা পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই এই 'আমি'টি যদি লৌহখণ্ডের ন্যায় নিরন্তর সংসারের হাপরে 'জ্বলিয়া জ্বলিয়া হাতুড়ির পিটান দ্বারা কেবলই 'হইয়া' উঠিতে না থাকে। লীলাময়ের অনাদিলীলার শরিক হইয়া উঠিবার ইহাই পুরস্কার!

সমস্ত জীবন যে জ্বলিয়া মরা রবীন্দ্রনাথ তাহার একটা গভীর সার্থকতা অনুভব করিয়াছিলেন ; জীবনের এই জ্বলার রূপ আর তাহার আনন্দময় সুন্দর রূপ—কবির জীবনবোধের ভিতরে এই দুইটিই একটি অখণ্ড ছন্দে জড়িত,—উভয়ের ভিতর দিয়া সমানভাবে চলিয়াছে জীবনের জয়যাত্রা। বিশ্বজীবনের

ভিতরেই এই জ্বলিবার নৃত্য এবং আনন্দ-নৃত্য বিশ্বজীবনের জয়যাত্রার পথে দুই পদ-বিক্ষেপরূপে দেখা দিয়াছে; বিশ্বজীবনের সেই অখণ্ড ছন্দের সঙ্গে যোগ দিবার জন্যই কবির আহ্বান। একদিকে যেমন—

পাতিয়া কান শুনিস্ না যে
দিকে দিকে গগনমাঝে
মরণ-বীণায় কি সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে॥

আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই—

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরণ-গীতে গন্ধে রে।

জীবনের এই জ্বলার সার্থকতা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার The Religion of Man গ্রন্থে অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"I had my sorrows that left their memory in a long burning track across my days, but I felt at that moment that in them I lent myself to a travail of creation that ever exceeded my own personal bounds like stars which in their indi-

vidual fire-bursts are lighting the history of the universe."

কিন্তু এই জীবনবোধকে যতীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছে একটা নিষ্ঠুর অপমানময় আত্ম-প্রবঞ্চনা। এইজন্য 'রবি-প্রণাম' করিতে বসিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠ দরদী বন্ধুর আসনে বসাইয়া অসীম শ্রদ্ধাসহকারে প্রশ্ন করিয়াছেন—

দিক্ হতে ঘুরে দিক্
তুমি কি জেনেছ ঠিক
এ জীবন নহে মরীচিকা ?
মরুব্যোমে প্রাণঝড়ে
তবে কেন ছিঁড়ে পড়ে
উড়ে-লাগা আকস্মিকী শিখা ?
জ্বলে নেভে দীপমালা,
তা ল'য়ে সাজায়ে ডালা
আদিত্যপিণ্ডের আরত্রিকে,
শূন্যমুখে বাষ্পাম্বরা
বারংবার ঘুরে ধরা
বিধিবদ্ধ আহ্নিকে বার্ষিকে।
এই পূজারতি মাঝে
এ দীপ লাগে যে কাজে
তাহে বন্ধু না পাই সান্ত্বনা,

যত জ্বলি মনে হয়
জ্বালার এ অপব্যয়,
কেবলই ত' আপনা-বঞ্চনা।
(রবি-প্রণাম, সায়ম্)

এই জীবনের শেষে 'জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা' যেদিন ভোর হইয়া আসিয়াছে, সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাহার জীবন-দেবতাকে বলিয়াছেন সেদিনের সভা ভাঙিয়া দিয়া নবজীবনের উষায় নব রূপ নব শোভার ব্যবস্থা করিতে এবং সেই নব-ব্যবস্থার মধ্যে কবির প্রার্থনা,—'নূতন করিয়া লহ আরবার চিরপুরাতন মোরে'! জীবনদেবতা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল—

মরণ নিশায় উষা বিকশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
অরুণ অধরে মধুর হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি!

'জীবনদেবতা' কবির জীবনে যে কাজের ভার দিয়াছেন কবি হয়ত তাহার সব সফল করিতে পারেন নাই—হয়ত—

তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া এনেছি অশ্রুবারি।

এই যে ঘুমাইয়া পড়া ইহা ইচ্ছাকৃত নয়, আসলে ইহা হইল, 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না'; কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে কবির

মস্ত বড় বল ছিল,—তিনি জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছে বলিতে পারিয়াছেন,—

তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা—

সেই বুকের জোর লইয়াই তিনি যত 'অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান' লইয়া জীবনের জবাবদিহি করিতে সাহস পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কবিতা-গ্রন্থের 'অন্তর্যামী', 'সাধনা' ও 'জীবন-দেবতা' কবিতাগুলি স্মরণে রাখিয়া যতীন্দ্রনাথ যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি কাটাছাঁটা ভাবে বলিয়াছেন, তাঁহার ঠিকাদারী জীবনের জীবন-দেবতা তাঁহাকে দিয়াছিলেন সারাজীবন 'মাটির কাজে'র ভার। সেই ভার সারাজীবন বহন করিয়া কবি যেদিন 'কালের বেলায় জীবননিশা' ভোর হইয়া আসিতে দেখিলেন সেখানে কোনও নব-বাস নব-শোভার আশ্বাস দেখিলেন না,—মরণ-নিশার ভোরে মধুর হাসিয়া শিয়রে কাহাকেও দণ্ডায়মান দেখিতে পান নাই,—তিনি সেদিনও দেখিলেন,—

মরণ-অরুণ মেলিতেছে আঁখি,
ডাকে দূরে দূরে অজানিত পাখী,
অনিদ্র শিব শিথানে রাখিয়া
ঝরিছে নয়নলোর :—
এখনও সমান ঘটে অপমান বন্ধু মোর!

(মাটির কাজে, সায়ম্

কত কবিকে তাঁহাদের জীবনদেবতা কত বড় বড় ভাব দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু এই কবিকে দিলেন শুধু মাটিকাটার কাজ। সে কাজ সম্বন্ধে কবির জবাবদিহি-

মাটিকাটা কাজ দিয়েছিলে মোরে, করি নি হেলা,
এ মাটি মাপিতে পথে-প্রান্তরে করি নি খেলা।
চৈতি দিনের দু'পর বেলায়
ঘুমায়ে পড়িনি বকুল তলায়,
যত ধূপ ফুটে বাঁধে বাঁধে ছুটে'
ভাঙি ও ভাঙাই ঢেলা।
সাধ্যপক্ষে জানত বন্ধু করি নি হেলা।

কিন্তু সারাজীবনের এই 'সাধনা'র ফল কি ঘটিয়াছে?

তবুও ত আজি শপ্ত জীবন কাঁদিয়া কাটে,
সাধিয়া যাচিয়া সবারি করুণা মাঠে ও বাটে।
অকথিত বাণী অকৃত কাজের
জনম অবধি টেনে চলি জের,
মোর মুখ চেয়ে মূক এ মাটির
দুখভরে বুক ফাটে;
ওগো নির্মম, জীবন যে মম কাঁদিয়া কাটে।

(মাটির কাজে, সায়ম্)

জীবন-দেবতার সহিত কবির এই 'মাটি-কাটা ও মাটি-ভাঙা' কাজের 'যৌথ ব্যবসা' এই মর্ত্যভূমিতে; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে এই যৌথ ব্যবসায়ে আনন্দের যেটুকু লভ্যাংশ তাহা সেই

লীলাময়ের, আর দুঃখ-পরাজয়ের যাহা ক্ষয়-ক্ষতি তাহা সবই এই সৃষ্টিলীলায় 'বখ্‌রাদারে'র! কবির এইখানেই সব আপত্তি। তিনি স্রষ্টাকে লইয়া এই সৃষ্টিলীলায় এই যৌথ কারবার চালাইতে রাজি আছেন শুধু একটি শর্তে—সে শর্তটি হইল,—

'কবে হব তব লাভে লোকসানে অংশীদার ?'

'আবেদন' রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মব্যঞ্জক একটি প্রসিদ্ধ কবিতা। সেখানে বিশ্বের 'মহারাণী'র কাছ হইতে কবি তাঁহার (মহারাণীর) 'মালঞ্চের মালাকর' হইবার অধিকার ভিক্ষা করিয়াছেন এবং এই বৃত্তির জন্য কবি বলিয়াছেন, 'অবসর লব সব কাজে', আর এই বৃত্তির বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন, 'অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়'। রবীন্দ্রনাথের সেই 'আবেদন' কবিতার সচেতনতায়ই লিখিত যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'র 'আবেদন' কবিতা। কবিতার দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের 'আবেদন'-এর মধ্যে যে ঐশ্বর্য এবং নিষ্ঠা ব্যঞ্জিত হইয়াছে যতীন্দ্রনাথের 'আবেদন' সে তুলনায় দীন; কিন্তু উভয় আবেদনের বিষয় এবং সুরের পার্থক্য অবশ্য লক্ষণীয়।

ওগো নিখিলের রাণি!
বিনা বেতনের দাস হ'তে চাই—
লহ আবেদনখানি।
কেবল বিলাস অলস শয়নে
র'ব না আকাশ-কুসুম চয়নে!
ফুল ফুলাইয়ে পাখা দুলাইয়ে
গাঁথিব না শুধু বাণী;

কর্মশালার সর্বদুয়ার
খুলে' ডেকে লও মোরে,
কর্মের তাপে ঘর্ম ঝরুক
শিলাজতু নির্ঝরে।

॥ ৫ ॥

প্রকৃতি কবি মাত্রেরই আরাধ্যা; তাহার প্রধান কারণ, সাধারণ কবি-বিশ্বাসে প্রকৃতি সৌন্দর্য-মাধুর্যেরই প্রতিমূর্তি। এ-বিষয়ে যে-সকল কবির ব্যতিক্রম বা স্বাতন্ত্র্যের কথা আমরা উল্লেখ করি তাহা তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্যে যে তাঁহারা প্রকৃতির অবিমিশ্র সৌন্দর্যময়ী এবং মাধুর্যময়া মূর্তি না দেখিয়া কখনও কখনও 'রক্তাক্ত দন্ত-নখর'কেও লক্ষ্য করিয়াছেন। এই দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের পিছনেও রহিয়াছে একটি সাধারণ বিশ্বাস—সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যেও এই 'রক্তাক্ত-দন্ত-নখর'-বিশিষ্ট রূপবৈচিত্র্য প্রকৃতির সাময়িক মূর্তিভেদ মাত্র—যেন কল্যাণী স্নেহময়ী জননীর সাময়িক রোষকষায়িত মূর্তি। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যতত্ত্বের পিছনে অনেক কবির আর একটি গভীর বিশ্বাসও দেখা যায়, তাহা হইল এই যে, সৌন্দর্য আসলে আর কিছু নয়, তাহা বস্তুদেহে অনন্তের আভাস। এই অনন্তের আভাস প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য রূপেই রহিয়া গেল, মানুষের ভিতরে তাহা আসিয়া রূপান্তরিত হইল সৌন্দর্যের সহিত প্রেমে। মানুষের সহিত প্রকৃতির যে যোগ তাহা তাই শুধু সৌন্দর্যের সম্বন্ধে নয়,—যেহেতু সৌন্দর্যের পরিণতি প্রেমে সেই কারণেই

প্রেমের পরিপুষ্টি আবার সৌন্দর্যে; মানুষের প্রেমের লীলা-পরিপুষ্টি তাই আবার প্রকৃতির সৌন্দর্যের শত আয়োজনে। মানুষ তাই প্রকৃতিকে স্বীয় সৌন্দর্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াও ছন্দে, রঙে, রেখায় বন্দনা করিয়াছে,—আবার ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে তাহার প্রেমলীলায় সখীত্বের স্থান দিয়া অন্তরঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যক্ষে প্রকৃতির সৌন্দর্যাকর্ষণ, পরোক্ষে তাহার প্রেমাকর্ষণ। সকল কবির ক্ষেত্রেই - বিশেষ করিয়া যৌবনে—প্রকৃতির এই সৌন্দর্যাকর্ষণ এবং প্রেমাকর্ষণের ভিতরে থাকে একটা উদ্দামতা। কিন্তু কবি হিসাবে এ-ক্ষেত্রেও যতীন্দ্রনাথের সকলই তদ্-বিপরীত। তাহাও আবার যৌবনেই সব চেয়ে বেশী। প্রকৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ যে আদৌ ছিল না তাহা নহে, কিন্তু যতখানি ছিল অচেতন আকর্ষণ ঠিক ততখানি ছিল সংশয়ের সচেতন বিকর্ষণ। এই একটা সন্দেহ কবির মাথা জুড়িয়া ছিল, প্রকৃতির ভিতরে নিয়ম-বিধান শোভা-সৌন্দর্য বেশী নয়; অনিয়ম-অবিচার, রুক্ষতা-নির্মমতা, ক্রুরতা ভীষণতাই তাহার আসল সত্য। বিধান সুষমা, শোভা, কোমলতার যেটুকু ভান রহিয়াছে তাহা শুধু 'টোপ' গিলাইয়া মানুষকে পরাভূত করিবার জন্য, তাই সেখানে কবিমনের বিদ্রোহ তীব্রতর হইয়া ওঠে। একটি যুবক যদি একটি যুবতী নারীর প্রতি নিরন্তর একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করে,—অথচ সেই নারী সম্বন্ধে যদি তাহার মনের মধ্যে একটা অবিশ্বাস দানা বাঁধিয়া ওঠে তখন সেই অজ্ঞাত আকর্ষণের ফল যেমন রূপান্তরিত হয় একটা সচেতন বিদ্বেষে,

কবি যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রকৃতি সম্বন্ধে সেই সত্যই কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাই দেখি

সুনীল আকাশ স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল।
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমস্তুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দূরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়;
সুখ-তুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু ওঠে দুঃখেরি জয়।

দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায়?
বজ্রে যে জনা মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ্ সে বংশে কে বা করে?
ঝড়ে যার বুঁড়ে উড়ে,-
মলয়-ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে!
(দুঃখবাদী, মরুশিখা)

এই দুনিয়ার পিছনে যদি কেহ মালিক থাকিয়া থাকেন তবে কবির মতে তিনি বিশ্বের অলাভ-ব্যবসায়ে হাত দিয়া একা বসিয়া 'রাতের খাতায়' দুঃখের জের টানিতেছেন। সকল জমা-খরচের 'কৈফিয়ৎ' লিখিয়াও অনেক 'ফাজিল' থাকিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ অনেক কিছুরই কোনও কৈফিয়ৎ মিলিতেছে না। এই ভিতরকার ঘাটতি ও ক্ষতিপূরণ যত বেশী হইতেছে,

—ততই বিজ্ঞাপনের চটক বাড়িতেছে—প্রকৃতি হইল সেই বিজ্ঞাপন। মানুষ যে চালাক হইয়া উঠিতেছে—যত বিজ্ঞাপনের চটক বাড়িতেছে ততই যে চিত্তের সংশয় আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কবি বলিতেছেন, প্রকৃতির ভিতর দিয়া এই মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বিড়ম্বনা না করিয়া 'খ্যাতি' বজায় থাকিতে থাকিতেই একদিন সুযোগ বুঝিয়া 'প্রলয়ের লাল বাতি' জ্বালিয়া দেওয়া ভাল। এই অন্ধ প্রকৃতি মানুষকে কোন্ সৌন্দর্যে ভুলাইবে, কোন জ্ঞানেই বা জ্ঞানী করিয়া তুলিবে ?

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ। (ঐ)

/যুগে যুগে মানুষ এই প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে লাভ হইয়াছে কতটুকু ? সত্যের সন্ধান কিছুই পাওয়া যায় নাই,—চাটুবাক্যের মিথ্যা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে রঙে রেখায় কথায় ছন্দে। মানুষ তাহাকে যত ভালোবাসি বলিয়া আদিখ্যেতা করিতেছে ছলনাময়ী তত দূরে সরিয়া ক্রুর হাসি হাসিতেছে —।)

দুরন্ত মন মানে না শাসন, দুঃশাসনের মত
রহস্যময়ী প্রকৃতির ঐ বসন টানিতে রত।
জানি জানি জানি, মানি মানি মানি,—পঞ্চপতির সতী
অফুরান্ তব মায়া-আবরণে আবৃতা ভাগ্যবতী।

যত টানি তার বাস,—
জীবনাঙ্গনে পুঞ্জিয়া উঠে রাঙা মিথ্যার রাশ।

(ছুটি, মরুমায়া)

প্রকৃতির প্রতি এই সন্দেহ এবং বিদ্বেষ যতীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্য-জীবনের প্রথমার্ধে রীতিমত চরমপন্থী করিয়া তুলিয়াছিল। মনে হয় তাঁহার নিজের অন্তরের মধ্যে একটা নিত্য জ্বালাকর ক্ষত কোথাও ছিল—মনের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই ক্ষতকে তিনি প্রকৃতির সর্বত্র সর্ব বিষয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রচলিত রোম্যান্টিকবাদ যেমন একদিকে প্রকৃতিকে সর্বাঙ্গ-মোহিনী এবং সর্বাংশে কল্যাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার অন্তহীন রহস্যে বিভোর থাকাটাকেই পরমা স্থিতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যতীন্দ্রনাথ তেমনই স্থানে স্থানে তদ্বিপরীত আদর্শে প্রকৃতির যাহা কিছু সকল হইতেই সুন্দর, মধুর এবং কল্যাণের অস্বীকৃতিকেই শ্রেয় বলিয়া বড় গলায় প্রচার করিয়াছেন। ফলে রোম্যান্টিক ভাবালুতার মধ্যে যেমন একটা একতরফা নেশা থাকে, যতীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক-বিরোধী অন্তর্জ্বলনের মধ্যেও ঠিক তেমনি অপরপ্রান্তীয় একতরফা ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। মধুর পানীয়ই সর্বদা মাতাল করে না, অন্তর্দাহী আসবের মধ্যেও সেই মত্ততার সম-সম্ভাবনা থাকিতে পারে; যতীন্দ্রনাথের কবিতার স্থানে স্থানে তাহারই প্রমাণ রহিয়াছে। সেই জন্যই তিনি জগতের যেখানে যেটুকু কোমলতা, যেটুকু মধুরের আবেশ রহিয়াছে তাহাকেও দ্বন্দ্ব-

চিত্রে গভীরতর সত্য অন্তর্দাহ এবং ক্রন্দনেরই সমধিক প্রকাশক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এ যেন—

এমনি বন্ধু ভুবনে ভুবনে চলিতেছে লুকোচুরি,
অন্তর-তারে ব্যথার কাঁপন সুরের মোড়কে মুড়ি'।
(কবির কাব্য, মরুশিখা)

আমরা বহির্বিশ্বের যেদিকে যেদিকে তাকাইয়া প্রেম-সৌন্দর্যের কমনীয় লীলা দেখিতে পাই ইহার সকলের ভিতরেই চলিতেছে সেই পাঁচভোলে আসল সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা।

মেঘে মেঘে বাজে গুরু ক্রন্দন,— বনে বনে শিখী নাচে ;
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখিজল,—তৃষিত চাতক বাঁচে।
জ্বালিয়া জ্যোৎস্না-মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে,
পিয়াসী চকোর তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে ;
মূক কাননের মনের আগুন ফুটিলে ফাগুন-ফুলে,
দিকে দিকে দিকে রসিক ভ্রমর স্তব-গুঞ্জন তুলে।
মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে নদী পথে কেঁদে যায়,
নিরুপায় জেনে প্রতি তটতৃণে আঁকড়ি' ধরিতে চায়।
(কবির কাব্য, মরুশিখা)

বহু কবিতায় একই ছন্দে একই ঢঙে এই জাতীয় বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু প্রচলিত কবিধর্ম হইতে এই যে ধর্মান্তর তাহা শুধু একটা দাবদাহের একটানা ধুয়া রূপেই দেখা দেয় নাই,—এই বিপরীত কবিধর্ম নিজেকে বহু স্থানে প্রকাশ করিয়াছে আশ্চর্য বলিষ্ঠতায় এবং দুঃসাহসিকতায়। তাহার ফলে তাঁহার

কবিতায় মাঝে মাঝে প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যেই যাহা পাইয়াছি তাহা যথার্থই দুর্লভ রত্ন। প্রথাসিদ্ধ পথকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে কবি প্রকৃতির যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা বাঙলা-সাহিত্যের সমতল-ভূমিতে প্রবাহিত একটানা ধারার মধ্যে একটি উপলব্যাহত উচ্ছ্রায়ণের সৃষ্টি করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই বর্ণনার সহিত তৎকালীন দুঃখজর্জর, ব্যাধি-ক্লিষ্ট, ক্ষুধাতুর এবং ক্ষতাতুর মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের একটা নিগূঢ় সংযোগ রহিয়াছে। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। সূর্যের বর্ণনায় এক স্থানে বলা হইয়াছে—

যত বেলা উঠে তপনের ফুটে বহিরন্তরদাহ,
সোহাগী কমল ডুবাইয়া গলা কহে—বঁধু ফিরে চাহ।
দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে
ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যু-শয়ন রক্ত বমন করে,
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান;
রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান। (ঐ)

যে কবি আকাশের সূর্যের এই বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার মনে বাঙলা দেশের কাদামাটির জমিনের উপরকার আর একটি চিত্র নিশ্চয়ই লুকাইয়া ছিল—তাহা হইল একটি প্রতিশ্রুতিবান্ পৌরুষ জীবন—দেহে তাহার ব্যাধির তাপ, অন্তরে দারিদ্র্য ও অপমানের জ্বালা; গৃহে তাহার প্রেমময়ী কমলিনী—সে তাহার অস্তিত্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুর আশ্রয় এই জীবনটির প্রতি অপলক করুণ দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ করিয়া আছে; ব্যর্থ হইয়া

যায় জীবন—ছেঁড়া কাঁথায় রক্তবমন করিয়া সকল জ্বালার অবসান। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই—মৃত্যুর পরে জাগে স্তুতির কলগুঞ্জন—অবমাননার গায়ত্রী—অন্ধকারের স্তব্ধতা সেখানে একমাত্র সুহৃদ্। বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনসূর্যকে এমন করিয়া আকাশে তুলিয়া ধরিতে ইহার পূর্বে আর কখনও দেখি নাই।

ভক্ত-সাধিকা মীরাবাঈয়ের একটি ভজন শুনিয়াছিলাম,—সেখানে নিজেকে তিনি একটি বাঁশের বাঁশীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি গিরিধারীলালের নিকট বলিতেছেন,—"আমি বংশে ছিলাম (বংশরূপে ছিলাম, অপর দিকে বড় বংশের—বড় কুলের মেয়ে ছিলাম); সেখান হইতে উৎপাটিত করিয়া তুমি আমাকে আঘাতে আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, দুঃখের আগুনে ভিতরের (অন্তরের) যাহা কিছু সব পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়াছ; বেদনার সপ্তছিদ্রে জীবনকে নিজের মতন গড়িয়া লইয়াছ; কিন্তু হে গিরিধারীলাল—আজ সে সকল কথা—সকল বেদনাই ভুলিয়া যাইতেছি—যখন দেখিতেছি, এই সবের দ্বারাই আমি লাভ করিয়াছি তোমার অধরস্পর্শ—আর সেই অধরের স্পর্শে—তুমি আমার ভিতরে সঞ্চারিত করিতেছ যে শ্বাস—আমার বেদনার সপ্তছিদ্র হইতে সে আজ সপ্তসুরে বাজিয়া উঠিতেছে।" ভক্তের দৃষ্টিতে, বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে দুঃখ-বেদনাময় বিপর্যস্ত জীবনের এ এক অপূর্ব বর্ণনা! রবীন্দ্রনাথও এই সুরে সুর মিশাইয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনার আর সব অংশটুকুই আছে,—কিন্তু সেই বিশ্বাসটুক নাই—তাহা হইলে

কি রূপান্তর ঘটে তাহা দেখিতে পাইতেছি যতীন্দ্রনাথের একটি কবিতায়। বিশ্বাস—সে ত বিশ্বাস মাত্রই—সে ত সত্যের সঙ্গে অভিন্ন নয়—এক রকম প্রবৃত্তিরই একটা রূপান্তর। সেই বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করিয়া যে স্বপ্ন-সৌধ রচনা করিয়াছি সেখানে নীচ হইতে বিশ্বাস সরিয়া গেলে সবই যে লণ্ডভণ্ড। তখন যাহাকে মনে করিয়াছিলাম শান্তিসৌধ তাহাই যে দেখা দেয় আত্ম-প্রবঞ্চনার স্তূপরূপে, সবই দেখা দেয় প্রকাণ্ড একটা ফাঁকি রূপে।—

বেণু কুঞ্জের বেণু ;—
পেয়েছে রে আজ বংশীধারীর ফুল্ল অধর-রেণু।
ধ্বনির পীড়ন বাজে বেণু-হৃদে বিম্ব-ওষ্ঠ-পুটে,
বক্ষক্ষতের সাতমুখে তার সুরের রক্ত উঠে!
অস্তশিখর ভেসে যায় সুরে, ছিটে লাগে নীলাকাশে
ফুটে' উঠে তারা, লুটে বনান্ত উহু উহু কুহুভাষে!
বেণুর বুকের আর্তধ্বনি চাপি চাঁপা-অঙ্গুলে,
বংশীধারীর বাঁশীর আলাপে বিশ্বের মন ভুলে।
(বীণা-বেণু, মরুশিখা)

মানুষের বুকের আর্তনাদকে চম্পকবর্ণের তত্ত্বে তত্ত্বে চাপা দিয়া বংশীধারীর ভুবনমোহন সুরের তারিফে দুনিয়া ভরিয়া গিয়াছে!

'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বারবার তাকে ধ্বনিত করে তুলছে—শিশু

তার নূতন-শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে, সেইরকম—তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই। আজ বোবা সন্ধ্যা-প্রকৃতির এই যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে—সেও কিছু-একটা বলতে চাচ্ছে।—ওই রকম খুব বড় করেই বলতে চায়, ওই রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়, —কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে।” শ্রাবণ-সন্ধ্যার সুর সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সেই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার সুর। কবি যতীন্দ্রনাথের নিকট এই শ্রাবণ-সন্ধ্যার সুরটি কি সুর?—

আজি ওই ঝর ঝর চিরন্ত নির্ঝর,
দূর দূরান্তে ঝরে সঘনে
অন্ধ অনন্তের ক্রন্দন ছন্দের
সান্ত্বনা গান ওঠে গগনে!

(শাওনরাতি, মরুমায়া)

শ্রাবণ-রাত্রে যে 'দেয়ার' গুরুগুরু গর্জন সে সম্বন্ধেও কবি লিখিলেন,

কান পেতে শোনো দেখি গগন-অরণ্যে কি
গর্জে শাবক-হারা বাঘিনী? (ঐ)

অন্ধকার রাত্রির আকাশের নিবিড় অরণ্যে কালো কালো মেঘগুলি যেন শাবক-হারা ক্ষিপ্তা বাঘিনীর ন্যায় গর্জন

করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর সেই মেঘের গায়ে ক্ষণে ক্ষণে জাগে যে বিদ্যুৎ-ঝলক তাহাও তাহার মনে জাগাইয়া তুলিতেছে কোনও প্রেমের কথা নয়, কোনও মালিকার কথা নয়, ক্রূর বক্র নাগিনীরই কথা !—

ও কোন্ বেদিনী মেয়ে অমন কাঁদুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী। (ঐ)

বর্ষশেষের শেষ রজনীর বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,—

নিদারুণ দাহে জ্বলি' সারা দিন কালিয় নাগের কুটিল বিষে,
গভীর রাত্রে মৃত্যুর ঢুল ঢুলে চৈত্রের একত্রিশে।
(বৈশাখ, সায়ম্)

ভাদ্রের অন্ধকার সন্ধ্যাকে কবি 'ভাদ্র'বধূর মতন কাঁদাইয়াছেন —'সারাদিন কেঁদে ভাদ্রবধূর এখনও আনন ভার' ;—ইহার ভিতরে তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নাই ; কিন্তু বর্ষাশেষে শরতের সুনীল আকাশও কবির মনে কোনও আনন্দোচ্ছল হাসিমুখের—কোনও আশা-আনন্দের বার্তা বহন করিয়া আনিতে পারে নাই,—সেখানেও ঝড়-তুফান, জাহাজ-ডুবি,—সেখানেও সবই দীর্ণ, জীর্ণ, ছিন্ন, ভিন্ন !

কাল নিশীথের গগনার্ণবে
তুফান উঠিল খুবই,
হ'য়ে গেল বুঝি বর্ষার শেষ—
মেঘের জাহাজ-ডুবি !

দীর্ণ তাহার পাঁজরার কুচো,
জীর্ণ টুকরো হাল,
সারা রজনীর ঝঞ্ঝাক্ষত
ছিন্ন ভিন্ন পাল।

(শরৎ আকাশে, মরুমায়া)

আমি পূর্বে বলিয়াছি, প্রকৃতির দিক হইতে অচেতন আকর্ষণ যতীন্দ্রনাথের মনে সচেতন বিকর্ষণ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আমার মনে হয়, আকর্ষণটা কাজ করিত তাঁহার কবি-মনের উপর,—কিন্তু কবিমন অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রকাশ লাভ করিতে পারিত না, হৃদয়রাজ্যকে খানিকটা বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিতে হইয়াছে,—বিকর্ষণের তীব্রতা তাপরূপে ক্ষরিত হইত তর্কবুদ্ধির তপ্ত কটাহ হইতে। তাই প্রথম হইতেই আমার একটা সন্দেহ, প্রকৃতির প্রতি যতীন্দ্রনাথের যে বিরূপতা এবং অবিশ্বাস তাহার উপরে কবির সচেতন মনের প্রভাব অনেকখানি। স্থানে স্থানে যতীন্দ্রনাথের কবিতায় ইহা কবিচিত্তের একটা সচেতন প্রতিক্রিয়ার মতনই দেখা দিয়াছে। সৌন্দর্য-বাদী এবং আশাবাদী রবীন্দ্রনাথই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া যতীন্দ্রনাথের এই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে প্রকৃতি-বিষয়ক রবীন্দ্রনাথেরই কতগুলি কবিতার প্রতিক্রিয়ারূপে। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ 'বৈশাখ' কবিতায় কবি বৈশাখের ধূলায় ধূসর রুক্ষ তপঃক্লিষ্ট একটি ভৈরব মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু পূর্বেই দেখিয়াছি তাহার রুদ্র তপস্যার খানিকটা বর্ণনা করিয়াই কবি তাহাকে শান্তিপাঠ করিতে আহ্বান জানাইয়া-

ছেন। এই কবিতাকে স্মরণ করিয়া সমজাতীয় ছন্দে এবং ভাষায় যতীন্দ্রনাথ 'শীত' (মরীচিকা) সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন,—

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি' শবাসন,
সাধিতেছ প্রলয়-সাধন—
কে তুমি সন্ন্যাসী ?

কিন্তু এই রুদ্র সন্ন্যাসীর যে শব-সাধনা তাহার শেষে কোনও শান্তিপাঠ নাই—এ তপস্যার পূর্ণাহুতি সর্বধ্বংসী লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখায়—

কবে শেষ হবে এই রুদ্র আহরণ—
যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সম্ভার
হে মহাঋত্বিক্ ?
কবে তব একটি ফুৎকারে, এই ঘন ধূমপুঞ্জ ছেদি'
লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখা সহসা উঠিবে অভ্রভেদী ?
দহনান্তে রবে প'ড়ে চির হাহাকার, করি' ভস্মসার
নিত্য নৈমিত্তিক !
কত দিনে যজ্ঞে তব দিবে পূর্ণাহুতি, হে মহাঋত্বিক্।
(শীত, মরীচিকা)

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের শরৎ-বন্দনায় বলিয়াছেন,—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে ;
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে !

তাহারই পাশে পাইতেছি যতীন্দ্রনাথের কবিতা—

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি গেছে খানা-ডোবাতে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

পারে না বহিতে নদী জলভার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে না ক' আর,
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে,
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননি
শরৎকালের প্রভাতে।

যতীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

পারে না বহিতে লোক জ্বরভার,
পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর,
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে।
একপাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎকালের প্রভাতে॥
(শরৎ, মরুশিখা)

ইহাকে কি বলিব? রবীন্দ্রনাথের কবিতার লঘু প্যারডি? অনেকে ঠিক সেকথাটিতে রাজি হইবেন না, তাঁহারা বলিবেন,

আজন্ম ধনীর তুলাল শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশের মধ্যে অথবা শিলাইদহের বোটে বসিয়া যে বঙ্গের শরতের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের দেখা বা ভাব-কল্পনায় ধৃত বাঙলার শরতেরই রূপ। কিন্তু এঁদো পুকুর খানা-ডোবাতে ভরা দরিদ্রা, রোগক্লিষ্টা তুঃখিনী বাঙলার যে আর একটি বিধুর মূর্তি রহিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের চোখে বা কল্পনায় ধরা পড়ে নাই, সেই বাস্তব মূর্তি ধরা পড়িয়াছে বর্তমান বাঙলার সত্যকার শরৎ-কালীন পল্লীজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কবির চোখে। আমি ইহাকে বিশুদ্ধ প্যারডির লঘুতাও দান করিতে চাই না, বাস্তবধর্মিতার মর্যাদাও দান করিতে চাহি না। আমি ইহাকে বলিব কবিচিত্তের একটা সচেতন প্রতিক্রিয়া।* ঠিক সেই একই প্রতিক্রিয়া এই একই 'মরুশিখা' কবিতা-গ্রন্থে আরও দেখিতে পাই; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রসিদ্ধ গঙ্গা-স্তোত্র—

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।
শ্যাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লাবিনী ধূসরতরঙ্গভঙ্গে।

প্রভৃতি পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে যতীন্দ্রনাথের গঙ্গা-স্তোত্রে—

চিরক্রন্দনময়ী গঙ্গে।
কুলু-কুলু কল-কল প্রবাহিত আঁখিজল
দেব-মানবের একসঙ্গে!

* এ বিষয়ে যতীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকৃতি পরে দ্রষ্টব্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

নারদ-কীর্তন-পুলকিত-মাধব-বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছসি ধূর্জটি জটিল জটাপর ঝরিয়া।
অম্বর হইতে সমশতধারে জ্যোতিঃপ্রপাততিমিরে,
নামিলে ধরায় হিমাচলমূলে, মিশিলে সাগরসঙ্গে!

যতীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, ইহার সবই মিথ্যা, আসল সত্য হইল—

বিশ্বের ক্রন্দন-বিচলিত নারায়ণ,
আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল—
গোলোকে হ'ল না ঠাই, শিবজটা বহি তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।
হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী,
যুগে যুগে নরনারী-অফুরাণ-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলার ভরাশ্রাবণের বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা!
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা-নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা!

আমরা জান, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইহার একটু পরেই এই ভরাশ্রাবণে গ্রামের নদীটির ভিতরে এক অজানা নেয়ে চেনা-অচেনার রহস্য গায়ে মাখিয়া ভরাপালের সোনার তরী ভাসাইয়া দূর হইতে গান গাহিতে গাহিতে আসিবে এবং সোনার ধান লইয়া চলিয়া যাইবে ; কবি যতীন্দ্রনাথও ঠিক এই ছন্দেই বাঙলার ভরাশ্রাবণের বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু সেই মেঘে ঢাকিয়া যাওয়া নির্জন গ্রামখানিতে কোনও অজানা দেশের গান-গাওয়া সোনার তরী ভাসিয়া আসে নাই, —নিঃস্ব বিধবা পাঁচীর একমাত্র ছেলে অনেকদিন ব্যাধিতে ভুগিয়া বহু অনাহার কদাহারের পর আজ দুইটি ভাত-পথ্য করিবার ব্যবস্থায় ছিল,—সে এই ঘনবর্ষার মধ্যে ছাইকুড়ের ভিতর হইতে একটি মান খুঁড়িয়া আনিবার চেষ্টায় ছিল—সেখানে তাহাকে সাপে কাটিয়াছে, সুতরাং

ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা উপর্ঝরণ,
গগন ধরণী মেঘে ধূসর বরণ ;
দাদুরী প্রভৃতি সব
নিভৃতে করিছে রব,
পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ !
এ বাদলে মরণের ছিল না মরণ ?

(দুঃখের পার, মরুমায়া)

পূর্বে বলিয়াছি, প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা সাধারণতঃ দুই রকমের হইতে পারে, হয় প্রকৃতিকে যতটা সম্ভব নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সেই মহিমাকে ব্যঞ্জিত করিয়া

তোলা, নতুবা মানুষের জীবনের সঙ্গে তাহাকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করিয়া লইয়া জীবনের সত্যই তাহার ভিতরে প্রতিফলিত করিয়া তোলা। কবি যতীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনকে ভুলিয়া কোনও দিনই কিছু ভাবিতে পারেন নাই—আর এই সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই—তাহার দুঃখের জীবনকেই তিনি সব চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। প্রকৃতি মানুষের আরাধ্যা —প্রকৃতি মানুষকে শিক্ষা দিবে—এই সব অন্ধ স্তাবকতার কথা যতীন্দ্রনাথ বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। সে সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট কবিয়া বলিয়াছেন,—

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কি বা ?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রিদিবা।

(দুঃখবাদী, মরুশিখা)

প্রকৃতির মধ্যে যদি কিছু শিক্ষণীয় থাকে তবে তাহা হইল, জীবন-সংগ্রামে ছলে-বলে-কৌশলে দুর্বলকে চাপিয়া মারিয়া—সমূলে ধ্বংস করিয়া প্রবলের আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই প্রকৃতিকেই আমরা বলি পরম-সত্যের ছায়ামূর্তি; দুর্বলের প্রতি নিরন্তর প্রবলের এই যে অত্যাচার ইহাই যদি ছায়ার মূল তাৎপর্য হয় তবে এই ছায়াব পিছনে যে পরম সত্যের কায়া রহিয়াছে তাহা ত আরও চমৎকার !

ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার ;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়াও চমৎকার ! (ঐ)

॥ ৬ ॥

যতীন্দ্রনাথ আজন্ম অবিশ্বাসী কবি। আজন্ম কথাটায় হয়ত কিছু আপত্তি উঠিতে পারে, কারণ কবির কবি-জীবনে 'সায়ম্' হইতে একটা সুর-পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্তনও অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে পারে নাই ; শুধু পার্থক্য এইখানে, প্রথম যুগের অবিশ্বাস একেবারে নিখাদ সুতরাং এখানে অবিশ্বাস প্রচণ্ড রূপেই অবিশ্বাস, বিদ্রোহের বিদ্রূপ এবং ক্ষিপ্ততা লইয়াই অবিশ্বাস—সে অবিশ্বাসে সংশয়ের দৌর্বল্য নাই ; কিন্তু 'সায়ম্' হইতে কবিচিত্তের অবিশ্বাস স্থানে স্থানে তাঁহার বিশুদ্ধির রৌদ্ররস এবং ওজোগুণ হারাইয়া ফেলিয়াছে ; স্থানে স্থানে রুদ্রপন্থীর রুক্ষ-পিঙ্গল জটাজালে সংশয়ের দোলা লাগিয়াছে। সংশয় আসলে দুর্বলতা, চিত্তকে কোথাওই সে দৃঢ় ভূমির উপরে দাঁড় করাইতে পারে না, 'হাঁ'-এর দিকেও না, 'না'-এর দিকেও না। দৃঢ় ভূমিতে যেখানে চিত্তের প্রতিষ্ঠা নাই কণ্ঠের সুর সেখানে বার বার খাদে নামিয়া যাইবেই। এই জন্যই প্রথম যুগে যতীন্দ্রনাথ সংশয়ী কবি নন, প্রথম যুগে তিনি আপোষ-হীন অবিশ্বাসী।

এই অবিশ্বাসের অর্থ কি ? প্রচলিত বিশ্বাসের অর্থ আগে বুঝিয়া না লইলে এই অবিশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে না। প্রচলিত বিশ্বাসের দুইটি রূপ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথম—এবং বহুল-প্রচলিত, সর্বজনপ্রিয় রূপটি হইল, জীবন-জিজ্ঞাসাহীন সামাজিক উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত

কতকগুলি সংস্কার। এ সংস্কারকে আমরা ঠিক বিশেষ কোনও দেশ-কালের কোনও বিশেষ সামাজিক সংস্কার না বলিয়া স্বল্প ব্যতিক্রম ব্যতীত মানব-সাধারণেরই সহজাত সংস্কার বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। এই সহজাত সংস্কারগ্রন্থিগুলির মূলীভূত কারণ, মানব-চিত্তের একটা প্রায় সর্বজনীন এবং সর্বকালিক দুর্বলতা। একটি পাখী যেমন তরঙ্গসংক্ষুব্ধ সীমাহীন সমুদ্রের বুকে উড়িয়া উড়িয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে, গায়ে তাহার উজান বাতাসের ধাক্কা; তখনই সে নিঃসীম শূন্যের বুকেই কোথাও একটা বসিবার ঠাঁই খোঁজে। নিখিল বিশ্বের সাধারণ মানুষের মন সেই শ্রান্ত পাখীটি—বসিবার সত্য ঠাঁই কিছু থাক কি না থাক— সে নিখিল শূন্যের মধ্যে নিজেকে যখন একান্ত অসহায় অনুভব করে, তখন ঠাঁই একটা সে কল্পনা করিয়া লয়—ইহাই তাহার দৈব বিশ্বাস। এই দৈব বিশ্বাসকে মানুষ দেশে দেশে কালে কালে বিচিত্র রূপে লাভ করিতেছে—আর উত্তরাধিকার রূপে বংশপরম্পরাক্রমে তাহাকে শুধু ছড়াইয়া যাইতেছে।

এই জীবন-জিজ্ঞাসাহীন একটানা সাধারণ ধারার পাশে রহিয়াছে বিশ্বাসের আর একটি ধারা—সে ধারায় জিজ্ঞাসার আছে একটা সমাধান। মানুষের যত রকমের যত ক্ষুদ্র-বৃহৎ জিজ্ঞাসা তাহাদের সকলকে যদি একত্রিত করিয়া একটি মহা-জিজ্ঞাসার রূপ দেওয়া যায়, তবে তাহা দাঁড়ায় এই রূপে,—এই যে মানব-জীবন এবং তাহাকে ঘিরিয়া এই বিশ্বজীবন—ইহার মূলের পরম সত্য জড় না চেতন? কিছু কিছু বিপত্তি-

আপত্তি তর্কাতর্কি সত্ত্বেও অধিকাংশের রায়ই এই চেতনের পক্ষে এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিছনকার যে বিশ্বচৈতন্য তাহাই ঘনীভূত হইয়া মূর্তি লাভ করিয়াছে এক পরম পুরুষের। এই বিশ্বচৈতন্যে বিশ্বাস স্বভাবতঃই একটি পরম মঙ্গলের আদর্শকে বহন করে। কারণ, এই চেতনে বিশ্বাস শব্দের অর্থ ই বিশ্বসৃষ্টির পিছনে একটা অখণ্ড যৌক্তিকতায় বিশ্বাস—যৌক্তিকতার স্বাভাবিক পরিণতি মঙ্গলের আদর্শে। চেতনে প্রতিষ্ঠিত যে জড়, তাহা চেতনের পরিস্ফূর্তি রূপে চেতনের অবিরোধী ; কিন্তু চেতনবিরোধী যে জড় তাহা যুক্তিহীন—তাহার স্বাভাবিক পরিণতি অমঙ্গলে—অনির্বাণ দুঃখজ্বালায়। জীবন যাহা ঠিক সেই ভাবে তাহাকে গ্রহণ করা ছাড়া তাহার আর কোনও সার্থকতা থাকে না।

যতীন্দ্রনাথের সকল অবিশ্বাস এবং দুঃখবাদের মূলেও রহিয়াছে এই জড়বাদ। জীবনের মধ্যে কবি জড় ও চেতনের যত খেলা দেখিয়াছেন—সেখানে চেতন কোনও সত্যরূপে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, জড়ের মধ্যে সে ধীরে ধীরে আত্মবিলীন করিয়া দিয়াছে,—তখন দেহ ও মন জুড়িয়া অনাদি কালে বিরাজমান দেখা গিয়াছে এক মহাজড়কে—নিখিলশূন্যে অনন্তকালে সেই মহাজড়ের অন্ধ-লীলাতেই জাগিয়া উঠিয়াছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সেই অন্ধজড়ের অনাদি অভিশাপ লইয়াই জাগিয়াছে মানুষের দহনের ইতিহাস—যাহার আমরা গালভরা নাম দিয়াছি জীবন।

অসীম জড়ের মাঝে
চেতনাশক্তি—ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো রাজে।
শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায় :
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তি পানে ধায়।
বন্ধু, বন্ধুবর !
সকল শক্তি সংহত করে' হয়ে আছ মহাজড়।
সেই মহাঘুমে সাঁতারি' বেড়াই মোরা স্বপনের ফেনা ;
পলকে ফুটিয়া মিছে ঘাড়ে করি তোমারি প্রেমের দেনা।
(ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক ; মরীচিকা)

চেতন ব্যতীত কোথাও কোনও শৃঙ্খলাই সম্ভব নয় ; জগতের পিছনে জড় ব্যতীত কোনও চেতন সত্যকে যদি নাই মানা যায় তবে শৃঙ্খলা আসিবে কোথা হইতে কি করিয়া ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল প্রকৃতিতেই তাহা অসম্ভব ! তবু যে আমরা চারি দিকে শুধু নিয়ম-শৃঙ্খলাই দেখিয়া চলিতেছি তাহা তবে বিশ্বজোড়া প্রকাণ্ড একটা গোঁজামিল ছাড়া আর কি ? সুতরাং কবিকে সে কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইল—

জগতের শৃঙ্খলা,—
স্বপ্নেরি মতো উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা।
(ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক)

তাহা হইলে বিধাতার প্রতি যে আমাদের এত প্রেম তাহা কি ? কবির মতে তাহা আর কিছুই নয়—তাহা হইল—

বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হ'য়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।

প্রেম বলে' কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই। (ঐ)

যাঁহারা চেতন-সত্যে বিশ্বাসী—অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির পিছনে চৈতন্যকেই যাঁহারা বড় করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা জগতের তৃণ হইতে বনস্পতি, ধূলিকণা হইতে সৌরপিণ্ড, ক্ষুদ্রতম কীট হইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ ইহার ভিতরে কোথাও কোনও অনিয়ম, অযুক্তি, অবিচার দেখিতে পান না,—তাঁহারা দেখেন, সবই এক বিরাট ছন্দের ঐক্যসূত্রে বিধৃত—সকল কিছুর পিছনে রহিয়াছে একটি উদ্দেশ্য—একটি নিখুঁত পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথ ইহারই নাম দিয়াছেন—অনন্তের অনাদি স্বপ্ন। চেতনে অবিশ্বাসী যতীন্দ্রনাথ যেখানেই চোখ ফিরান সেখান হইতেই লাভ করেন এক সত্য—

জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালী।
(ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক)

এই গোঁজামিলের মাত্রা ততই বাড়িতে থাকে যতই জীবনের চারিদিকে স্তূপীকৃত হইতে থাকে দুঃখভার—যে দুঃখভারের পিছনে আমাদের যুক্তিবাদী মন লইয়া কোনও 'কেন'র জবাব খুঁজিয়া পাই না। কবির মতে এই 'কেন'র আসলে কোনও জবাব নাই,—অথচ জবাব একটা না পাইলে কিছুতেই মনের নাই সান্ত্বনা—সে দাঁড়াইবার কোথাও পায় না ঠাঁই ; তাই তখন মন এই 'কেন'র জবাব আপনিই একটা বানাইয়া লয়। সে জবাব নিজে বানাইয়া লইতে হইলে

চোখ মেলিয়া বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হইয়া বানান চলে না,—তাই চোখ তুইটিকে—মানুষের সত্যদৃষ্টিকে—হয় ইচ্ছা করিয়া বন্ধ করিয়া লইতে হয়, নতুবা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইতে হয়, আর তখন নয়ন মুদিয়া বসিয়া ভাবিতে হইবে—

দেখিছ যেটারে তুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম। (ঐ)

কিন্তু এমনতর অনেক 'ঠাওর করিয়া' দেখিবার পরে কবি বলিতেছেন—

ঠাওর করিতে তুখ সুখ হ'ল, সুখ হ'য়ে গেল তুখ,
মোটের উপরে বুঝিতে নারিনু লাভ হ'ল কতটুক্?
(ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক)

তাহার চেয়ে কবি বলিবেন,—

চোখ বুঁজে যারে আনন্দ ব'লে আনন্দ কর দাদা,
চোখ চেয়ে যদি তুঃখই বলি, কি তাহে এমন বাধা?
(ঐ, সপ্তম ঝোঁক)

জীবনের ভিতরে পদে পদে এত সূক্ষ্মত্ব করিয়া আর লাভ হয় না কিছু, বাস্তব সত্যজীবনে ছোট-খাটো সুখের মধুর আস্বাদ যেটুকু থাকে, তুঃখকে ফাঁকি দিতে গিয়া সেটুকুও হারাইয়া ফেলি। কবি বলেন, তাহার চেয়ে যেখানে যতটুকু 'যথালাভ' তাহা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানী—শীতের বাতাসে দেহখানি যখন একেবারে জমিয়া যাইতে চায় তখন ছেঁড়া কাঁথাখানি জড়াইয়া যতটুকু সুখ পাওয়া যায় অলীক 'ভূমানন্দে'র লোভে তাহাই বা হারাই কেন? জীবনের যত সুখ জ্ঞানীর

বিচারে তাহা ঐ ছেঁড়া কাঁথারই সুখ; কিন্তু তাহাই যে সত্য—সেই সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া লাভ কি? ভক্ত জ্ঞানীর চরম লক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া কবি তাই বলিতেছেন—

বন্ধু, প্রণাম হই,—
শীতের বাতাসে জমে' যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই?
(ঐ, প্রথম ঝোঁক)

জীবনে ও জগতে যাঁহারা বিধানবাদী এবং বিধাতার কৃপাবাদী তাঁহাদের প্রতি কবির একটি মাত্র সুস্পষ্ট প্রশ্ন—

চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?
(ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক)

যতীন্দ্রনাথের যখন যৌবন তখন বাঙলা কবিতায় সব চেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল অজানা রহস্যের স্বপ্নালুতা। এই রহস্যবাদের কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাস্বর প্রতিভা লইয়া, একটি সবিতৃ-মণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল আরও অনেক কবিকে লইয়া—যাঁহাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং গভীর না হইলেও তাঁহারা সকলেই ছিলেন কম-বেশি 'অজানার পিয়াসী'। এই অজানার আহ্বান আসলে সত্য হোক বা মিথ্যা হোক—ইহা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং গানে একটা হৃৎস্পন্দন জাগাইয়া তুলিতেছিল; কিন্তু কবিতার ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহা দেখা দিল একটা ফাঁপা ভাবালুতার অস্বাস্থ্যকর প্রবণতায়। জীবন হইতে যেমন কাব্যের

উৎসারণ তেমনি আবার কাব্য হইতে পারস্পরিক প্রভাবে জীবনের নিয়ন্ত্রণ ; সুতরাং দেখিতে দেখিতে 'অজানা'ই সত্যের আসন বিছাইয়া লইল শুধু কাব্যে নয়, কাব্য হইতে জীবনেও। 'অজানা' তাই আর শুধু কাব্য-লক্ষ্মীরূপে দেখা দিল না, দেখা দিল জীবনেরই মর্মবাসিনী আরাধ্যা লক্ষ্মীরূপে। এই অজানার কোনও আকর্ষণ ছিল না যতীন্দ্রনাথের দেহে-মনে। তিনি মনে করিতেন, 'অজানা'টা জানার নাগালের বাইরের গভীরতর অংশটি নয়, অজানা হইল রূঢ় অপ্রিয় জানা সত্যকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য একটি কমনীয় আবরণ মাত্র। যে অলঙ্ঘ্য প্রবল শক্তির হাতে নিরন্তর পিষ্ট, আহত এবং লাঞ্ছিত হইতেছি সেই প্রবল অন্ধ শক্তির সহিত একটা এক-তরফা সন্ধিরই একটি সাজানো-গোছানো মহিমান্বিত রূপ হইল এই অজানার আরাধনা। এই কবি-আদর্শকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে আহত করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

হায় রে ভ্রান্ত কবি।
নয়নের আলো ম্লান হ'য়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি
সারা জীবন এ কোন্ অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা ?
জগৎ ভরিয়া দিয়ে যাও হৃদি-রক্তের আলিপনা ?
দহিলে আপন রূপ
কোন্ অজানার পূজা উপচারে অমল গন্ধধূপ !
এই অফুরাণ স্নেহ,
পঞ্চপ্রদীপ ভরিয়া জ্বালায়ে ধরিলে আপন দেহ !

পেয়েছ কি সেই লক্ষ্মীর দেখা, হয়েছে কি বর চাওয়া ?
কত দক্ষিণা মিলিল গো বিনা ফাঁকা দক্ষিণা হাওয়া ?
ছেঁদো কথা কয়ে গেল দিন বয়ে আপন ছন্দে বন্দী,
পেয়েছ তৃপ্তি ! প্রবলের সাথে এক-তরফা সে সন্ধি।
অজানাটা অজানাই—
কেন ছোটাছুটি, শোনো মোটামুটি, কোনোখানে সে যে নাই।
সে কেবল মরীচিকা !
বাহিরে শ্রান্তি, ভিতরে ভ্রান্তি, না থাকাই তার থাকা।
(ঘুমের ঘোরে, চতুর্থ ঝোঁক—মরীচিকা)

দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৃশ্য এবং ঘটনার উপরেও যে এক চির-অজানার নিঃশব্দসঞ্চরণ ছায়াপাত রহিয়াছে, সমগ্র বিশ্বের ভিতর দিয়া সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়া চির-অপরিচিতের সেই চির-পরিচয় রবীন্দ্রনাথের চিত্ত একটি সহজ আনন্দ-বিহ্বলতায় ভরিয়া দিয়াছিল। সহস্র সহস্র গান ও কবিতা লিখিবার পরও তিনি বলিয়াছেন—

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,—
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই
দেখিনু সহস্র বার
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চির-পরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়

সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।

যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ। (বলাকা,৪১)

এই অজানাই রবীন্দ্রনাথকে চিরদিন হাসাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে এবং চিরদিন ফাঁকি দিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু এই অজানার পিছনে কোনও দিনই ছোটেন নাই, কারণ প্রথমাবধিই তাঁহার জীবনবোধের মধ্যে এই একটা কথা দৃঢ় হইয়া ছিল,—অজানা মিথ্যার আলেয়া মাত্র—সে পায়ের নীচের শক্ত মাটি হইতে মানুষকে শুধু পাঁকে আটকাইবার জন্য জলাভূমিতে টানিয়া লয়। সুতরাং তিনি বলিবেন—

প্রভাত হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছি নিজ গলা,
সন্ধ্যাবেলাও ভগ্নকণ্ঠে সে কথা হবে না বলা!
কেন এ প্রয়াস ভাই?
যে কথা তোমার হ'ল না কো বলা, নেই সেই কথাটাই।
(ঘুমের ঘোরে, চতুর্থ ঝোঁক—মরীচিকা)

অজানাটা যদি মিথ্যা বোঝা গেল তবে সত্য রহিল শুধু জানাটা—অর্থাৎ দুঃখের জীবনটা। যতীন্দ্রনাথ বলিবেন, যদি কবিতা লিখিতেই হয় তবে এই নিরেট সত্যটাকেই গ্রহণ করিবার সাহস চাই—বীর্য চাই; চোখে যেটাকে কালো দেখিতেছি তাহার মধ্যে জোর করিয়া কোনও আলো দেখিবার

চেষ্টা করিয়া লাভ কি ? আলোর গান—সে যতই রঙিন হোক —তাহাতে যতই স্বপ্ন থাকুক, মাদকতা থাকুক—সে সত্য নয় বলিয়াই গ্রহণীয় নয় ; শুধু তাই নয়, সত্য-কালোর চারি পাশে সে আলো শুধু প্রবঞ্চনা এবং অপমানের রঙিন ছটা। 'সম্মুখেতে কষ্টের সংসার'—তাহার মধ্যে দুঃখের জীবন—সেই-টাই সত্য এবং বরণীয়—তাহার পিছনকার 'ভূমা'র গভীর গানটাই 'ভূয়া'র আবরণের টান।—

দুঃখরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান ;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান !
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা !
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা ?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি ?

(ঘুমের ঘোরে, চতুর্থ ঝোঁক—মরীচিকা)

পূর্বেই বলিয়াছি, যতীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম হইল মানুষের দুর্বলতা—পরম পরাজয়। আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা মানুষ যদি তাহার মানুষরূপে সোজা দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে তবেই সে ধার্মিক হইয়া ওঠে—তখন সে চায় আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ শব্দের অর্থ জীবনের দুঃখকণ্টকিত সমস্ত দায়িত্বভার এড়াইবার চেষ্টা। সমর্পণটা ঠিক কাহার কাছে হইতেছে না জানিলেও আত্মবিলুপ্তির আনন্দই তখন নেশার

মতন পাইয়া বসে—সেই দুর্বলতার হীনতাকে মহিমান্বিত করিয়া লইতে হয় জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমে। মানুষের এই দুর্বলতা এবং পরাজয়-জাত আত্মসমর্পণের ভক্তিপ্রেমের নির্যাস গায়ে মাখিয়া মাখিয়া দেবতা নিজেই যে কতখানি মহিমান্বিত হইয়া উঠিতেছেন কবি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। সৃষ্টিকে যাহারা নিখাদ সুন্দর এবং নির্ভেজাল মঙ্গলরূপে গ্রহণ করিতে পারিল না তাহারাই ত অবিশ্বাসী অধার্মিক; মত্তহস্তিসম যাহারা এই ছেঁদো কথার বাঁধন ছিঁড়িয়া বাহির হইতে চায়, জীবনে তাহাদের উপরে চলিতে থাকে অঙ্কুশাঘাত; সেই অঙ্কুশাঘাতে যদি কেহ শির নোয়াইয়াই দেয় তবে তাহাই কি বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বলিয়া অমর্ত্য এবং অমৃত হইয়া ওঠে? জীবনের দেবতা—বিশ্বের দেবতা—কি অধীর আগ্রহে অঞ্জলিপুটে সেই প্রেমামৃত পান করিয়াই পরম তৃপ্তি লাভ করেন?

সৃষ্টির পচা ঝুনা নারিকেল যে জনা দেখিল নাড়ি',
হাটের মাঝারে স্পর্ধা করিয়া যে জন ভাঙিল হাঁড়ি;
তোমার বিধান,—অঙ্কুশ 'পরে হানি' ঘন অঙ্কুশ
মত্তহস্তিসম সে চিত্তে করিয়াছে কাপুরুষ।
আজি দুর্বল অক্ষম আমি ভয়-সংশয়-যুত,
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু? হ'ল কি মনঃপূত?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের' পরে হানিছ রুদ্র রোষ,
ঘাড়ে ধরে' মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ!

(ভক্তির ভারে, মরুশিখা)

মানুষের জীবনের মূল ট্র্যাজেডি হইল, সে সাড়ে তিন হাত দেহের খপ্পরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জিনিস; সারা জীবনের যত ঠোকাঠুকি তাহা হইল এই সাড়ে তিন হাতের খোলসটার মধ্যে এত বড় প্রকাণ্ড জিনিসটাকে আঁটসাঁট ভাবে ঢুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা। যাহারা 'শিরদাঁড়া-ভাঙা' হইয়া 'কোল-কুঁজো', 'ঘাড়-গুঁজো' হইয়া ইহার মধ্যেই এক রকম বনাইয়া গেল তাহারা লাভ করিল পরম ধার্মিকের মর্যাদা; যাহারা তাহা পারিল না, তাহারাই রহিল বিদ্রোহী শয়তান—দুঃখের নিত্য-কালের নরকাগ্নিতে চেষ্টা চলিতেছে তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার।

প্রেম-মন্দিরে তাহারই বিপদ—যেজন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়া-ভাঙা যত কোল-কুঁজো ঘাড়-গুঁজোদেরই মজা।
নমি জুড়ি' করপুট,—
হে রসিক, তব চরম সৃষ্টি ঘোড়া পিটাইয়া উট।
(ভক্তির ভারে, মরুশিখা)

তাঁহার 'চাবুক' কবিতাতেও (মরুশিখা) কবি বলিয়াছেন,—

দারুণ দুঃসময়,—
অশ্রুর আড়ে তোমার উপরে প্রেম-সঞ্চারই হয়।
... ...
আঁখি না মেলেই যে ভাগ্যবান্ পড়ে আলোকের প্রেমে,
তার জগৎ ত স্বপ্নচিত্র বাঁধানো ঘুমের ফ্রেমে।
মোর মত হতভাগা চিরজাগা, শতে নিরানব্বই;
তাদের তরাতে চাব্‌কানো ছাড়া অন্য উপায় কই?

মানুষের সত্য স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর চাপিয়া রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহার ভগ্ন-কণ্ঠস্বর দ্বারা যে ধর্মসঙ্গীতের সৃষ্টি তাহার সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের শাণিত বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নাই।

তর্কে হারিয়া বুঝিতেছি নিট্—এ জীবন সুখে ভরা,
চৈত্র খরায় ভাগীরথী-বুক ভরে যেন বালুচরা।
কাঁদনের স্রোত বালির বাঁধনে পদে পদে বাধা পেয়ে,
নৃত্য-নূপুর নিক্কণ' চলে রুনু রুনু গান গেয়ে।
কভু আনন্দভরে,
অন্তঃশিলা অশ্রু-প্রবাহ ধূ ধূ ধূ সুখের চরে।
(প্রাপ্তি-স্বীকার, মরুশিখা)

এই বিদ্রূপের ব্যঞ্জনা চমৎকার সার্থকতা লাভ করিয়াছে যতীন্দ্রনাথের 'মরুশিখা'র অন্তর্গত 'কাণ্ডারী' কবিতায়। অন্তর্যামী ভগবান্ ত 'যত সৌখীন জীবন তরীর' 'চির-কাণ্ডারী',—কিন্তু কবি বলিতেছেন, তাঁহার জীবন যে 'জীবন-তরী' নয়, ইহা একেবারে 'জীবন-গোরুর-গাড়ী'; সৌখীন জীবন-তরীর কাণ্ডারীর পক্ষে এই জীবন-গোরুর-গাড়ীর গাড়োয়ানি করা পোষাইবে কি? এ জীবন-গোরুর-গাড়ীর পথ যে কোথাও বন্ধুর কোথাও পিচ্ছিল—'পগার ভাগাড় ভাঙন' ঠেলিয়া যে ইহাকে ক্যাঁচর কোঁচর শব্দে নট্ঘট্ করিয়া চলিতে হয়! এখানে যে কভু মলয়হিল্লোল, কভু ঝড়ের দোল ওঠে না, এখানে কুলু কুলু গীতিও নাই, কলকল্লোল রোলও নাই; এখানে যে—

দাঁড়ের আঘাতে আড়ে তাল রেখে দাঁড়ীরা গাহে না সারি,
ভরা উড়োপালে ক'সে-ধরা হালে তুফানে জমে না পাড়ি।
খেলে না হেথায় জোয়ার কি ভাঁটা ঘূর্ণা বন্যা, ঢেউ ;
সাঁজঘাটে ঘট ভরিবার ছলে দোলায় না এরে কেউ।
তরঙ্গচূড়ে রঙ্গে নাচিয়া যুঝিয়া ঝঞ্ঝা-সাথে,
লভে না শীতল সুনীল মরণ কালবৈশাখী রাতে।
এ মম গোরুর গাড়ী,—
এঁটে বাঁধা টুটা পাঁজরা বন্ধু, ভাড়াটিয়া ভারে ভারী।

এ গাড়ী চলিয়াছে এক দৈনন্দিন জীবন-পদ্ধতির 'অনাদি নিক্' ধরিয়া—যুগযুগান্তের যত মহাজন ব্যথাভারে এই পথে 'চক্রনেমিতে দীর্ঘ গভীর ক্ষত' আঁকিয়া দিয়া এই 'অনাদি নিক্' তৈরী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ গাড়ী চালাইতে চাকার করুণ আর্তরবে সঘন ঝাঁকানি সহ্য করিতে হইবে ; ঝড়-জল, বর্ষা-বাদল, রৌদ্র-ছায়া, রাত-দিনের কোনও তফাৎ নাই, সব অবস্থায় সমভাবে পুরাতন পথে এই সনাতন যান বিরামবিহীন চলিতে থাকিবে, ইহারই উপরে জোয়াল চাপিয়া বসিয়া নিমীলিত চোখে ঝিমাইতে ঝিমাইতে দক্ষিণে-বামে পাচন-বাড়ি চালাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তবে এক দিক হইতে একটা সুবিধাও আছে—

গোরুর গাড়ীর গোরু এ বন্ধু, বোঝাই গাড়ীর গোরু ;—
এদের চালাতে লাগিবে না ভাই শিঙা বেণু ডম্বরু !
হাতের গোড়ায় যে কচা মিলিবে পথের পাশের বনে,
তারি ঘায় ঘায় যাবে ঠায় ঠায় পরম তুষ্ট মনে।

কিন্তু শেষে গিয়া কবি বলিতেছেন,—জীবনের পথে যাঁহারা চিরদিন পাল তুলিয়া দাঁড় বাহিয়া জীবনতরীই বাহিয়া গেলেন—দেবতা তাঁহাদের তরীতেই কাণ্ডারী হইয়া থাকুন; কিন্তু তাঁহার নট্‌ঘটে খানা-ডোবার পথে ক্যাঁচর-কোঁচর-চলা এই জীবনের গোরুর গাড়ীতে গাড়োয়ান-গিরি করা তাঁহার পোষাইবে না।—

জানা আছে তব কালবোশেখীতে হাল ধরে' ঢেউএ দোলা
জান কি বন্ধু! কাঁধে চাকা-মেরে দকে-পড়া গাড়ী তোলা?
তরী বাওয়া আর গাড়ী খেদান'য় অনেক তফাৎ ভাই,
এর বাড়া আর গৌরবহারা হীন কাজ কিছু নাই।
যা থাক্ আমার বরাতে বন্ধু, করিব না অপমান—
চিরদিবসের কাণ্ডারী ধরে' করে' দিয়ে গাড়োয়ান!

কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামভূমিতে ভগবান্ একবার অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শুনাইয়া গিয়াছিলেন; কবি তাঁহার জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়া পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বদলে পাইয়াছেন 'জীবন-মরুক্ষেত্র', আর তিনি সারতত্ত্ব যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা হইল 'জীবন-মরুক্ষেত্রে শ্রীমদ্-দুর্ভাগবদ্‌গীতা'। এই 'দুর্ভাগবদ্-গীতা'য় তিনি যে সত্য, যে তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাইয়াছেন তাহা তাঁহাকে প্রেরণা জোগাইয়াছে শুধু 'বদ্‌নাম'-সংকীর্তন-এর।

নামমাহাত্ম্য দু'আনা সত্য—তাই সকলের জানা;
কিন্তু বন্ধু বদ্‌নাম তব সত্য চৌদ্দআনা।

নামকীর্তনে স্বেদ পুলক ত বাহিরের ত্বকে জাগে,
বদ্‌নামসংকীর্তনে ভাই হাড়ে যে বাতাস লাগে!
বন্ধু, এ কার পাপ?
এত দোষ, ত্রুটি, এত অন্যায়, এত যে দুঃখ তাপ!
(নবপন্থা, মরুশিখা)

এই প্রশ্নটিই হইল মানুষের ভিতরকার বিদ্রোহী আদিম শয়তানের আদিম প্রশ্ন। যিনি চরম সত্য তিনি ছাড়া ত আর কোথাও কিছুই নাই; তবে যে সৃষ্টির মধ্যে এত দোষ-ত্রুটি, এত অন্যায়-অবিচার, এত দুঃখ তাপ—তাহার জন্য মূলে দায়ী কে? মানুষ যদি তাঁহারই পোষাক-পরা রূপ হয় বা তাঁহারই হাতের ক্রীড়নক হয়, তবে এগুলির জন্য সে কতখানি দায়ী? যদি বলা হয়, এগুলি ব্যতীত তাঁহার সৃষ্টির লীলা সম্ভব নয়, তবে প্রশ্ন হইবে—

গগনে গগনে জীবনে জীবনে জ্বলিতেছে যত জ্বালা,
গাঁথা হয় কোন্ দিগ্‌বিজয়ীর নিষ্ঠুর জয়মালা।
(নবপন্থা, মরুশিখা)

কবির মতে জীবনের এই সব প্রশ্নের কোথাও কোনো সন্তোষজনক জবাব নাই। জীবনের পিছনে যে মরণ তাড়না করিয়াছে সেই মরণেরও কোনও তত্ত্ব নাই। এই মরণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে গিয়া যাঁহারা ধর্মের পন্থা আশ্রয় করিয়া মন্ত্রবাদী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা ঠিক সেই ভূতভীত পান্থের মত, যাহারা রাত্রির অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে নিরুপায় হইয়া গান ধরে—

ধ্যানের জ্ঞানের ওপার হতে বিফল ফিরিল যারা,
নিয়ত বিকট ওঁ হ্রীং ফট্ প্রলাপ বকিছে তারা।
(জীবন ও মৃত্যু, মরুশিখা)

জীবনের এই দুঃখ-জ্বালার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে সকলে মোক্ষ-মুক্তির পথ বাৎলাইয়া দিয়াছেন; কবি বলিতেছেন,—পরম মোক্ষ, পরম নির্বাণ হইল নিজ্ঝুম ঘুমে। একটি ব্যঙ্গ-গভীর সুরে কবি ভবরোগের ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার 'ঘুমিওপ্যাথি'র মধ্যে।

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিজ্ঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম!

সেই জুড়াবার ঠাঁই;—
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
(ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক : মরীচিকা)

এই 'ঘুমিওপ্যাথি'র ব্যবস্থার মধ্যে বেদনাহত কবি-হৃদয়ের গভীর ব্যঙ্গ মিশ্রিত রহিয়াছে। জাগিয়া থাকিয়া সচেতন মন লইয়া সৃষ্টির দিকে জীবনের দিকে চাহিয়া থাকিলেই ত যত বিপদ্—তবেই ত শুধু অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা—ব্যর্থতার অপমান গ্লানি। বিপদের উপরে আরও বিপদ এই—চোখ মেলিয়া সব দেখিয়া শুনিয়াও হাসিয়া বলিতে হইবে, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তত্ত্বজ্ঞানী বলিবেন,—সুখ-দুঃখ এই দুইটাই ভ্রম, যাহা সত্য তাহা সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই অতীত। কবি বলিলেন, মানুষের বাস্তব জীবনে সুখ-দুঃখ এই দুটাকেই

চোখ মেলিয়া কখনও ভ্রম বলা যায় না, চিত্তকে যে অনুভূতি-হীন অবস্থায় লইয়া গিয়া উভয়কেই ভ্রম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা ত ঘুমেরই নামান্তর!

যদি বলো তুমি, সুখ-দুখ নাই—দু'টাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম!
জারি করো তবে খ্যাতি,
এ ভববোগেব নব চিকিৎসা আমাব "ঘুমিওপ্যাথি"।
ঝুম্ ঝুম্ নিঝ্‌ঝুম—
মেঘের উপরে মেঘ জ'মে আয়—ঘুমের উপর ঘুম।
(ঘুমের ঘোরে, দ্বিতীয় ঝোঁক)

যে তাহাব সহানুভূতিশীল চিত্ত লইয়া জীবনকে অনুভব কবিতেছে তাহাকে শুধু মাত্র যুক্তি-তর্ক দ্বাবা তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে; তাহার সমগ্র সত্তার অনুভূতি শুধু কথার জালে ঢাকা পড়িবে না—যুক্তি অপেক্ষা তাহার সাক্ষাৎ অনুভূতি অনেক বেশি গুণে খাঁটি। সে অবস্থায় তাহাকে যদি ভুলাইয়াই রাখিতে হয়, তবে,—

বন্ধু, করুণা করো—
তন্দ্রার জাল ছিঁড়িয়া ডুবাও ঘুমেতে গভীরতর!
(ঐ, পঞ্চম ঝোঁক)

কবি বলিবেন, এই ঘুমের আড়ালে বা স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-সংহরণের মধ্যে শুধু মানুষই যে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া শান্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা নয়,—বিধাতার

কথা আমরাও যখন শুনি তখন তাঁহাকে গুহাহিত, আত্ম-সংহৃত স্বপ্নমগ্ন বলিয়াই আমরা জানি; বিধাতার যে এই অবস্থা ইহাও আর কিছু নয়, ইহাও হইল—

সারা বিশ্বের বেদনা বহিয়া কেমনে জীবন চলে
বুঝেছি প্রাণটা ঠাণ্ডা রেখেছ 'ঘুমিওপ্যাথি'র বলে।
(ঘুমের ঘোরে, সপ্তম ঝোঁক)

এই ঘুমের কথাটাকে কবি সর্বদাই কিন্তু একটা তরল ব্যঙ্গের সুরে ব্যবহার করেন নাই; এই ঘুমের একটি অতি গভীর রূপ দেখিতে পাই কবির 'মরুমায়া'র 'মুক্তি-ঘুম' কবিতায়। সেখানে দেখিতেছি,—

ঘুমাও ঘুমাও ভাই,
জীবনে মরণে কোনোখানে কভু সত্য মুক্তি নাই।
ব্রহ্মা জপিছে মুক্তিমন্ত্র বিফলে কল্প ব্যেপে',
মুক্তি না পেয়ে ভোলা শঙ্কর মাঝে মাঝে যায় ক্ষেপে'।
জল হ'তে তুলে শুক্তি ভাঙিলে মুক্তা মুক্ত নয়,
দল বেঁধে তারা নূতন বাঁধনে কণ্ঠে দুলিয়া রয়।
রূপের অধীন দিব্য নয়ন, রেখার অধীন ছবি,
ছন্দ-অধীন স্বাধীনতা-গীতি, বন্দনাধীন কবি।
ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধন-লীলা,—
চরকা ঘোরে ত ঘোরে নাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা!
সৃষ্টি ত শুধু মুক্তির গায়ে বন্ধন পাকে পাক,—
এরই মাঝে থেকে মুক্তি বন্ধু, সৃষ্টিছাড়া সে ডাক।
(মুক্তি-ঘুম, মরুমায়া)

প্রকৃতির যেদিকে তাকান যায় সর্বত্রই এই মুক্তির নামে বন্ধনের আয়োজন। মাটির কারার নীচে বীজেরা মুক্তির তপস্যায় নিজেদের বক্ষ চিরিয়া দিতেছে, সেই বুক-চেরা তপস্যারই ফলে 'দীঘল তালের শিরে' মুক্তির ধ্বজা উড়িতে থাকে; কিন্তু সেই মুক্তির আনন্দে তালের আকণ্ঠ যখন রসে ভরিয়া ওঠে তখন 'ক্লিষ্ট মানব সে রস ভুঞ্জি' মাতাল হইয়া বসে! শুধু তাহাই নয়—

কে দেখে বন্ধু, মুক্ত বীজের নিশানের তলে তলে
ফলের কারায় নব বীজ হায় বাঁধা পড়ে দলে দলে।
একক বীজের মুক্তি
সাথে বহি' আনে লক্ষ বীজের নব-বন্ধন-চুক্তি।
(মুক্তি-ঘুম, মরুমায়া)

মুক্তির আশায় যে চির-ক্রন্দন তাহাই ত আনে মহা জাগরণ; কিন্তু মুক্তি যখন কোথাও কখনও নাই, তখন আর এই জাগরণের তাৎপর্য কি? সুতরাং

ঘুমা গো বন্ধু ঘুমা
শুনিস্ নে ভাই মুক্তির লাগি' কাঁদিছে স্বয়ং ভূমা।
... ...
তাই আমি যারে ভালবাসি তারে পরাই ঘুমের টিপ্,
ঘুমাও বন্ধু ঘুমাও ঘুমাও, এই নিবাইনু দীপ!
যে ঘুম ঘুমায়ে শঙ্কর-আঁখি চির-আধনিমীলিত,—
যে ঘুমে পাগল সাগরের হাওয়া হয় গিরি-গুহাহিত,—

সেই ঘুম হ'তে এনে
তোর চোখে আজ দিলাম বন্ধু ছকু-খানসামা লেনে। (ঐ)

উপরে আমরা কবি যতীন্দ্রনাথের যে আপোষহীন রূঢ় অবিশ্বাসের কথা আলোচনা করিলাম, ইহার ভিতরে কোনও দার্শনিক সত্য-মিথ্যা ঠিক-বেঠিকের প্রশ্নই আসে না; ইহা বিশুদ্ধভাবেই একটি কবি-মানসের স্বাতন্ত্র্য। সেই স্বাতন্ত্র্যের উপরে জড়বাদী অবিশ্বাসী বিংশ শতাব্দীর যুগ-প্রভাবকে নানা ভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু এখানে সেই সাধারণ যুগ-মানসও একটি বিশেষ কবি-মানসের ভিতরে কেন্দ্রীভূত হইয়া একটি স্পর্শযোগ্য বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রধর্মী অন্যান্য কবিগণের সহিত যতীন্দ্রনাথের যে তফাৎ তাহা মানসিক গঠনের একটা মৌলিক তফাৎ। এই জন্য শুধুমাত্র যুক্তি-তর্কের দ্বারা যতীন্দ্রনাথের মতামত যাচাই করিতে গেলে একটা একদেশদর্শী মানসিক প্রতিক্রিয়ার দুর্বলতা হয়ত লক্ষ্য করা যাইবে। আবার ইহাও ঠিক যে, বিশুদ্ধ ভাব-সম্বেগ হইতে যতীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় সকল কবিতার উৎসারণ নহে; তাঁহার কবিতা-কুমার-সম্ভাবনায় ভাব-পার্বতীর সহিত রুদ্ধশ্বাস ধ্যানশঙ্করের মিলনের অপেক্ষা থাকিত। কিন্তু তাঁহার এ-জাতীয় সকল কবিতার ভিতর দিয়া কবি হিসাবে যখন তাঁহাকে বিচার করিব, তখন লক্ষ্য করিব কবির বলিষ্ঠ মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য—যাহা কাব্য-কলার হট্টগোলের মধ্য হইতে তাঁহাকে একক রূপেই চিনাইয়া দেয়।

কিন্তু লোকের অবিশ্বাসকে আমরা আবার এত সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না; তাই হয়ত কেহ বলিব, আসলে যতীন্দ্রনাথ অবিশ্বাসী ছিলেন না,—তাঁহার বাহিরের অবিশ্বাসের ভিতরকার রূপ হইল একটা রামপ্রসাদী মান-অভিমান। বহু কালের রামপ্রসাদী সুরে অভ্যস্ত আমাদের বাঙালী-মনের এই রামপ্রসাদী ব্যাখ্যার দিকেই সহজাত ঝোঁক; কিন্তু আমার বিশ্বাস এ-ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালীর মধ্যেই একটি বিরল ব্যতিক্রম। পরবর্তী জীবনে চিত্তের পরিবর্তন এবং পরিণতি ঘটিয়াছিল, এবং প্রথম বয়সে যে কবি বিশ্ব-জনকে ডাকিয়া দ্বিধাবিহীন দৃপ্ত কণ্ঠে 'জীবন মরু-ক্ষেত্রে' রচিত 'দুর্ভাগবদ্গীতা' শুনাইতে চাহিয়াছিলেন, তিনিই শেষ বয়সে কুরুক্ষেত্রে রচিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'রই মর্মানুবাদ করিয়া কর্মফল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম যুগে যে কবির অবিশ্বাস তাহা কোনও গভীর বিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন রূপান্তর বলিয়া মনে হয় না,—নিখিল জড় এবং নিখিল চৈতন্যের ধারণার মধ্যে নিখিল জড়ই তাঁহার কবি-চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল—নিখিল চৈতন্য মোহতন্দ্রার ন্যায় সেই জড়ের মধ্যেই আত্মবিলীন করিয়া দিয়াছিল। পরবর্তী জীবনে এই মৌলিক ধারণার মধ্যে যখন পরিবর্তন দেখা দিল, জড় আবার যেদিন চেতনের মধ্যে আত্ম-বিলোপের প্রবণতা দেখাইল, তখনই আবার কবি-মানসের মধ্যেও বেশ লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হইল। প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি মান-অভিমানের মনোভাব কবির গড়িয়া উঠিয়াছিল উত্তর কালে, যখন প্রেমের

মধ্য দিয়া তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এক প্রেমের দেবতাকে।

॥ ৭ ॥

যতীন্দ্রনাথের একটা সাধারণ পরিচয় আছে রোম্যান্টিক্-বিরোধী বলিয়া। রোম্যান্টিক্-বিরোধিতা এবং ধর্ম-বিরোধিতা যতীন্দ্রনাথের একই মনোধর্মের পরিচায়ক। ইহার কারণ হইল, আসলে কাব্যের ক্ষেত্রে রোম্যান্টিকতা এবং ধর্মাশ্রয়ী 'মিষ্টিসিজ্‌ম্' এতদুভয়ের সম্পর্ক একটি 'তর-তমে'র সম্পর্ক মাত্র। যে মনোবৃত্তি মানুষকে বাস্তববিরোধী করিয়া তুলিয়া স্পষ্ট এবং ধ্রুবকে ত্যাগ করিয়া অস্পষ্ট অধ্রুবের তৃষ্ণায় 'কি-জানি' ভাবে মাতাল করিয়া তোলে, তাহাই ক্রমপরিণতির গভীরতা লাভ করিয়া একটি অস্পষ্ট 'চেতন একে'র টানে চিত্তকে একাগ্র করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই নিয়মই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ প্রথমেই যেখানে 'অজানাটা অজানাই' এবং 'কোনোখানে সে যে নাই' বলিয়া পায়ের নীচের কঠিন মাটির উপরে সটান দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেইখানেই তিনি তাঁহার মৌলিক মানসধর্মে রোম্যান্টিক্-বিরোধী এবং ধর্ম-বিরোধী হইয়া উঠিলেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে—'ইষুরিব দীর্ঘদীর্ঘীকৃতঃ'—সজোরে বাণ ছুঁড়িলে তাহা যেমন একই গতিবেগে চর্ম ভেদ করিয়া ক্রমগভীরে গিয়া আঘাত হানে, তেমনই যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যে মনোবৃত্তির তীক্ষ্ণতা রোম্যান্টিকতার পাতলা ঝিল্-

মিল্ আবরণ ভেদ করিয়াছে, তাহা তাহার সহজ গতিপথেই ধর্মবোধের গভীর মর্মমূলেও গিয়া অতি স্বাভাবিক ভাবেই আঘাত হানিয়াছে। সেই আঘাতটা কতখানি সত্য-মিথ্যা, ঠিক-বেঠিক, সেই প্রশ্নটাই এ-ক্ষেত্রে বড় হইয়া দেখা দিলে চলিবে না, তাহার শাণিত তীব্রতা আমাদের মর্মমূলেও কতখানি আত্মানুভূতির তীব্রতা জাগাইয়া তুলিযাছে ইহার সার্থকতা সেই বিচারে। যতীন্দ্রনাথের কবিতা তাই মদির মোহাবেশ সৃষ্টি করে না,—চেতনার কম্প্র-উদ্বোধের মধ্যে তাহার হ্লাদজনকতা।

নঙর্থক ভাবে যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যাহা রোম্যাণ্টিক্-বিরোধিতা এবং ধর্ম-বিরোধিতা অস্ত্যর্থক-ভাবে তাহাই তাঁহার বলিষ্ঠ মানবিকতা। মানুষের উপরে গভীর শ্রদ্ধার আনুষঙ্গিক রূপেই দেখা দিয়াছে মানুষের বাস্তব-জীবন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং আস্থা। স্বর্গের দেবতাকে যদি তিনি তাঁহার কাব্যে অস্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাহা মর্ত্যের মানুষের প্রতিষ্ঠার জন্য। যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বাস করিত যে একটি আদিম কালের বিদ্রোহী—তাহার লক্ষ্য ছিল জ্ঞানবৃক্ষের ফল, আত্ম-প্রবঞ্চনার সুখ-স্বপ্নের স্বর্গ তাহার কাছে ছিল অসহ্য। মূঢ়তার মধ্য দিয়া বিধির বিধানের প্রতি আনুগত্য যে মনুষ্যত্বের চরম অস্বীকার ; জ্ঞানের ফল—সত্যকার জীবনবোধের ফল—যদি সংসারের দাবদাহের মধ্যে টানিয়া আনে তবে তাহাই শ্রেয়ঃ, কারণ সেখানে শান্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা আছে। এই জন্য যতীন্দ্রনাথ

বলিয়াছেন, বিধাতা যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহার দেওয়া অজস্র দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করিয়া তিনি বিধাতাকে ক্ষমা করিতে রাজি আছেন; কিন্তু যে অপমান তাঁহার মনুষ্যত্ব-বোধের কাছে চরম অসহ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইল এই গভীর দুঃখকে তত্ত্ব ও রহস্যের প্রলেপে ভুলাইয়া দিবার অপচেষ্টা। দুঃখী মানবাত্মার দুঃখই ত মান! সেই মানকে অপমানে পরিবর্তিত করিয়া তুলিবার জন্যই বিধাতার দয়া-মায়া-লীলার পরিহাস; এই যে সংসারের আড়ালে থাকিয়া মায়ার ইন্দ্রজাল ছড়াইবার চেষ্টা—ইহা ত ক্ষত্রোচিত সাধু চেষ্টা নয়—এ যে 'মেঘের আড়ালে কর মায়া-রণ'—মানী মানুষের মাথা নত করিয়া দিবারই ত এই অপচেষ্টা। নর-নারায়ণে—মানুষ ও দেবতার মধ্যে—চলিয়াছে এই অসম-রণ, রণাঙ্গনে মানুষের কোনও আবরণ নাই, ছলনা নাই,—সে আত্ম-শক্তিবাদী, কিন্তু অজ্ঞাত রহস্যের অন্তরালে দেবতার মায়া-রণ! এই অসম-রণের ফলে দেবতা হয় তো কোথাও কোথাও জয়লাভ করিয়াছে,—এক ভ্রান্তিরূপিণী ছলনাময়ী মহামায়ার পদতলে মহাকাল আপনাকে বিকাইয়া বসিয়াছে, প্রিয়ার মিলনে প্রেমিক প্রেমের দুঃখ ভুলিয়া গিয়া কাম-সুখ-মোহে শির লুটাইয়া দিয়াছে—তাহাকেই পায়ে দলিয়া জাগিয়াছে ছিন্নমস্তার ছিন্নমুণ্ডে অধীর হাসি: যে স্বেচ্ছাচারিণী নির্দয়া শক্তি মায়ের বুক হইতে সন্তান কাড়িয়া লইয়া ছিন্নমুণ্ড কটিতে দোলাইতেছে, রক্তচেলি পরিয়া সেই মাতা আসিয়া তাহারই চরণে রক্তজবা অর্পণ করিতেছে! এইখানে মানুষের পরাজয়—এইখানে

তাহার অপমান। কিন্তু তবুও কবির হৃদয়ে মানুষের বীর্য এবং পৌরুষের উপরে গভীর আস্থা—

চিরবিদ্রোহী মানব-আত্মা—আজিও তোমার মানে নি বশ,
জনে জনে তারা বিশ্বামিত্র হরিতে বিশ্বকর্মা-যশ।
কাম পুড়াইয়ে সৃজিয়াছে প্রেম, দেহ মথি তারা তুলিছে স্নেহ;
মনের ফানুস্ ছেড়েছে আকাশে, আকাশ বাঁধিয়া গড়েছে গেহ
এ জগতে তব স্বেচ্ছাতন্ত্র,—তাই নর তার জবাব দিতে
গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতরে প্রাণপাত করে এ পৃথিবীতে।
(অপমান, মরুশিখা)

এই বিদ্রোহের জ্বালা লইয়াই কবি শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন—

দুঃখ আমারে দিয়েছ বন্ধু, সে নিঠুরতা ত ক্ষমেছি আগে;
দুঃখের মোর হ'ল অপমান;—রাবণের চিতা চিত্তে জাগে! (ঐ)

মানুষের দুঃখের মধ্যে যে অসহ জ্বালা রহিয়াছে, তাহাকে সহনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাতেই মানুষের ধর্মবোধ—মর্ত্যের পরপারে স্বর্গের কল্পনা। সে কথা অস্বীকার করিয়া যতীন্দ্রনাথ দুঃখের মহিমা-বোধের দ্বারাই দুঃখকে মহনীয় এবং সহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্য নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ যেদিন 'মর্ত্য হইতে বিদায়' গ্রহণ করেন, সেদিনকার সেই নারায়ণকে দিয়া কবি বলাইয়াছেন,—

ক্ষমিও মানব! মানব-লীলায় দেবতার যত চুক্;—
আজ নিশি ভোরে নারায়ণ আর নরে দেখাবে না মুখ,

কেঁদোনা রে আঁখি মানুষের মত, প্রশান্ত হও মন,—
হের নরতনুবিমুক্ত তুমি গুণাতীত নারায়ণ!
দিয়ে যাই বর,—নরের যেটুকু পাইলাম পরিচয়,—
নর চিরদিন নর থাকে যেন, নারায়ণ নাহি হয়!

(মর্ত্য হইতে বিদায়, মরুশিখা)

মানুষের ধর্মবোধ সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের একটা ধারণা ছিল, মানুষের স্বাধীন মনুষ্যত্ববোধের একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়। এই জীবনকে যদি আর একটা অধ্যাত্ম-জীবনের ছায়া মাত্র করিয়া না দেখিয়া ইহাকেই চরম সত্য করিয়া দেখিতে পারিতাম, তবে সেই স্বাধীন জীবনদৃষ্টি আমাদিগকে জীবনের সকল সুখ-দুঃখকে সবল ভাবে গ্রহণ করিবার অধিকার দিত। আমরা একটি অধ্যাত্ম জীবন এবং সেই জীবনের অধিষ্ঠাতা একটি প্রিয়তম জীবন-দেবতার কল্পনা করিয়া স্বর্গীয় প্রেমের স্বর্ণ-পিঞ্জরে বাঁধা পড়িয়াছি। কবি এই স্বর্ণ-পিঞ্জর হইতে এবং এক 'চির নির্মমে'র প্রেম হইতে মুক্তি চাহিয়াছেন। তাই 'প্রেম-পিঞ্জর' (সায়ম্) কবিতাটিতে বলিয়াছেন,—

কঠিন কনকের সুঠাম পিঞ্জর,
দুয়ার রুধি' তার পালিছ পোষা পাখী,
তোমার সোহাগের পরশ পেতে তার
চঞ্চু চঞ্চল রক্তে মাখামাখি।
মিটে ত ক্ষুধা তৃষা নিত্য নিয়মিত
শতেক উপচারে সতত উপচিত,
বসিয়া হেম-দাঁড়ে,—আকাশ তবু তারে

খাঁচার পরপারে করে যে ডাকাডাকি ;
মুক্তি মাগে তাই তোমার পোষাপাখী।

মনুষ্য-জীবনের উপর হইতে স্বর্গীয় প্রেমের এই রশ্মিপাত বন্ধ হইলে হয়ত মনুষ্যত্বের মহিমা আর তেমন ইন্দ্রধনুর সপ্ত রঙে রঙিন হইয়া উঠিবে না, এই অধ্যাত্ম-বোধের খাঁচা হইতে বাহির হইয়া মানুষ সম্মুখে শুধু দেখিবে আশ্রয়হীন অনন্ত শূন্য —সে শ্রান্ত পাখা ঝাপটাইয়া শুধু গভীরতর বেদনার অধিকারীই হইয়া উঠিবে, কিন্তু কবির মতে সেই দুঃখভরা সংগ্রামদীপ্ত স্বাধীন জীবনের আদর্শই পরম শ্রেয়ঃ। ধর্মের স্বর্ণাভা সত্যকার বেদনার কিছুই লাঘব করে না,—অধিকন্তু

জান কি বন্ধুয়া রতন সোনা দিয়া
যতনে রচা এই খাঁচাটি মনোহর।
আমার আঁখিশেষে সুদূর নীলদেশে
ছায়ায় এঁকেছে সে কি মহাপিঞ্জর।
খাঁচার ফাঁকে আঁখি আকাশে যত চায়
নীলিমা ভরে' গেছে কনক-শলাকায়।
কি ফল হ'ল কবি, তোমার প্রেম লভি'
আকাশও হ'ল যদি খাঁচারই সহোদর ?
বাঁধন-ক্লান্তিতে কাঁদে যে অন্তর।

এইখানেই যতীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণ হইতে পৃথক্। আমাদের সাধারণ যে বন্ধন ও মুক্তির আদর্শ রহিয়াছে তাহাতে মর্ত্যজীবনই বন্ধন,—অধ্যাত্মজীবনের ভিতরে আমরা

লাভ করিতে চাই মুক্তির আনন্দ ও মহিমা ; যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অধ্যাত্মজীবনই বন্ধন—স্বাধীন বাস্তব মর্ত্য জীবনের মধ্যে তিনি পাইতে চান মুক্তির আনন্দ ও মহিমা। তাই তিনি বলিলেন,—

হে চির নির্মম হে মম প্রিয়তম
সোনার পিঞ্জরে দুয়ার খুলে দাও,
শেষের সোহাগের পরশ বুলাইয়ে
বাহুতে দুলাইয়ে আকাশে তুলে দাও।

আকাশ এখানে অনিশ্চয়তায় পূর্ণ স্বাধীন মর্ত্য-জীবনের সীমাহীন বিস্তার।

প্রকৃতি সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথ যত কবিতা লিখিয়াছেন সেখানেও দেখি, প্রকৃতি মানুষকে কোনও দিন কিছু শিক্ষা দিতে পারে, এ-কথাটাকে যতীন্দ্রনাথ তীব্রস্বরে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, মানুষ যে প্রকৃতি হইতে অনেক বড় এই কথা-টাকেই তিনি বার বার নানা ভাবে স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, আমরা দেখি, প্রকৃতি যাঁহার অলাভ-ব্যবসায়ের চটকদার বিজ্ঞাপন তাঁহার সম্বন্ধেও কবি বলিয়াছেন,—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে কি নাই।
(দুঃখবাদী, মরুশিখা)

মানুষ সম্বন্ধে কবির এই পৌরুষ দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা তাঁহার

রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি হইতে গৃহীত চরিত্রগুলি অবলম্বনে লিখিত কবিতাগুলির ভিতর দিয়াও একটা সতেজ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার 'বিভীষণ', 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ', 'শরশয্যায় ভীষ্ম', 'কৃষ্ণা' প্রভৃতি কবিতার ভিতর দিয়া প্রত্যেক চরিত্রের মানবতার দিকটাই নানা ভাবে কবি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের অলৌকিকতার দিকটা তিনি যতটা পারেন ঘুচাইয়া দিয়া স্পষ্ট রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনের রূঢ় লৌকিকতার দিকগুলিকে। কবির মতে মানুষের ইতিহাসের সত্যযুগ এখনও অনাগত, কারণ মানুষ এখন পর্যন্ত তাহার ভিতরকার সত্য মানুষকে স্বীকার করিতে শেখে নাই; কিন্তু বহু বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া আমরা দাঁড়াইয়া সেই সত্যযুগের সন্ধিক্ষণে যখন—

ফেটে যাবে, ফেটে যাবে
বিরাটের এই বেলুনায়িত হিরণ্যগর্ভ উদর।
বেরিয়ে আসবে নবজন্ম লাভ ক'রে
লক্ষ কোটি নরসহোদর। (নবজন্ম, ত্রিযামা)

'শিব ভেঙে মোরা মানুষ গড়িব'—ইহাই ছিল কবির সঙ্কল্প। তাই কবি গাজুনে শিবকে তাঁহার পাগুলে নাচন থামাইতে বলিয়াছেন—তাঁহাকে মানুষ হইয়া মানুষের সাথে নামিয়া আসিয়া নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।—

বহুদিন গত চৈতি গাজন,
মেঘে মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,
হাতের ত্রিশূল হাটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গ'ড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।
আমাদেরি সাথে চল গো ঠাকুর ওই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল পাথরও যেন গো ফাটে।

... ...

শঙ্কর! হও সঙ্কর্ষণ,
মাটি-ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা। (ভাঙা-গড়া, ত্রিযামা)

কবি তাঁহার 'পঞ্চারতি' (ত্রিযামা) কবিতার মধ্যে মহাদেবের আরতির যে মন্ত্রগান করিয়াছেন সেখানে মহাদেব বিশ্বদেবতা। এই বিশ্বদেবতা শব্দের অর্থ, বিশ্বের অন্তর্নিহিত কোনও অধ্যাত্ম পুরুষ নহেন, বিশ্বদেবতা এখানে বিশ্বজীবনের পরিপূর্ণ মূর্তি। কন্যাকুমারী এই বিশ্বজীবন-রূপ মহাদেবের ধ্যানে নিত্যনিরতা, সিংহলের টীকা কপালে পরিয়া লবণ-সমুদ্র এই মহারুদ্রদেবতার জপে মগ্ন, প্রবালের দ্বীপে ঝলমল করে এই বিশ্বদেবতারই হাড়মালা; নগ-নাগময় যবদ্বীপ,

সুমাত্রা, বলিদ্বীপ,—ব্রহ্ম-শ্যাম-মালয়, সুবিশাল গোবি, ‘সুমেরু-সমুত্থিত মহাতপা ইউরাল’, কৃষ্ণ, কাস্পিয়ান, ককেশস, ইরাণ, হিন্দুকুশ—পাপমর্দন জাহ্নবী-জর্দন সর্বত্র আরত্রিক শুধু এক দেবতার—সে দেবতা বিশ্বজীবনরূপ মহাদেবতা। সেই দেবতা—

মানব-দানব-দেব সবার প্রণম্য,
রুদ্রে রৌদ্র ওঁ ওঁ সোমে সৌম্য,
প্রভাতে কুমারী-চিতে ওঁ ব্রতবন্দন
যুগলমিলনরাতে ওঁ ভুজবন্ধন,
ওঁ মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত যাজ্ঞিক,
ওঁ বৈরাগ্যের ধ্যান অপরাহ্ণিক,
কণ্টকায়িত ওঁ বিল্বপাদপমূল,
শিশির-অশ্রুস্নাত ওঁ ধুস্তুরা ফুল,
ডম্বরু ডমডম পিনাকের টঙ্কার,
বেণু-বীণা-মৃদঙ্গে সঙ্গীত-ঝঙ্কার,
ভাস্কর করে ওঁ ছেদনী ও হাতুড়ি,
শিল্পীর শৈলী ও কারুময় চাতুরী—

জীবনের এই প্রত্যেক অবস্থা ও রূপের মধ্য দিয়া ব্যক্ত যে মহিমা তাহাই সমগ্রতার রূপ লইয়া মহাদেব হইয়া জাগিয়া ওঠে—সেই জীবন-মহাদেবই কবির বন্দ্য।

বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখিবার সদাজাগ্রত প্রবৃত্তির অনিবার্য আনুষঙ্গিক রূপেই যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে

আর একটি প্রতিবাদ এবং সমবেদনার সুর—প্রতিবাদ সর্বপ্রকার অবিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে—সমবেদনা অসহায় লাঞ্ছিত এবং শোষিতের জন্য। এই অবিচার এবং স্বেচ্ছাচারী শোষণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন সর্বত্র—প্রকৃতির মধ্যেও—মানুষের সমাজ-দেহের মধ্যেও। মানুষের কৃত্যের জন্য মানুষকেই সাধারণতঃ দায়ী করা হয়; কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে যে অবিচার এবং শোষণ—তাহা ত' আমাদের কল্পিত বিধাতা পুরুষেরই দান। সুতরাং ক্ষোভ তাঁহার মানুষের বিরুদ্ধেও—বিধাতার বিরুদ্ধেও। দুনিয়া ভরাই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন—

দেখিনু তন্দ্রাভরে—

তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে।

(ঘুমের ঘোরে, তৃতীয় ঝোঁক, মরীচিকা)

এক দল বোবা লোক মুখ বুজিয়া শুধু খাটিয়াই মরিতেছে—তাহাদের শ্রমের ফল তাহারা ভোগ করিতে পারে নাই, যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহারা পরের প্রয়োজনেই টকাটক খাটিয়া মরিল। এই শোষণবুদ্ধির অনুকূলেই আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি আমাদের সব ধর্ম্মমত। এক জনের লীলার জন্য মানুষকে নিরন্তর শুধু আত্মবলি দিতে হইতেছে। এই বলি যত মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে, আমাদের ধর্মবুদ্ধির প্রলেপকে আমরা তত পুরু করিয়া তুলিতেছি—তাহার শোষণ-সমর্থক ব্যাখ্যাকে আরও গভীর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি।

জননীর কোল হইতে হঠাৎ কে আসিয়া তাহার স্নেহের দুলালটিকে কাড়িয়া লইতেছে ; কিন্তু—

ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক
দিতো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।
(ঐ, দ্বিতীয় ঝোঁক)

কিন্তু এই তত্ত্ব-বচনের তাৎপর্য কি? কবির মনে ইহার সোজা তাৎপর্য হইল মানুষ যেন আত্মভোগবিলাসী কোনও এক স্বেচ্ছাচারী শক্তিমানের হাতে নির্বাক্ পশুমাত্র—এবং সেই পশু সম্বন্ধে তিনি খেয়াল-খুশিতে যখন যেমন ব্যবস্থা করিবেন তাহা যে শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াই যাইতে হইবে তাহা নহে, বুকের আগুন এবং চোখের জল উভয়কেই রূপান্তরিত করিয়া লইতে হইবে আত্মসমর্পণের প্রশান্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানের মুখের হাসিতে। সমস্ত জিনিসটিকে গালভাথ [illegible] হইলে গিয়া দাঁড়ায় এই—

[illegible] অর্থাৎ—

যাহার পাঁঠা সে যেদিকে কাটুক, তাতে অপরের কি?
ছোলা কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এক কোপে বলিদান
পাঁঠার মধ্যে সে পাঁঠাটি আহা কত না ভাগ্যবান্!

পাঁঠার দুঃখ সুখ—

মার পায়ে দিতে নূতন সবায় রক্তে জমায়ে থুক!
(ঘুমের ঘোরে, দ্বিতীয় ঝোঁক)

সৃষ্টিভরা এই যে একটি নির্দয় সার্বিক শোষণের রূপ তাহা চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির কয়েকটি প্রতীকধর্মী কবিতায়

মধ্যে; 'মরুশিখা'র 'খেজুর-বাগান', 'মরুমায়া'র 'পাষাণ পথে', 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতা ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রসহীন এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে অযত্নে অবহেলায় বাড়িয়া ওঠে কাঁটাভরা খেজুর গাছ; দেহটি তাহার নবনী-কোমল নয়,—'বিষম রুক্ষ শুষ্ক কঠিন খেজুর গাছের ত্বক্'। যাহা রুক্ষ শুষ্ক তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া 'রস' বাহির করিতেই এক দল চাষীর সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও আনন্দ। সেই শোষণের উত্তেজনাতেই চাষী এক দিন—

ফাঁস-করা রসি বাখ্‌রায় কসি', কটিতে কাটারি গুঁজে',
বড় স্নেহে চাষা খেজুর-বৃক্ষ জড়াইল দুই ভুজে।

এবং সেই প্রেমেরই উত্তেজনায় চাষী কাটারি দ্বারা অবোধ গাছের মাথা পরিষ্কার করিয়া দিয়া চক্ষুদান করিল এবং তাহার পরই—

কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,
খেজুর-পাতার ফাঁস করে' ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।

এমনই করিয়াই দেখা যাইতেছে, সমাজ-জীবনের ঊষর ক্ষেত্রে অযত্নে অবহেলায় বাড়িয়া উঠিতেছে কঠিন কর্কশ রুক্ষ-শুষ্ক-দেহ কত প্রাণ—আর গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের 'কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি' কত চাষী রস-মাতাল হইয়া উঠিল,—সেই ক্ষরিত প্রাণরসের ব্যবসাতেই ভুঁড়ি বাগাইয়া রাতারাতি বড়লোক হইয়া উঠিল।—

এ ধরণী ভরি' খেজুর গাছের আবাদ করিল কেবা?
নয়নের জল-জ্বাল-দেওয়া চিনি কোথা কে করিছে সেবা?

অবেলায় ঝরা অশ্রু তাহার ভাঁড় ছেপে' গেঁজে উঠে ;—
সে নেশার আশে কোন্ মাতালের অধরে হাস্য ফুটে।
মোদের এখানে খেজুর-বাগানে কেঁদে কেঁদে নিশি ভোর ;
না জানি সেখানে হেসে খুন্ কোন্ রসখোর তাড়িখোর !

কবির এই যে রসখোর এবং তাড়িখোর সম্বন্ধে বক্রোক্তির ব্যঞ্জনা ইহা শুধু স্বৈরাচারী শোষক মানুষ সম্বন্ধেই নয়—সেই রসখোর এবং তাড়িখোরের পূর্ণপরিণতি যে বিধাতায় তাঁহার সম্বন্ধেও।

'মরুশিখা'র 'বাঁশীর গল্পে'র মধ্যেও এই নিষ্ঠুর নিপীড়ন এবং শোষণ এবং সেই পীড়িতের ক্ষতকে অবলম্বন করিয়াই বাঁশী বাজাইবার নিষ্ঠুর বিলাসের ব্যঞ্জনা ফুটিয়াছে।—

বাঁশের বুকে ক্ষত'র মুখে ফুঁয়ে বাজে সাতটা সুর,
নূতন বাঁশে নূতন বাঁশী বাজিয়ে কাটে রাত দুপুর।
গাইছে বেণু গেনুর ফুঁয়ে পরের বুকের মুখের গান,—
বাঁশ-বাগানে সামান চলে আষাঢ় রাতের ঝড়-তুফান।
হাসছে বাঁশী, বাজছে বাঁশী, চড়্‌চড়িয়ে ভাঙছে বাঁশ,
হেথায় ওঠে উৎস সুরের, হোথায় কাঁদে হা হুতাশ।
বাদল সাঁঝের বেদন-ভরা বাঁশ-বাগানের তল্‌দা বাঁশই
গোটা কতক ছ্যাঁকায় ভুলে' হ'ল ডোমের মুখের বাঁশী।

ডোমের ছেলে গেনু বাঁশের বুকে ছ্যাঁকা দিয়া বাঁশী করিয়াছে, সমাজের মধ্যে দুর্বল দরিদ্রের বুকে ছ্যাঁকা দিয়া ধন-বিলাসী ও মন-বিলাসীরা বাঁশী বাজাইতেছে—আবার মানুষের বুকে দুঃখ-দহনের ছ্যাঁকা দিয়া লীলাময় বংশীধারী

বাঁশী বাজাইতেছেন,—তাহারই পরিচয় দেখিতে পাই 'মরু-শিখা'র 'বীণা-বেণু' কবিতায়।

একটা গভীর সমাজ-সচেতনতার ভিতর দিয়া কবি প্রথম জীবন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে এক দল মানুষ যে শুধু অত্যাচারিত এবং শোষিতই হইতেছে তাহা নহে, তাহারা যে অপর শ্রেণীর ভোগ-বিলাসের করণ-উপকরণ রূপে নিরন্তর ব্যবহৃত হইতেছে, ইহাই যেন তাহাদের জীবনের এক মাত্র সার্থকতা। ফুলের প্রতীকে কথাটিকে কবি তাঁহার 'মরীচিকা' কাব্যেই প্রকাশ করিয়াছেন—

সার্থক তোরা ফুলকলি ;
আপনার হাতে ছিঁড়ে মালা গাঁথে
প্রিয়া, মোর গলে দিবে বলি'।
কান্না কিসের ভাই ?
মোদের মিলনে গন্ধ মিলাবে—
এতেও তৃপ্তি নাই ? (সার্থক, মরীচিকা)

ইহার মধ্যে যে ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহার পরিণত রূপ দেখিতে পাই 'মরুমায়া'র 'পাষাণ-পথে' 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতায়।

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে 'সেরা শহরে'র 'ইঁট-পাথরের বিরাট নগর' যখন প্রচণ্ড তাপে তাপে 'জ্বরঘোরে যেন ধুঁকে', এবং শহরবাসী যখন রুদ্ধশাসি ঘরে তড়িৎ-পক্ষের হাওয়ার ব্যবস্থা করে, তখন কবির দৃষ্টি পড়িয়াছে 'কানন-রাণীর শিশু-কন্যা' বকুলের প্রতি, কে তাহাকে তাহার শ্যামল পরিবেশ হইতে কাড়িয়া

আনিয়া লোহার খাঁচার মধ্যে আটক করিয়া মানুষের সেবার কাজে লাগাইয়া দিয়াছে! সেই বকুলের দিকে তাকাইয়া কবি বলিয়াছেন,—

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে শ্রেষ্ঠ শহরে পথ চলি আর ভাবি,—
কত না বকুল দিল তার ফুল মিটা'তে নরের দাবি!
(পাষাণ-পথে, মরুমায়া)

কবি জানেন, বকুল তাহার এই সব ফুল মানুষের ভোগ-বিলাসের দাবী মিটাইতে কখনই বড় ইচ্ছা করিয়া দেয় না—জোর করিয়া তাহাকে তাহার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিকাশ-সম্ভাবনার পথ হইতে টানিয়া আনিয়া অনির্বাণ ভোগস্পৃহার নিত্য নূতন দাবি মিটাইতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু শুধু মাত্র গায়ের জোরে অবাধ শোষণ সম্ভব নয়, শোষকশ্রেণী সে সত্যের সন্ধান ইতিমধ্যে হয়ত পাইয়া গিয়াছেন, তাই এক দিকে যেমন শক্তির আস্ফালন, অন্য দিকে তেমনি রাতারাতি চারি দিকে শোষণের অনুকূল ব্যাখ্যা-মতবাদের রঙিন্-মধুর আলাপন। চারি দিকে গড়িয়া উঠিতে থাকে ধর্মের তত্ত্ব সেবা-মাহাত্ম্যে—নন্দন-তত্ত্ব শিল্পীর আত্মরতির বিশেষাধিকার-বাদে—সমাজতত্ত্বের ত্যাগ মহিমায়; একই সঙ্গে সজোর চাবুক এবং মোলায়েম হাতবুলানি! তাই—

কত না বকুল দিল তার ফুল, কত ফুল দিল গন্ধ!
দেবে-নরে মিলে' ফুলের কপালে লিখে দিল সেবানন্দ।

ঘ্রাণ-লোলুপের করে প্রাণ সঁপা—সেই-ত চরম সুখ,
ফুল-জীবনের পরম স্বর্গ মিলন-মথিত বুক।
যদি সে মোক্ষ চায়,—
ভক্তজনের অঞ্জলিপুটে লুটাক্ দেবতা-পায়!
নির্যাতনের যতনে ভুলায়ে এই মত বার মাস
ভক্তিবিলাসী বিলাসভক্তে চালায় ফুলের চাষ।

কবি বলিবেন, এই যে মুখর হইয়া সেবামাহাত্ম্য প্রচার—ধর্মতত্ত্বের দিক্ দিয়াই হোক, আর কর্মতত্ত্বের দিক দিয়াই হোক—ইহার পনর আনাই হইল মধুর-ছলনায় শোষণকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিবার ফন্দি। সম্রাট্ শাজাহান তাঁহার প্রিয়ার স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার চেষ্টায় যে 'অপূর্ব অদ্ভুত' 'নব মেঘদূত' শ্বেতমর্মরে রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা তিনি নিজে ত 'সম্রাট্ কবি' খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—এবং আমরাও দেশ-দেশান্তরের যত প্রেমিক-প্রেমিকা বর্ষ বর্ষ ধরিয়া সেই সমাধি-সৌধের প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাই—

একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল!

কিন্তু যাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া কোটি কোটি টাকা রাজকোষে সংগৃহীত হইয়া এই শ্বেতপ্রস্তরের একবিন্দু নয়নের জল নির্মিত হইয়াছে তাহাদের সন্ধান আজ আর কেহ জানে কি? যে অসংখ্য শিল্পী তাহাদের মনের স্বপ্ন এবং দেহের শ্রম

সমর্পণ করিয়া এই সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহারা যে তাহাদের নবযৌবনা প্রিয়ার দেহ-মনের কোনও দাবিকেই মিটাইতে পারে নাই—শুধু ঘ্রাণলোলুপের করে প্রাণ সঁপিতেই তাহাদের মানস-মুকুল এবং হাতের নৈপুণ্য ঝরাইয়া দিয়া গেল, তাহাদের কথা তাজমহলের সম্মুখস্থ উদ্যানে বসিয়া কাহারও এক বার মনে পড়ে কি? তাহাদেরও হয়ত সম্রাট্ কবি শাজাহানের মতনই দেহ ছিল, প্রাণ ছিল, মন ছিল—আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল—প্রেম ছিল, সম্ভাবনা ছিল—তাই কবির প্রশ্ন,—

এত শোভা এত মধু এত বাস বিফলে কেন বা যাবে?—
অবলা ফুল যে কি বলিতে ফুটে, সে কথা কে কোথা ভাবে।

পাষাণ-পথের বকুল গন্ধে সহসা লাগিল হাঁফ,—
বুঝিনু,—এ চির-প্রবঞ্চিতের মর্মের অভিশাপ!
ফুলের গন্ধ নাই নাই ভাই,—কোমলের ব্যথা যত
কঠিনের বুকে বিফল ঘা দিলে লাগে গন্ধেরি মত!

এইখানেই সর্বাপেক্ষা অধিক আপত্তিকর বিড়ম্বনা। কোমলের ব্যথা যে-বুকে কোনও আঘাতই করে না সে-বুক তবু ভাল; কিন্তু যেখানে বিফল আঘাত করে সেইখানেই অত্যাচারিত কোমলের ব্যথা দেখা দেয় বকুলগন্ধের রূপে। অর্থাৎ আঘাতকে যেখানে আঘাত বলিয়া একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, অথচ সেই আঘাতের সম্পূর্ণ সুযোগটি নিজের

কাজে না লাগাইতে পারিলে আত্ম-সম্ভোগ ষোল মাত্রায় জমিয়া ওঠে না, সেইখানেই অবশ্যম্ভাবী প্রবৃত্তি ধর্ম নীতি, শিল্প-সৌন্দর্যের নানা কথার বুনানি দ্বারা সেই আঘাতের ব্যথাকে ফুলের গন্ধে পরিণত করিয়া তুলিবার। সেই বকুলের বেদনার সুরেই জাগিয়াছে কবির কাব্যে বন-কেতকীর বেদনা। শহরের বুকে এই বন-কেতকীর গুচ্ছ তিনি দুই পয়সায় কিনিয়াছিলেন সেই তথ্যটিও এ'প্রসঙ্গে বেশ ব্যঞ্জনাগর্ভ,—

বৌবাজারের মোড়ে,—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইএ মাংস থোড়ে,—
(কেতকী, মরুমায়া)

সেখান হইতে কবি বাদলা দিনের সন্ধ্যায় শহুরে মালীর মাথার ঝাঁকা হইতে কেয়াকুসুমের গুচ্ছ কিনিয়া বাড়িতে ফিরিলেন এবং 'শয়ন ঘরের হুকে' সেই 'ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী তুলিল মনের সুখে'। রাত্রে বাহিরে ঝর্ ঝর্ বর্ষা ঝরিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া দেয়া ডাকিতেছে— আর কবির ঘরে 'শয়ন-শিয়রে' সেই বনের কেতকী গন্ধ ছড়াইতেছে। কিন্তু বনকেতকীর সেই গন্ধ কবিকে কাব্যানন্দে মাতোয়ারা করিয়া রাখিতে পারিল না,— সারা রাত গভীর বেদনায় নিদ্রাবিহীন কবি শুধু ভাবিতেছেন :-

যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে!
আধ ঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি! (ঐ)

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে এই শোষণ-লোলুপতার ফলে শ্রমজীবী চাষী-মজুরদের যে আমরা কোনও দিনই মানুষের মর্যাদা দিতেই রাজি হই নাই এই খানেই কবির তীব্র ক্ষোভ এবং দরদ। লোভমত্ত এবং ক্ষমতামত্ত সংবিৎ-হীন সেই শ্রেণীটিকেই ডাকিয়া কবি বার বার বলিয়াছেন,—

পাঁচনি লইয়া গোরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে ;
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিক আঁটে !
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষা নদী,
জুটে না পারের কড়ি' ;
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাঁদায় কাঁটায় পড়ি' ;—
ক্ষুধার অন্ন, পরণের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের কর গো স্নেহ—
তারা মানুষেরই ছেলে।
* * * *
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের শ্রদ্ধা করো,
তারা মানুষেরই ভাই।

(মানুষ, মরীচিকা)

'মরীচিকা'র 'চাষার বেগার' কবিতাটির মধ্যেও দেখিতে পাই সেই একই ক্ষোভ এবং দরদ। গরিব চাষী, কায়ক্লেশে ক্ষেতখামার করিয়া গায়ের শ্রমে মাথার উপরে ছাউনি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে তাহার সাধ্য কি!

জীর্ণ চালে হ'ল না আর দেওয়া
　　কোথাও দু'টি পচা খড়ের গুঁজি,
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
　　মিললো না কি পল্লীখানি খুঁজি'?
সারা সনের অন্ন ছাড়ি'
　　যেতেই হবে রাজার বাড়ী!
স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথায়
　　মলিন হ'ল বুঝি!
যাচ্ছি চলো চক্ষু কান বুঁজি॥

'মরুশিখা'র 'গাড়োয়ানের গল্প'টিও এই সঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। গাড়োয়ান গাঁয়ের ঠাকুরের কাছে গল্প করিতেছে কেন সে ভিন গাঁয়ের হালুটে চাষা হইয়াও শেষ পর্যন্ত 'ভিটে ছেড়ে গাড়ী চালাই এসে তোমার দেশে'। কিন্তু আমাদের দেশের 'দা'ঠাকুর'গণ কি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া সেই গল্পটিও শুনিতে পারেন? সুতরাং গাড়োয়ানের গল্প শেষ করিতে হয় এই ভাবে,—

ঘরে শেষে লাগল আগুন, পূব্ জনমের ফল,
দাদা ঠাকুর! ঘুমিয়ে গেছে? চ' বাপ ধলা চল্।

'মরুমায়া'র 'মৎস্য-শিকার' কবিতার ব্যঙ্গাত্মক ব্যঞ্জনাও এই একই দিকে; দুনিয়া ভরা চলিতেছে শুধু দিনে রাত্রে মৎস্য-শিকার। এই মেছুরিয়াগণের মধ্যে সে-ই সর্বপ্রশংসিত শিকারী যে আহারের গন্ধে ভুলাইয়া আনিয়া টোপ গিলাইয়া ধরিয়া ফেলিবার এবং ধরিয়া ফেলিয়া নানা মুনাফার বাজারে তাহাকে দিয়া ব্যবসা চালাইবার হাজার রকমের ফন্দি-ফিকির জানে।—

নদী খাল বিলে, দীঘিকা ঝিলে, সব ঠাঁই ধরো মাছ,
চুনো-পুঁটি-রুই-মৃগেল কিছুই নেইকো তোমার বাছ।
কাল বৈকালে রাজাড়ার খালে 'লোভা'য় ধরিলে শোল,
পরশু প্রভাতে ক্ষেমির ডোবাতে পুঁটিতে ভরিলে খোল।
কত মতলব, নব নব টোপ, নিত্য নূতন চার,—
ঘ্যাচ্‌রা আন্‌কা ভাসা ডুবো কারো নেই তাহে নিস্তার।
মেছুরিয়া নিরদয়,—
জলের মৎস্য ডাঙ্গায় তুলিতে কি হর্ষ-বিস্ময়!

... ...

নূতন চারের উতল গন্ধ আকুল করিল কারে?
বহু সন্ধানে পরমানন্দে তোমার ফাৎনা নাড়ে।
টানিতে তোমার ডোর,—
বঁড়শির 'কালা' বিঁধিল কপালে, কি তার কপালজোর!
'আপাল' কাটিয়া ঝাঁপায় লাফায়, ছিপের সঙ্গে খেলে,
তোমার লীলায় অকূল তাহারে কূলপানে ক্রমে ঠ্যালে!

সমাজ-জীবনে এই অবিচার এবং শোষণের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য দরদ দেখা দিয়াছে কবির প্রত্যেক কাব্যের মধ্যে নানা ভঙ্গিতে এবং নানা উপমা-রূপকের ভিতর দিয়া। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র অনুকরণে যতীন্দ্রনাথ যে 'কণিকা' লিখিয়াছেন তাহার মধ্যেও এই কথা দেখিতে পাই 'ছাতা' ও 'মাথা'র দৃষ্টান্তের মধ্যে। পৃথিবীতে এক দল লোক শুধু ছাতার ন্যায় চিরদিন রৌদ্র-বৃষ্টি সহিয়া আর এক দল মাথার ছায়া ও আরামের ব্যবস্থাই করিয়া গেল। কিন্তু ছাতা'র মনের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দেয় বেসুরো কথা সেও উচ্চাভিলাষী হইয়া দুঃসাহসী হইয়া এক দিন বলিয়াই বসে —

ছাতা কয় সাবধান মাথা মহাশয়
চিরদিন রৌদ্রবৃষ্টি কারেও না সয়।
নিজগুণে এক বার হও যদি ছাতা
তোমার তলায় আমি হ'য়ে থাকি মাথা।

কিন্তু মাথা'র দল অত সহজে ঘাবড়াইবার পাত্র নন শ্রম বা বারবার শক্তি এর প্রবৃত্তি না থাকিলেও বিধাতা তাহাদের আত্মরক্ষার জন্য মুখে লম্বা বুলির ব্রহ্মাস্ত্র সব ভরিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং ছাতা'র এত মূর্খতা এবং ঔদ্ধত্যের জবাব সঙ্গে সঙ্গেই আসে—

মাথা কয়, ওরে ছাতা তুই বড় গাধা
এতদিনে বুঝিলি নে মাথার মর্যাদা ?

বুঝিলিনে তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
তোর একমাত্র কাজ তাবে রক্ষা করা ?

কিন্তু এই বুলির ব্রহ্মাস্ত্র আজ-কাল ছাতার দলও কিছু কিছু শিখিয়া উঠিয়াছে,—তাহারা জবাব করে,—

ছাতা বলে, তাই মাথা হ'তে চাই দাদা,
মাথা ছাড়া কে বুঝিবে মাথার মর্যাদা ?

কিন্তু এই চিরদিনের রৌদ্র-বৃষ্টিসহা ছাতার দলের—এই সব 'ভুখা ভগবানে'র কষ্ট লাঘব করিবার জন্য 'মাথা'র দল মাঝে মাঝে দয়া-দাক্ষিণ্য করিয়া যে সকল সদয় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যেও যে কি নিষ্ঠুর নির্দয়তা থাকে তাহা কবির চোখ এড়ায় নাই। নিজের কর্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন তিনি তাঁহার মরুমায়া'র 'ফেমিন্-রিলিফ্' কবিতায়। দারুণ অকালে যেদিন বিধাতার করুণায় গ্রামের সীমানায় রিলিফ্ নামিয়া আসিল সেদিন কোদাল ও চুবড়ি লইয়া মাথায় 'পাক-দেওয়া ছেঁড়া বিঁড়ে' বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিবার জন্য সকলের কাছে ডাক পড়িল ; ডাক পড়িল—

ঘরে ব'সে মড়কে
চ'লেছিলি নরকে,
না হয় কোদাল হাতে মরবি এ সড়কে।
খাট্‌ তবে খাট্‌রে !
ডোঙা পেট কোঙা কোরে গোঙা মাটি কাটরে।

কিন্তু এই 'ফেমিন্-রিলিফে'র শেষ কোথায়?—
কাঁদিস্‌নে খোকাধন, ভাবিস্‌নে বৌ গো!
আজ তো কেটেছি মাটি পুরো এক চৌকো।
বুকে পিঠে মাটি চাপে! এ মাটি কে মাপে রে?
হক্ মাটি মাপ দিতে প্রাণ কেন কাঁপে রে!

আবার আর এক দল লোক এই বঞ্চিতের বেদনাকেই শোষণ করিয়া—মিথ্যা দরদের ভাঁওতায় যে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ—রাজনৈতিক মতলব সাধনের তালে আছেন তাঁহাদের প্রতি কবির বিদ্রূপের কশাঘাত আরও তীব্র। সে বিদ্রূপের কশাঘাত ফুটিয়াছে তাঁহার 'মরুমায়া'রই 'পিছুহটার গানে'; কবিতার আরম্ভটা রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'আগে চল্, আগে চল্, ভাই' গানটিরই রেশ টানিয়া 'পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই' এই বুদ্ধিমানী আহ্বানে এবং সেই আহ্বানের তাৎপর্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে শেষ মন্তব্যে—

বিষ্ণুশর্ম্মা কহে মারি বেত—
'গণস্যাগ্রে নহি গচ্ছেৎ';
গণতন্ত্রীয় এ মূল মন্ত্রে
পিছু হ'তে ঘাড় মটকাই।
কার ঘাড়?—...ড্যাস্ ডট্ ভাই।
পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই!

দেখা গিয়াছে, চাষী-মজদুরের দুঃখ-বেদনার জয়গান গাহিতে কর্ম্মক্ষেত্রে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে একটা 'সৌখীন মজ-

দুরী'র মরসুমও পড়িয়া গিয়াছে। দেশোদ্ধারের জন্য অনেকেই হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, 'এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার'—এবং এই চাষাদের দুঃখে 'পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়'। সুতরাং চলিতে থাকে চাষীভাইদের উপর অনর্গল উপাদেশামৃত বর্ষণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়—

সেই দুর্যোগ-উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার ;—
সরে' পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা !
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিষ্টার !
(দেশোদ্ধার, মরুশিখা)

কিন্তু কবি বঞ্চিত মানুষের এই বেদনা লইয়া শুধু সস্তা রসিকতাই করেন নাই,—তাঁহার মনে গভীর বিশ্বাস ছিল, এত অন্যায়-অবিচার—এত দুঃখ দারিদ্র্য—ইহা চিরদিনই এমন মূক হইয়া থাকিবার জিনিস নয়। মানব হৃদয়ের গভীর অতলে গিয়া আবর্তের পর আবর্তের ঘূর্ণিপাকে ইহা শঙ্খের সৃষ্টি করিতেছে—যে শঙ্খ এক দিন এই অগণিত ভাষাহীনের মৌনবেদনার ঘনীভূত ধ্বনিময় রূপে আবির্ভূত হইয়া আহ্বান জানাইবে বিদ্রোহের। সে শঙ্খ তখন আত্ম-পরিচয় দিবে—

যেথা চিরক্রন্দিত সিন্ধুর তলে
বঞ্চিতদের সঞ্চয় চলে
শত শতাব্দ নিঃশব্দের

মন্থিত হৃৎ-পঙ্ক,
সেথা সে নিভৃতে ঘনান্ধকারে
সুরলক্ষ্মীর বন্ধনাগারে
অশ্রুভারের অতলান্তিকে
জন্মেছি আমি শঙ্খ।

... ...

বিদ্যুৎসম মনে পড়ে মম
মন্থনদিন প্রলয়ে—
নীলকণ্ঠের অট্টহাস্যে
উঠেছিনু আমি শঙ্খ,
অসংখ্য মূক-শঙ্কিতে করি'
মুখরিত নিঃশঙ্ক। (শঙ্খ, সায়ম্)

সেই অবশ্যম্ভাবী বিদ্রোহের মহাপ্রলয়ের স্পষ্ট দৃষ্টির পরিচয় আছে কবির 'ভিখারিণী' কবিতার মধ্যেও ('ত্রিযামা')। রবীন্দ্রনাথের 'পশারিণী' কবিতার ছাঁচের মধ্যে এই 'ভিখারিণী' কবিতাকে গড়িয়া তুলিবার মধ্যেই একটা অব্যর্থ গূঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে। নব-যৌবনের 'পশারিণী'দের লইয়া আমরা যে স্বপ্ন গড়িয়া তুলিতেছি 'ভিখারিণী'রা যে আসিয়া তাহা রূঢ় আঘাতে ভাঙিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া দরকার। যে ভিখারিণী 'এ-গাঁ হ'তে অন্য কোন্ গাঁয়' ঝুলিতে কত চা'ল ভরিয়া চলিতেছে, এক দিন দেখা গেল তাহার হাতের সেই ঝুলিটাও নাই!

তবে কি হইল,—ভিখারিণীকে একা পাইয়া কি কেহ সেই ঝুলিটি পথে কাড়িয়া লইয়াছে? তাহা নয়, তাহার দেহ ঢাকিবার যখন অন্য কোনও সম্বলই আর বাকি ছিল না তখন সেই 'রাজ্যের কানি' গিঠানো ঝুলিটি দ্বারাই সে তাহার নব-যৌবনের 'বুকের কাঁচুলি' করিয়াছে! আর এই নারীকে দেখিয়া নির্লজ্জ যত 'পট্টবাসে দেহ ঘেরা পাটনাই পেঁয়াজেরা' অশ্রুবারি ফেলিতেছে। কবি বলিতেছেন, এই নির্লজ্জ মানব সমাজকে ভয় বা লজ্জা করিবার ভিখারিণীর কি আছে? তাঁহার তাই অনুরোধ—

ভিখারিণী, কথা রাখ্
বিবসনা হ'য়ে থাক্—

কারণ এই বিবসনা ভিখারিণীই এক দিন সমাজে প্রলয়ঙ্করী দুর্জয় শক্তিময়ীরূপে দেখা দিবে—সেই বিবসনা শক্তিময়ীর প্রলয় নৃত্যে ভণ্ডামি আর মিথ্যার সৃষ্টি খান্ খান্ হইয়া ভাঙিয়া ধ্বসিয়া যাইবে—তার পরে আবার জাগিবে নূতন সৃষ্টি—নববিধানে গড়া নূতন মানব সমাজ।—

তোরি মত কালো মেয়ে
রূপসী বা তোরও চেয়ে,—
হয়তো এমনি কোনো দুখে
ফেলিয়া কটির বাস
হেসে উঠে' অট্টহাস
পা দিয়ে দাঁড়াল শিব-বুকে।

তখনি বিশ্বের লোক
চমকি' মেলিয়া চোখ
আনে পূজা শত-উপচার ;
বলে—একি রূপরাশি
তিমিরে তিমিরনাশী !
দয়াময়ী তুমি মা আমার !
শুনে কালো মেয়ে হাসে,
ভুবন ভরিয়া ত্রাসে
তাথৈ তাথৈ নেচে ধায়,
কপালের দুখ যত
অনন্ত গিরির মতো
কপাল ভাঙিয়া বাহিরায়।

কবি তাঁহার দ্বিধাহীন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন,—পুরনো যুগটা একটা 'প্রলয়ের লয়ের মুখে' একটা ভাঙা বছরের মতন ভাঙিয়া যাইতেছে,—এই ভাঙার মুখে শুধু ছন্দ করিয়া লাভ নাই,—এখন যে 'কালবোশেখে কালো মেঘে' শুধু ঝড়ের পালা দেখা দিয়াছে! কবির জীবন-দেবতা 'ভূতনাথ' যে সেই ঝড়ের মাতনে মাতিয়া উঠিয়াছেন! এখন—

পেটের দায়ে কচমচিয়ে
চিবোয় পদ্মাসনের মৃণাল,
রুটির দায়ে গুহায় ফিরে
বাঘের গায়ে তুলছে রে ছাল,

ভূতনাথের নাচের তালে
ভিড়ে যা সেই ভূতের দলে,
যার কাছে তুই মন্ত্র নিলি
সেই ঠাকুরের রাখরে মান।
ভাঙা পাঁজর ডুগডুগিয়ে
বেসুর রাগে বেতাল দিয়ে
হাহা স্বরে ওঠরে গেয়ে
আসর ভাঙার শেষের গান।

শোষক এবং বঞ্চক মানুষের প্রতি কবি যতীন্দ্রনাথের এই যে তীব্র ঘৃণা, এবং শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের প্রতি এই যে গভীর সহানুভূতি—বাঙলা কবিতার ইতিহাসে ইহার একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আজকের দিনের সবহারা-সর্বস্ব কবিতার ডামাডোলের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য হয়ত সহসা চোখে পড়িবার নয়, কিন্তু ইতিহাসের দিক হইতে তথ্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া আমাদেরও লক্ষণীয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, উপরে যতীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলির উল্লেখ এবং আলোচনা করিলাম তাহাকে বেশি ইনাইয়া বিনাইয়া না বলিয়া সাম্প্রতিক সুপ্রসিদ্ধ একটি ছকের মধ্যে ফেলিয়া অতি সহজেই বোঝা যাইতে পারে—তাহা হইল শ্রেণী-বৈষম্য এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ছক—এবং সেই বৈষম্য এবং সংগ্রামের ফলে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব এবং নয়া দুনিয়ার পত্তনের কথা। আজকের দিনে এ কথাগুলির দৃঢ় প্রতিষ্ঠা অনেক লোকের মধ্যেই—হয় জীবনবোধ-রূপে—না হয় জীবনবুলি-

রূপে। বোধরূপেই হোক আর বুলিরূপেই হোক—এই-জাতীয় ভাব ও চিন্তার যে সাম্প্রতিক ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার তাহার পশ্চাতে সাম্প্রতিক কালে মার্ক্সবাদের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যখন এই সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার প্রথম যুগে, বাঙলা দেশে মার্ক্সবাদের এমন ব্যাপক প্রসার ছিল না। তখনও তাহা ব্যষ্টির চিন্তায় ধাক্কা দিতেছে—সমষ্টির বিশ্বাসে বা প্রবণতায় তাহা পরিণত হয় নাই। তা ছাড়া আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, রাজনৈতিক মতামত বা জীবন-দর্শনের 'থিওরি'র প্রশ্ন তুলিলে যতীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী ছিলেন না, তাঁহার আনুগত্য বরং ছিল গান্ধীবাদের প্রতি। অবশ্য গান্ধীজীর আস্তিকাবাদী জীবনদর্শনের প্রতি তাঁহার কোনও গভীর আনুগত্য ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। এ-সকল কথার আদৌ উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, কোনও রাজনৈতিক উগ্রচেতনার প্রভাব ব্যতীত যতীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া এই সত্যটিই লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে, সাধারণ যুগধর্ম ব্যাপক ভাবে জাতীয় জীবনে স্পষ্ট প্রকাশ লাভ করিবার পূর্বেই সূক্ষ্মসংবেদনশীল কবি-মানসে তাহা কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়া ওঠে। ক্রমঘনীভূত মনুষ্য-প্রীতির ফলে বর্তমান যুগের কবির মনে এই কৃত্রিম শ্রেণী-বৈষম্য এবং তজ্জনিত অবিচার এবং বেদনা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিবেই—যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার এই-জাতীয় কবিতার প্রেরণার পিছনে

কোনও উগ্র রাজনৈতিক চেতনা অপেক্ষা তাঁহার সাধারণ সমাজ-চেতনাই অধিক সক্রিয় ছিল বলিয়া তাঁহার আন্তরিকতায় আমরা কোথাও বিন্দুমাত্র সন্দিহান নই,—এবং এই অসংশয় তাঁহার এই-জাতীয় কবিতার রসগ্রহণে আমাদের অনেকখানি সাহায্য করে। 'ত্রিযামা'র কতগুলি কবিতার মধ্যে কবি যখন বঞ্চিত মানবের ভাবী বিদ্রোহ এবং আমাদের সমাজ-জীবনে মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তখন অবশ্য এ-সব কথা এবং আদর্শ আমাদের জীবনে একান্ত অভিনব ছিল না; কিন্তু পূর্বাপরের সহিত যোগ বিচার করিলে দেখিতে পাইব—তাঁহার পূর্ববর্তী কবিতার ভিতরেই এই বিদ্রোহ এবং মহাপ্রলয়ের বীজ নিহিত আছে। অন্য আরও অনেক প্রবণতার ন্যায় কবির এই প্রবণতার ভিতর দিয়াও সমাজ-জীবনের গভীর স্তরে স্তরে প্রবাহিত শক্তিগুলি কি করিয়া সাধারণ লোকের অনুভূতির অন্তরালে কবিমানসে স্পন্দন তুলিতে থাকে তাহারই আমরা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি।

॥ ৮ ॥

'মরীচিকা' হইতে 'মরুশিখা'র ভিতর দিয়া 'মরুমায়া' পর্যন্ত কবি যতীন্দ্রনাথের কাব্য তীব্র বেদনা এবং প্রতিবাদ মিশাইয়া প্রায় একটানাই চলিয়াছে। একটানা কথাটা এখানে দুই দিক হইতেই সার্থক—ভাবের দিক হইতেও বটে, ছন্দের দিক হইতেও বটে। এই তিন কবিতা-গ্রন্থে সংগৃহীত কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দোবৈচিত্র্য কম; কবি তাঁহার একটা

অনির্বাণ অন্তর্দাহের বাহন রূপে একটি ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোভাব প্রকাশের বহু স্থানেই একটি বিশেষ ভঙ্গিও লক্ষণীয়। সে ভঙ্গিটি হইল, একটি 'বন্ধু'কে সম্বোধন করিয়া নিজের সকল অন্তর্দাহকে প্রকাশ করা। এই বন্ধুর দুইটি রূপ রহিয়াছে, এক রূপে এই বন্ধু হইল একটি কল্পিত নিখিল বন্ধু—যাঁহার প্রেমে বিশ্ব পাগল—অন্ততঃ পক্ষে বহুর মতে যাঁহার প্রেমে বিশ্বের পাগল হওয়া উচিত। সেই কল্পিত বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত অন্তর্দাহের প্রকাশে কাব্য-ফলশ্রুতির দিক হইতে লাভ হইয়াছে এই, কবি এই কল্পিত বন্ধুর মিথ্যা-স্বরূপটি যে ভাবে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা একটা সুরদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া বিদ্রূপের কড়া-ঝাঁঝ-মিশ্রিত হইয়া সুষ্ঠুতম প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই 'বন্ধু'র দ্বিতীয় রূপ হইল, সংস্কারের দ্বারা যাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ অনড় ছাঁচে গড়া হইয়া যায় নাই—সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণভাবেই নারাজ নয়, এমন একটি অন্তরঙ্গ সহৃদয়। সেই সহৃদয়ের নিকট বিষাক্ত মনের প্রতি ভাঁজ নিঃশেষে এবং নিঃসঙ্কোচে খুলিয়া ধরিবার কাব্য-ভঙ্গিটিও কবিমনের প্রকাশকে সহজ এবং অকপট করিয়া তুলিয়াছে।

'মরীচিকা' কবির ভরা যৌবনের কাব্যগ্রন্থ, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলির রচনাকাল কবির তেইশ হইতে ছত্রিশ বৎসর বয়স। তার পরে ষাঁইত্রিশ হইতে একচল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা 'মরুশিখা', বিয়াল্লিশ হইতে চুয়াল্লিশ

বৎসরের মধ্যে লিখিত 'মরুমায়া'র কবিতাগুলি। তাহার পরে পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে রচিত কবির 'সায়ম্' কাব্য। কবি যতীন্দ্রনাথের 'সায়ম্'-এর কাল দেখিতেছি পঁয়তাল্লিশের পর হইতেই; আমরা লক্ষ্য করিতে পারি. রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনেও এক জীবনের পার হইতে একটা নূতন জীবনের পারে যাইবার 'খেয়া'র ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এই বয়স অপেক্ষাও এক-আধ বৎসর আগে। 'সায়ম্'-এর কাল হইতেই যতীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারি—একটানা অন্তর্দাহের মধ্যে মধ্যে যেন অন্যমনা ছেদ পড়িয়াছে—সেই ছেদের পরিচয় স্পষ্ট হইয়াছে ছন্দোবৈচিত্র্যের মধ্যেও। জীবনের উপরে যে রহস্যের আবরণকে কবি প্রায় সচেতন ভাবেই রোষকষায়িত নেত্রে এবং কুঞ্চিত ভ্রূক্ষেপে বজ্রমুষ্টিতে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন, নিজের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই রহস্যের আবরণ আস্তে আস্তে যেন তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। 'সায়ম্'-এর সময় হইতে এই যে সুর-পরিবর্তন তাহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তাঁহার 'ত্রিযামা'র অনেক কবিতায়—'নিশান্তিকা'য় যাহারই পরিণতি।

'মরীচিকা', 'মরুমায়া', 'মরুশিখা', এই তিনখানি কবিতা-গ্রন্থের মধ্যে প্রথম গ্রন্থ 'মরীচিকা'র ভিতরে কিছু কিছু ছন্দোবৈচিত্র্য এবং ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিছু কিছু কবিতায় রাবীন্দ্রিক কাব্য-ধর্মের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। কিছু কিছু কবিতায়

প্রকৃতির সুন্দর মূর্তির যেমন আভাস আছে, তেমনই প্রচলিত অধ্যাত্মবিশ্বাসের আমেজ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'বংশীধারী' কবিতার—

কে গো তুমি বংশীধারী—
বাজাও বাঁশী কোন্ কূলে ?
হৃদয় মম উদাসপারা
বেড়ায় ঘুরে' দিক্ ভুলে,
ধরার বুকে ঋতুর ঘটা,
বাঁশীর বুঝি রন্ধ্র ছ'টা !
বাজছে বাঁশী বারোমাসই
মোহন তব অঙ্গুলে ;
কালিন্দীর ঐ কোন্ কূলে ?

অথবা—

আমি বোধ হয় কোন্ জীবনে,
দূর অতীতের কোন্ ভুবনে,
ছিলাম কোন গুণীর হাতের বেহালা ;
অকারণের কান্না হাসি
মুখে যে মোর উঠ্ছে ভাসি'—

এ বুঝি সেই পূর্ব্‌জনমের দেয়ালা (হেলা) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমি যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'র এই-জাতীয় কবিতাগুলির খুব বেশি মূল্য দিতে চাহি না,—আমার মতে এগুলি রবীন্দ্রযুগের ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যাওয়া পর্যায়ের কবিতা। নিজের সহজাত

সংস্কার-প্রবৃত্তির সহিত নিজের অনুভূতি মিশ্রিত হইয়া কবির মধ্যে এই যুগেই যে বিশেষ কবি-পুরুষটি গড়িয়া উঠিতেছিল, এই সব কবিতা সেই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত কবি-পুরুষের হৃৎ-স্পন্দনজাত নহে। এগুলি কবির মনের গভীর হইতেও উৎসারিত নয়, পাঠকের মনের গভীরেও তাহারা তাই দীর্ঘস্থায়ী কোনও দাগ কাটে না। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, কবি যতীন্দ্রনাথ ভাব-বিধারণে বা তাহার রূপ-প্রকাশনে বহুপ্রচলিত সনাতন পন্থার অনুবর্তনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তথাপি কবিরূপে যে জাতীয় উত্তরাধিকার তিনি লাভ করিয়াছিলেন, প্রথম বয়সের কবি-মানসের উপরতলায় তাহারই টুকরা ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া বেড়াইত; তাহাদের ভিতর হইতে কোন কোনটি বাছিয়া লইয়া রচিত কবিতাও কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে 'মরীচিকা'য়। সেই সকল কবিতাকে অবলম্বন করিয়া যতীন্দ্রনাথের কবিধর্ম ও তাহার বিবর্তনের ইতিহাস বিচার করিতে গেলে আমরা ঠিক পথ গ্রহণ করিব না। মোটের উপরে দেখিতে পাই, 'মরীচিকা'য় একটি বলিষ্ঠ কবিধর্মের উদ্বোধ—'মরুশিখা' ও 'মরুমায়া'র ভিতর দিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা—'সায়ম্‌', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা'র মধ্যে কিয়ৎ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তাহার ক্রম-পরিণতি।

॥ ৯ ॥

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, কবির এই যে মানস-পরিবর্তন এবং তজ্জনিত সুর-পরিবর্তন ইহা জীবন-সংগ্রামে

শ্রান্ত-ক্লান্ত চাঁদসদাগরেরই বামহস্তে পূজা দ্বারা দৈব-স্বীকৃতির অনুরূপ। আমরা আমাদের আলোচনায় দেখিতে পাইব, দৈব-স্বীকৃতির প্রবণতা ক্রমে কবির জীবনে এবং কবি-মানসে আসিয়া যাইতেছিল; যে অজানার ভূতকে কবির যৌবনের সবল স্কন্ধ তীব্র ঝাঁকুনি দ্বারা দূরে ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল—কবির প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যের অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্কন্ধ যেন সেই ভূতকেই আবার ঘাড় পাতিয়া বহনে স্বীকৃতি জানাইতেছিল। অবশ্য দৈব-স্বীকৃতির আমেজ এখানে সেখানে আসিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দৈব যেটুকু পূজা লাভ করিয়াছে কবির নিকটে তাহা ঐ বাম-হস্তের পূজা—দক্ষিণ-হস্ত তখনও মানুষের জীবনে বিগ্রহীভূত দুঃখের দেবতা মহেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত! বেশ বোঝা যায়, সেই পূজাতেই তাঁহার প্রাণের স্ফূর্তি।

সুতরাং 'সায়ম্' হইতে কবির যে সুর পরিবর্তন তাহাকে কবির স্বধর্মচ্যুতি বলা উচিত হইবে না—ইহা কবি-মনের ক্রমপরিণতি। এই পরিণতি যদি না আসিত তবে মরুমায়া'র পরেই কবির মৃত্যু ঘটিত। কারণ মনের পরিবর্তনকে যদি তিনি জোর করিয়া কলমের মাথায় আসিতে না দিতে চাহিতেন, তবে কলম বন্ধ করিয়া থাকা ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় ছিলনা।

ভাবে, চিন্তায় এবং প্রকাশ-ভঙ্গিতে এই পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া যতীন্দ্রনাথ আর এক দিক হইতে মস্ত বড় একটা সবলতারই পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করি, যে-জাতীয় সাহিত্য রচনায় একজন

সাহিত্যিক একটা সর্বজন-স্বীকৃত এবং সর্বজন-আদৃত সাফল্য লাভ করেন, অক্ষম অনুকারকেরা তাহাকে চারি দিক্ হইতে বাজারে বাজিমাৎ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থারূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু সার্থক শিল্পী লোভের বশবর্তী হইয়া সেই চলাপথে আবারও চলিতে চাহেন না। মধুসূদন 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য রচনা করিয়া যে আশ্চর্য আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে কেবলই বীররসাশ্রিত মহাকাব্যের বিষয়বস্তু পাঠাইতে লাগিলেন,—কিন্তু তিনি সব ছাড়িয়া বন্ধুগণকে বিস্মিত করিয়া রচনা করিলেন 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'—কারণ মধুসূদন মনে মনে জানিতেন—'A fresh attempt would be something like a repetition !' রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে ঘন ঘন ঋতু-পর্যায়ের আনাগোনা চলিয়াছে—কোনও ভাব বা কৌশলের মোহ তাঁহার কবি-চিত্তকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। যতীন্দ্রনাথও তাঁহার 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' এবং 'মরুমায়া'র ভিতর দিয়া বাঙলা সাহিত্যে ভাব ও কবি-কৌশলের জন্য যে গৌরব অর্জন করিলেন, পাঠক-সাধারণের নিকট হইতে সেই 'বাহবা'র লোভ যদি কবিকে একান্ত করিয়া পাইয়া বসিত, তবে পূর্বসুরের অপরিবর্তিত প্রলম্বনে কয়েকটা 'হাঁপানি'র কবিতা পাইতে পারিতাম্; 'সায়ম্', 'ত্রিযামা' ও 'নিশান্তিকা'য় যে ভাল কবিতাগুলি পাইয়াছি তাহা আর পাইতাম না। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কবির প্রথম তিনখানি কবিতা-গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে কবির কণ্ঠ যে ওজোগুণাশ্রিত সুরের উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়াছিল, পরবর্তী

কবিতার অনেক স্থানে কবি-কণ্ঠ সেখান হইতে নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু কণ্ঠ আপনার সহজ স্বাভাবিক শক্তিতে যেখানে গিয়া পৌঁছায় না সেখানে জোর করিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা কোনও সুগায়কের নহে; হয় তখন গান একেবারে থামাইয়া দিতে হয়, নতুবা কণ্ঠ যে সুরগ্রামে সহজে বিচরণ করে সেই সুরগ্রামেই গান বাঁধিতে হয়।

এ-কথাটি সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বদাই অবহিত থাকিতে হইবে যে, 'সায়ম্' হইতে কবির কবিতার মধ্যে এই সুর-পরিবর্তন কাব্যের কোনও সাধারণ স্বধর্মচ্যুতি সূচিত করে না; 'সায়ম্' এবং 'ত্রিযামা'র বহু কবিতার মধ্যে একই কবিধর্মের পরিচয় রহিয়াছে এবং আমরা পূর্বে কবির কবিধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্নমুখে যে আলোচনা করিয়াছি, সেই আলোচনায় 'সায়ম্' এবং 'ত্রিযামা' হইতে উদ্ধৃত বহু কবিতা আমাদের অবলম্বন ছিল। যে-সব কবিতার মধ্যে কবির সুর-পরিবর্তন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সেই সব কবিতার প্রকৃতিই এখন আমরা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

যতীন্দ্রনাথের কবিতার এই যে সুর-পরিবর্তন তাহা তাঁহার কোনও স্পষ্ট মতপরিবর্তন লইয়াই নয় (অবশ্য মতপরিবর্তনও কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব)। একটা পরিবর্তন এই লক্ষ্য করি, 'মরীচিকা' হইতে 'মরুমায়া' পর্যন্ত কবির দৃষ্টির মধ্যে যেন কোনও বৈচিত্র্যের বিক্ষেপও নাই—একটি দাবদাহের আজ্ঞাচক্রে একাগ্র যোগীর কঠোর দৃষ্টি এবং চিত্তবিধারণ। এই একটি

ভাবদৃষ্টি তাঁহাকে যেন ভূতের মতন পাইয়া বসিয়াছিল। দাহচক্রের মেরুপ্রান্তে তাঁহার ধ্রুব-স্থিতি ; সেই দাহচক্রের আজ্ঞাতেই যেন তাঁহার নিদিষ্ট বিচরণ—তাই আমি তাঁহাকে বর্ণনা করিলাম দাবদাহের আজ্ঞাচক্র বলিয়া। কবির একটি মানস প্রবণতা ছিল, জীবন ও জগতের যাহা কিছু সব লইয়া জীবনের একেবারে মূলে চলিয়া যাওয়া—এবং জীবনের মূল হইতে চলিয়া যাওয়া একেবারে সৃষ্টির মূলে। এই মূল ছাড়িয়া সুস্থ খোলা-মনে দু'দণ্ডের জন্য একটু ফুলকে উপভোগ করিবার যেন তাঁহার সময় ও রুচি ছিল না। কিন্তু 'সায়ম্' কবিতা গ্রন্থখানি খুলিয়া প্রথমেই যখন নূতন ছন্দে 'পারুলের আহ্বান' শুনিতে পাইলাম—

সাত ভাই চম্পা, জা—গো—
জা—গো—জাগো মোর সাত ভাই!
নিদাঘের ভোরে শোন্
ডাকিছে পারুল বোন্
অরণ্য মাঝে আর রাত নাই,
চম্পা গো চম্পা গো জাগো ভাই!

তখন একটা সহজানন্দের উপভোগে মন খুশি হইয়া ওঠে। এই চম্পাকে আহ্বানের মধ্যেও কবির বিশেষ মনোধর্মের পরিচয় আছে—

জাগে জাগে জাগে ওই নৈদাঘ সূর্য,
বাজে বাজে বাজে তার রৌদ্রক তূর্য ;
বসন্ত অবসান,
কে রাখে ফুলের মান?

চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!
পাতা হ'তে মাথা তুলি' ভাস্করে নমি' কে
চাবে সে রুদ্রমুখে, চাবে নির্নিমিখে ?
কে পিয়ে অনলরাশি
হাসিবে তরল হাসি ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো !—

কিন্তু এখানে মনোধর্মের একটা পরিণতি বেশ লক্ষ্য করিতে পারি। জীবনের আকাশে পরিব্যাপ্ত যে অনলরাশি তাহাকে পান করিয়াও যে তরল হাসি হাসিবার চম্পক-ধর্ম, কবির এখানকার সেই চম্পকধর্মই চিত্তে নূতন দীপ্তি আনে। জীবনের 'নবনীল অম্বরে' যে বসন্ত দেখা দিয়াছিল সে অনভ্যর্থিত ভাবে চলিয়া গিয়াছে তাহাতে ক্ষোভ নাই—কিন্তু কবিচিত্তের নিদাঘের রৌদ্রক তূর্যের ভিতরেও যেখানে দেখিতে পাই পারুল বোনের আহ্বানের ন্যায়—

শূন্য কাননে কেঁদে ফিরে অনুকম্পা,
জাগো ভাই বনে বনে বনানীর চম্পা !

তখন কবির শূন্য জীবনের আকাঙ্ক্ষার ব্যঞ্জনাও আসিয়া চিত্তকে স্পর্শ করে।

এখানে সর্বদাই কেবল মূলে চলিয়া না গিয়া উপরের ফুলকে উপভোগ করিবার যে মনোবৃত্তির কথা বলিলাম, সেই প্রসঙ্গে কবির 'ত্রিযামা'র 'বাস্তু' কবিতাটিও স্মরণ করা যাইতে পারে। রৌদ্রপায়ী চাঁপার প্রতি স্বভাবতঃই রুদ্রপন্থী কবির সহজাত পক্ষপাতিত্ব; তাহা লইয়াই 'বাস্তুভিটার বাহির

আঙিনাতে' যে একটি চাঁপা গাছ এবং সেই গাছে ফোটা 'একটি-গাছ ফুল' তাহা কবির অর্ঘ্য বহন করিয়া শুধু তাঁহার 'সপ্তপুরুষ পিতৃ-পিতামহদে'র কাছেই গিয়া পৌঁছায় না—আমাদের হৃদয়েও আসিয়া পৌঁছায়। এই গ্রামেরই মাটি ছানিয়া পাঁজায়-পোড়া যে ইঁট তৈয়ারী হইয়াছিল তাহাদের ভিতরেই আজ 'শত সাধের সাত পুরুষের ভিটে বিজন সুরে' কাঁদিয়া মরিতেছে,—কিন্তু তথাপি—

বিজন গাঁয়ে একক চাঁপা গাছে
আজও যখন একটি-গাছ ফুল,—
চুকিয়ে আমি দিইনি সকল আশা
শুকিয়ে আজও যায়নি প্রাণের মূল।

* * *

ওগো আমার সপ্তপুরুষ পিতৃ-পিতামহ!
এই চাঁপারই নিত্য ফোঁটায়
লহ লহ, আমার পূজা লহ।

এই যে চাঁপা দ্বারা পিতৃ-পিতামহের পূজা ইহার মধ্যে কবি-জীবনের 'মূল' সম্বন্ধে তেমন কোনও স্বীকৃতিও নাই—অস্বীকৃতিও নাই—কিন্তু জীবনের 'একটি-গাছ ফুল' এখানে আনন্দের হইয়া উঠিয়াছে। এই 'সপ্তপুরুষ পিতৃ-পিতামহে'র পূজার প্রসঙ্গেই আবার স্মরণ হয় কবির একটি স্বীকারোক্তি তাঁহার এই 'ত্রিযামা' কাব্যেরই 'তর্পণ' কবিতায়—

নবীন বয়সে
নিতি নূতনের টানে
চলেছিনু কার পানে!

*　　　*　　　*

পুরাতন, ওগো পুরাতন,
সেদিনের যত অযতন স্নেহসঞ্চয়
ছায়াবলিপ্ত সাশ্রু স্মৃতির
অনিমেষ প্রীতি-পরিচয়
পিছু ডাকে মোরে
তব ধ্রুব তট হ'তে,
নূতনের খর শঙ্কা-আবিল স্রোতে
মরণের মুখে ছুটে চলে যত

পুরাতন, তোমা' স্মরণ করি।
করি অর্পণ সবেদন অবসন্ন চিত্ত
চরণতলে,
করি তর্পণ অঞ্জলি ভরি'
নয়নজলে।

সেখানে অশ্রুসজল 'জীবনের মোহ' করুণ হইয়া দেখা দিয়াছে।

॥ ১০ ॥

আমরা যতীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আলোচনায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, ভাবে ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে

যতীন্দ্রনাথের ছিল একটা আপোষবিহীন তীব্র এবং তিক্ত রোম্যান্টিক-বিরোধী মনোবৃত্তি। কিন্তু পরবর্তী কালের কবিতায় স্থানে স্থানে দেখিতে পাই সেই রোম্যান্টিক প্রথারই অনুবর্তন। এ ক্ষেত্রেও কবির রোম্যান্টিক-ধর্মী কবিতার মধ্যে আমি দুইটি ভাগ করিতে চাই; একটি ভাগে দেখিব সত্যকার রোম্যান্টিক-ধর্মী কবিতা, আর একটি ভাগে লক্ষ্য করিব প্রচলিত রোম্যান্টিক প্রথার অনুবর্তন। কাব্য-বিচারে আমি এই দুই শ্রেণীর কবিতাকে সমমূল্যের বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজি নই,—তাহাদের ভিতরকার পার্থক্যের মধ্যেও একটা মৌলিক পার্থক্য আছে মনে করি।

কবি যতীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক-বিরোধিতা মুখ্যতঃ এই রোম্যান্টিক প্রথার অনুবর্তনের বিরোধিতা। অবশ্য রহস্য-বাদের কুয়াসাজালে জীবনকে আচ্ছন্ন করিবার বিরুদ্ধে. 'অজানার পিয়াসে'র বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার সহজাত অসমর্থন অদ্বিধায়ই প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু মন তাঁহার প্রতিক্রিয়ার দাহ প্রকাশ করিয়াছে সব চেয়ে বেশী সেইখানে যেখানে এই সকল 'ধরণ-ধারণ' একটা প্রথাসিদ্ধ পথে অনুরণনবিহীন ধ্বনির জটলারূপে দেখা দিয়াছে। কবি কালিদাস স্থানে স্থানে বেশ রোম্যান্টিক—তাঁহার কাব্য যতীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগিত—প্রমাণ যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'কুমারসম্ভবে'র অনুবাদ; রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ সুদূরের পিয়াসী রোম্যান্টিক এবং রহস্যবাদী মিস্টিক—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি যতীন্দ্রনাথের অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় বহু ভাবে পূর্বে দেখিতে পাইয়াছি।

অথচ কবি রোম্যাণ্টিক-বিরোধী। তাই কবির এই রোম্যাণ্টিক-বিরোধিতার প্রধান লক্ষ্য বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। বড় বড় এক একজন বৈজ্ঞানিক যখন প্রকাণ্ড কোনও আবিষ্কার করেন তখন মানুষের মনে আনে তাহা গভীর বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা; কিন্তু তাহার পরে ব্যবহারে ব্যবহারে তাহার ব্যাবহারিক মূল্য বাড়িয়াই যাইতে থাকে —কিন্তু সেই বিস্ময়ের আলোড়ন ক্রমস্তিমিত হইয়া শেষ পর্যন্ত স্পন্দনহীন হইয়া পড়ে। বড় বড় কবিও তেমনিই নূতন নূতন অনুভূতি এবং তাহাকে প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা ও ছন্দ যত আবিষ্কার করিতে পারেন, মানুষ ততই মুগ্ধ হইয়া যায়; তারপরে ব্যবহারে ব্যবহারে আমাদের চিন্তানুশীলনের অবলম্বনরূপে তাহার ব্যাবহারিক মূল্য যত বাড়িয়া যাইতে থাকে—তাহার পিছনকার সেই বিস্ময় এবং তৎপ্রসূত আনন্দের স্বাচ্ছমানতার বৈচিত্র্য ততই হ্রাস পাইতে থাকে। এই অবস্থায় তাহার অনুবর্তন শুধু অসার্থক নয় অরুচিকরও—এ-কথাটা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বযুগে সর্বদেশেই অবশ্যস্বীকার্য।

কিন্তু রোম্যাণ্টিকবাদের আর একটা সূক্ষ্ম-গভীর দিক আছে, সেখানে তাহার মূলধর্ম একটা বিস্ময়ের স্বাচ্ছমানতা এই সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক অর্থে এই রোম্যাণ্টিকতা ন্যূনাধিক কবিমাত্রেরই মূলধর্মের মধ্যে অনুস্যূত। জীবন-পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই যে বিস্ময়ের স্বাচ্ছমানতা তাহার বিভাবরূপ উপাধিরও ক্রম-পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। এ

বিভাবরূপ উপাধির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোম্যান্টিকতা তাহার ঢঙ্ বদলায়। জীবনের বিস্ময়-বোধ যখন যুগানুগত্যের ভিতর দিয়া যুগের পাঠক-মানসের নিকটে সানন্দ-গ্রাহ্য তখন এই রোম্যান্টিকতাই দেখা দেয় বাস্তববাদের রূপে। নূতন জীবন-পরিবেশে যাহা সত্য বলিয়া অনুভূত হয় তখন তাহাই দেখা দেয় 'রিয়াল্'-রূপে, সেই 'রিয়াল্'কে লইয়া যে সাহিত্য তাহাকেই তখন 'রিয়ালিজম্' বলিয়া গ্রহণ করিতে আগ্রহ আসে। যুগ-জীবনের পরিবেশ হইতে তাহা যখন পিছাইয়া পড়ে তাহাকেই তখন সংজ্ঞিত করিতে ইচ্ছা জাগে 'আদর্শবাদ' বা 'রোম্যান্টিক'-বাদ বলিয়া।

কবি যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম রোম্যান্টিকতা ছিল, যাহা আশ্চর্য ভাবে তাঁহার জীবন-পরিবেশের সহিত একটা সহজ সঙ্গতি লাভ করিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, যতীন্দ্রনাথ বাঙলা দেশের শ্যামল-কোমল পরিবেশকে তাঁহার বিশেষ মানসিক সংগঠনের জন্য সহজ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার বিশেষ মানসিক সংগঠনের দ্বারা তিনি তাঁহার চারিদিকে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন একটা মরুর পরিবেশ। কিন্তু সেই মরুর পরিবেশের মধ্যেও কি দূর নাই—বিস্ময়-মিশ্রিত ইঙ্গিত আকর্ষণ নাই? তিনি জীবনের ঋতুপর্যায়ের মধ্যে যে নিদাঘের দাবদাহকেই সাধারণ ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের রোম্যান্টিকতা আসিয়াছে সেই মরুর পরিবেশে নিদাঘের তপ্তবালুর পথেই। তাই তাঁহার প্রথম কবিতা-গ্রন্থ

'মরীচিকা'র মধ্যেই 'নব-নিদাঘ' কবিতায় এই নূতন রোম্যান্টিক আমেজ দেখিতে পাই—

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা
সাহারা প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে তারা কোন্ বসোরার
খর্জুরবীথি পথে ;
কত বেদূয়ীন্ পার ক'রে মরু
দীপ্ত-অগ্নিঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে
তরুণী ইরাণী বালা !

প্রেম যুগে যুগে কবিচিত্তে বিস্ময় ও রহস্য উদ্রিক্ত করিয়াছে। বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রেমের রোম্যান্টিকতার এই সূক্ষ্ম দিকটি দীর্ঘ কাল ধরিয়া রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের পত্তন করিল সেখানেও প্রেমের সঞ্চরণ সমাজ-দেহের তথাকথিত উচ্চস্তরে ; সেই উচ্চস্তর হইতে প্রেম ক্রমে মধ্যস্তর এবং সে স্তর অতিক্রম করিয়া নিম্নমধ্যস্তর পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের যুগে মনুষ্যত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে—সর্বস্তরে। সমাজদেহে যাহাদের স্থান ছিল সর্বনিম্নে—মানুষের অধিকার লইয়া সমস্তরের স্বীকৃতি লাভেও যাহারা ছিল বঞ্চিত—সেই বঞ্চিতদের বুকের কথাই আসিয়া সমাজ-চেতন কবির বুকে বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। সুদূর

তেপান্তরের মাঠের পথিক-পথিকা রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রেমের রোম্যান্স মানুষ একেবারে ভুলিয়া যাইতে না যাইতেই খুব গূঢ়ার্থক ভাবে সুন্দরবনের মধ্যে দেখা গেল কৃষাণ ও তাহার প্রিয়াকে—যাহারা আমাদের কাছে অতি অল্পাংশেই জ্ঞাত এবং অল্পপরিচয়ের বিস্ময়াবহ আকর্ষণ এবং যুগোচিত গভীর সহানুভূতির সাদর অভ্যর্থনে যাহারা মহিমান্বিত। এমন একদিন ছিল যেদিন প্রেমের প্রতিপদের চন্দ্রলেখার মতন বিরহশীর্ণা প্রিয়াকে শ্বেতসৌধ-বিলসিত অতুল সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে হেমদণ্ডের উপরিস্থিত ময়ূরের সম্মুখীন রাখিয়া প্রিয়কে অগণিত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বতের ব্যবধানে সুদূর রামগিরিতে গিয়া একাকী অভিশপ্ত জীবনযাপন করিতে হইত। আবার কালের প্রবাহে এমন যুগ দেখা দিল, যখন প্রেমের জন্যই বিংশ শতাব্দীর শহর-গ্রাম ছাড়াইয়া গিয়া প্রিয়-প্রিয়াকে কিষাণ-কিষাণীর বেশে সুন্দরবনে ঘর বাঁধিতে হইয়াছে।

সুন্দরবনে বাস আমাদের, সুন্দরবনে বাস;—
ভেড়ি বেঁধে' নোনা-পানি ঠেকাই বারো মাস ;
সুন্দরবনের চর গো বন্ধু, নুন-দরিয়ায় ঘেরা,—
তারি মাঝে মিঠে পানি সকল পানির সেরা।
'গেঁয়ো'র খুঁটি 'বাণী'র রুয়ো, 'হাঁতাল' কেটে ছড়,
উলুখড়ের ছাওনি দেওয়া মোদের কুঁড়ে ঘর।
উলুখড়ের ছাউনি চালে, উলুখড়ের ছাউনি,—
তারি তলে কেঁপে' জ্বলে পিয়ার চোখের চাউনি।

(সুন্দরবনের গান, মরুমায়া)

এই বনের মধ্যে 'কালা-জঙ্গলে' সহসা বুনো আগুন জ্বলিয়া ওঠে, সেই বনের মধ্যে 'প্রিয়া' 'প্রিয়ে'র মঙ্গলে করে 'শনি মঙ্গলবার'; তাহারা 'সুন্দ্‌রী' গাছের মাচা বাঁধিয়া 'চৈতি রাতি' কাটায়, দূর-দরিয়ায় বাতি তখন দখিন হাওয়ায় জ্বলিতে নিবিতে থাকে; বনে আগাগোড়া-ডোরা বাঘা ডাকিতে থাকে, হাঁতাল ঝোপে ময়াল সাপ 'দাঁতাল বোরা' ধরে; চরের পাখী হঠাৎ আসিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া যায়, সাঁতার কাটিয়া কুমীর উঠিয়া 'জোচ্ছনা পোহায়'। এই পরিবেশের মধ্যে যে শ্বাপদ-সঙ্কুল বনাচ্ছন্ন একটা আদিম জীবনের অনাস্বাদিত প্রেমের আভাস—সেই ত কত বিচিত্র—কত দূর—কত অজানা! আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-জর্জর মনের কাছে সে-ই ত বহন করে কেমন একটা মুক্তির স্বাদ—

দেশের শেষে সুন্দরবন রে, দখিণ হাওয়ার দেশ,—
চোখে মুখে ঝাপট্‌ লাগে পিয়ার এলোকেশ!

যাহা সুবিন্যস্ত, অচঞ্চল, অনবচ্ছিন্ন—তাহার প্রতি আমাদের সৌষম্য ও পরিচ্ছন্নতা-জনিত চিত্তের একটা আকর্ষণ রহিয়াছে; কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, আমাদের এই আকর্ষণ স্পষ্ট কিন্তু গভীর নহে। যাহা অবিন্যস্ত, অস্থির, তির্যগ্‌গামী— যাহা জটিলতার নালা-জোলায় ক্রম-বিভ্রান্তিকর—তাহার প্রতি আমাদের চিত্তের যে আকর্ষণ তাহার ভিতরে শুধু তীব্রতা নাই—মাদকতাও রহিয়াছে। রাজা-রাজড়ার প্রেমের পর ড্রয়িং-রুমের নরম সোফায় কাকলি ও গুঞ্জনগীতি-মুখর প্রেমও আমরা অনেক দেখিয়াছি।

তাঁহাদের প্রতি চোখের আগ্রহ এবং মনের আগ্রহ উভয়ই যখন 'মিইয়া' আসিতেছে তখন আবার মনকে 'চাঙ্গা' করিয়া তুলিতেছে কে—? ঘরবাড়িহারা বাঁধনহারা বেদে-বেদেনী—তাহাদের মাথার ঝাঁপিতে তাহারা বহন করে যে তীব্র হলাহল, তাহার সংস্পর্শে তাহাদের বুকের ঝাঁপির ভিতরকার মাদকের মধ্যেও জাগিয়াছে তীব্র ঝাঁঝ। সেই বেদে-বেদেনীর জীবনে ফাল্গুন আকাশে বাতায়ন-পথে দক্ষিণ হাওয়া আসে না, নামিয়া আসে কাল সাঁঝ—'ঝোড়ো মেঘে দিক্-ঘেরা' এবং সে সন্ধ্যায় বেদের নিকট হইতে সহসা আহ্বান আসে—'ওঠ্ রে বেদেনী মোট বেঁধে নিই তুলিতে হইবে ডেরা'। সঙ্গে সঙ্গে ঝট্‌পট্ করিয়া মাঠ হইতে তাঁবুর খোঁটা তুলিয়া লইতে হয়,—'ভাঙা ফাটাফুটো তৈজস' গুটাইয়া সাপের ঝাঁপিটা উঠাইয়া লইতে হয়।—

ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদেনী,
দখিণ হাওয়া এ নয়,
ঈশান-কোণের ফণীর ফণায়
বিষের নিশাস বয়।
ওই আসে সেই ঝড়,
ওঠ্ রে বেদেনী, মোট তুলে নিয়ে
বেদিয়ার হাত ধর্। (বেদেনী, সায়ম্)

উপরের এই কয়েকটি পংক্তি যদি বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে পারি, কবির 'দখিণের হাওয়ার পিয়াসী' জীবনের প্রতি একটা সহজাত বিতৃষ্ণা, আর যেখানে

'ঈশান-কোণের ফণীর ফণায় বিষের নিশাস বয়' এবং সব কিছু উড়াইয়া লইবার ঝড় ওঠে সেই জীবনের পরিবেশে চিত্তের স্ফূর্তি,—আর তাহারই সহিত লক্ষ্য করিতে পারি, শততালির ঘর এবং পরিচ্ছদের মোট মাথায় তুলিয়া যাহারা পথে ঘুরিয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের সহিত কবির গভীর সমবেদনা। কবিচিত্তের এই সকল ধর্ম তাঁহাকে অত্যন্তভাবে তাঁহার যুগধর্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই যুগধর্মের পটভূমিকায় জাগিয়া উঠিল আর একটি জিনিস—ঘরহারা পথের অনিয়ন্ত্রিত অনিশ্চিত জীবনে শত দুঃখ-দারিদ্র্য—পলে পলে বিপর্যয়ের মধ্যে হাত-ধরাধরির অনাস্বাদিত রসের নেশা। তাহাই নব-রোম্যান্টিকতা। সেই রোম্যান্টিক-ভঙ্গি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে পরের পংক্তিগুলিতে।—

কি হ'লো বেদেনী তোর ?
উড়ো মেঘে রাখি নিশ্চল আঁখি
কোন্ বেদনায় ভোর ?
এবার সহসা উঠাইতে বাসা
কেমন করে কি মন ?
মাঠে মাঠে আর ঘাটে ঘাটে ঘুরে
ক্লান্ত কি এ জীবন ?

* * *

বেদের ধারা ত বুঝিস বেদেনী,—
যে ঘর বাঁধে সে দিনে
রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার

ঢেকে যায় শ্যাম তৃণে।
তবে বা কিসের লাগি
এত কাল পরে হ'লি তুই আজ
সেই ঘরে অনুরাগী ?

* * *

শোন্ রে বেদেনী শোন্
সুরু হ'ল ওই অদূর আঁধারে
গুরু-গুরু গর্জন !

* * *

অকালের এই কালবৈশাখী—
ভেঙে দিল তোর ঘর ;
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে
বেদেনীর হাত ধর।
ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ ত ওড়ে না—
ভয় নাই ভয় নাই,
এ মাঠ ছাড়িয়া চল্ রে বেদেনী
আর কোন মাঠে যাই।
হাওয়ার উজানে দিক্ ঠিক রেখে
আঁধারে আঁধারে চল্—
আকাশে খেলায় লয়া লয়া সাপ
পারের সাপুড়ে দল। (বেদেনী, সায়ম্)

আমি এখানে যে-জিনিসটিকে নব-রোম্যান্টিকতা আখ্যা দিলাম ইহা শুধু যতীন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য নয়, এ যুগের

যাঁহারা কবি এবং যুগ-পরিবেশ সম্বন্ধে যাঁহারা সচেতন তাঁহাদের অনেকের কবিতায়ই ইহা লক্ষ্য করিতে পারিব। শুধু কবিতায়ই বা কেন, এ-জিনিসটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এ-যুগের কথা-সাহিত্যের ভিতরে, খ্যাতনামা প্রায় সকল ঔপন্যাসিক এবং গল্পলেখকের লেখাতেই। সচেতন ভাবে তাঁহারা নিজেদের শিল্পধর্ম সম্বন্ধে মুখে যে-কথাই বলুন —বা যে-শ্রেণীতে নিজেদের বিভক্ত করিয়া যে শিল্পাদর্শের কথাই বলুন,—যুগের রোম্যান্টিক্ ধর্ম সকল সার্থক লেখকের লেখাতেই স্পষ্ট—এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক হইয়াছে।

যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি সমগ্র ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে একটা পরিবেশ-সচেতনতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবেশ-সচেতনতা তাঁহার বহু কবিতাতেই একটা বাস্তবতার হৃদ্য পরিপুষ্টি আনিয়া দিয়াছে। কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কবি একটা ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে আত্ম-অতিক্রম করিয়া যান; কবিতার ক্ষেত্রে এই আত্ম-অতিক্রমের ফল দুই দিকেই দেখা দেয়- এক দিকে দেখা দেয় কবির রসানুভূতির ভিতরে একটা দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ আবেদনরূপে,—অন্য দিকে দুর্বল কবির পক্ষে এই ভাবোচ্ছ্বাসের ফল দেখা দেয় একটা কবিধর্মের প্রথাবদ্ধ সাধারণ ধর্মের ভিতরে ব্যক্তি-সত্তার সকল বৈশিষ্ট্য-লোপের মধ্যে। কোন মুহূর্তেই প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসের মুখে নিজেকে ভাসাইয়া দিবার কবি ছিলেন না যতীন্দ্রনাথ—তাই তিনি পরিবেশকে ভুলিয়া 'সাধারণ কবি'ও হইয়া ওঠেন নাই। তিনি যে মধ্যবিত্ত ঘরের অতিকষ্টে

গড়িয়া-ওঠা শ্রীযতীন্দ্রনাথ, সাকিন বাঙলা দেশের গ্রামাঞ্চল—অথবা কলিকাতার কষ্টার্জিত ভাড়াটে কুঠি এবং পেশা পূর্তকর্ম, ইহা তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। কথাটাকে আর একটু ফিরাইয়া অন্য রকম করিয়া বলিলে বলা যায়, 'কবি-জাত'কে সাধারণ 'মানুষ-জাত' হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার মনোবৃত্তি যতীন্দ্রনাথের কোনও দিনই গড়িয়া ওঠে নাই। বরং সে জাতীয় একটা পার্থক্যের সংস্কারকে তিনি তরল পরিহাসে মুছিয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার 'ত্রিযামা'র 'নব-কণিকা' কবিতা-সমষ্টির একটি কবিতায় দেখি—

হাটের পথে তরুণ পথিক, 'কবি' ব'লে করলে প্রণাম,—
চিংড়িমাছের পুঁটলি হাতে আমি তখন ফিরছি বাড়ী।
এই দু'পরে তোমার দ্বারে বন্ধু, আমি তাই ত এলাম,
খট্‌কা আমার মিটছে না ভাই, মাছ ছাড়ি কি কাব্য ছাড়ি।

এইটাই চিরাচরিত প্রথা—হয় মাছ ছাড়িয়া কাব্য ধরিতে হয়,—না হয় কাব্য ছাড়িয়া মাছ ধরিতে হয়; কিন্তু যতীন্দ্রনাথের মন-মেজাজ ছিল এই প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার বাস্তব-জীবনে 'হাতুড়ি'-চালান এবং কাব্য-জীবনে লেখনী-চালানর মধ্যে তিনি কোনও গুণগত অব্যাপ্তি স্বীকার করিতেন না; তাই স্মিতশ্লেষে তিনি নিজের পরিচয় দিতেন 'হাতুড়ে কবি' বলিয়া। আটপৌরে জীবনকোড্ হইতে একেবারে পৃথক্ কোনও 'কাব্য-কোড্'-এর উপরে তাঁহার সহজাত অশ্রদ্ধাই ছিল। সে অশ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে লঘু চালে লিখিত তাঁহার স্ববিবরণীযুক্ত অনেক কবিতায়। যেমন

'মরুমায়া'র 'কবির ঠিকানা' কবিতায় দেখি, পাড়াগেঁয়ে কবি প্রভুর আদেশে শহরে আসিয়া 'মোহিনী রোডে' ছোট্ট একটি বাসা ভাড়া লইলেন।

খুঁজে' নিল বাসা, যথাসম্ভব মিলায়ে কাব্য-কোড্,
অনতিদূরেই বকুল বাগান, পাশ দিয়ে রসা রোড্।
বামে কারখানা, কোণে জঙ্গল, ছোট্ট বাসার কাছে
বহু-ভাষাভাষী খোট্টা-পাড়া ও মস্ত বাজারও আছে।
কারখানাটার ছোট সংসারে দিনরাত ঠোকাঠুকি,
হাতুড়ির চোপা শুনিয়া ফোঁপায় হাপোর অগ্নিমুখী।

*　　*　　*

একতলে কবি করে স্নানাহার, দোতালায় শোয় রাতে
মাঝে মাঝে ছুটে' তেতলায় উঠে খাতা পেন্‌সিল হাতে।

*　　*　　*

নড়ে' নড়ে' ওঠে ছোট চিলে-কোঠা কালবোশেখীর ঝড়ে,
ঝঞ্ঝামত্ত ঢ্যাঙা নারিকেল টোলে এসে গায়ে পড়ে।
জ্যৈষ্ঠ-দুপুরে তেতে ওঠে কোঠা নিজে কড়া রোদ টানি';
বর্ষার ছাটে নির্ঝঞ্ঝাটে—ধুয়ে যায় ঘরখানি।

*　　*　　*

ঢাক্‌না-হারানো কৌটারই মত ছোট চিলে-কোঠা বটে.
সেথা ব'সে কবি হেরে জলছবি আকাশের মরুপটে।

কবির শুধু বাসস্থানের নয়, তাঁহার সারা কবি-জীবনের পরিবেশেরই একটি ঠাঁই-ঠিকানার ইঙ্গিত আছে এই বর্ণনার ভিতরে। বাঙলা দেশের এই মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব-

পরিবেশকে ভাব-কল্পনায় সম্পূর্ণ অতিক্রম বা অস্বীকার না করিয়া সেই পরিবেশের উপরেই তাঁহার কাব্য-জীবনকে কবি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবির 'মরীচিকা'র 'পথের চাকরি' কবিতার মধ্যে এই মধ্যবিত্ত পূর্তকর্মকারী কবির চাকরি-জীবন ও কবি-জীবনের সহজ মিলটা একটা আপাত-দ্বন্দ্বের আমেজে চমৎকার প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্যের 'বারমাসী'র ভঙ্গিতে কবির আক্ষেপোক্তি প্রকাশিত হইয়াছে বারটি মাসকে অবলম্বন করিয়াই; কিন্তু আক্ষেপোক্তি যেটুকু রহিয়াছে তাহা যথার্থই কবির কর্মজীবন এবং কাব্যজীবনের দ্বন্দ্বের জন্য মনে হয় না, —এই দ্বন্দ্বকে যে আমরা এত দিন এত বড় করিয়া দেখিয়াছি তাহাকে লইয়া পরিহাসই এই বারমাসী আক্ষেপোক্তির ব্যঞ্জনা বলিয়া মনে হয়।

ফাল্গুন ঝাল-নুন দু'হাতে ছিটায়,
নিস্তার নাই যার পড়ে কাটা ঘায়।
হায় হায় উহুঁ আহা,—
'তুহুঁ' সব চায় দোঁহা,
কুহু কুহু পিয়া কাঁহা—বহে মধু বায়!
আশঙ্কা কি?
মোর পরনে খাকি;
শ্রীচরণে সু-ভীষণ
ঘুরে দু' সুদর্শন,
খাদ মেপে দেখি—প্রেমে সকলই ফাঁকি

প্রভৃতির ভিতর দিয়া সেই পরিহাস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কবির প্রাত্যহিক কর্মজীবনের পরিবেশ-সচেতনতার মধ্যে রচিত একটি সার্থক কবিতা 'ত্রিযামা'র 'বানপ্রস্থ'। ইহাকে যদি কেহ প্রকৃতিতে 'রোম্যান্টিক' বলেন তবে আপত্তি করিব না, কিন্তু 'রোম্যান্টিকতা' সেখানে 'দূষণ' ত নয়ই, 'ভূষণ'ও নয়—ইহা কাব্যের 'আত্মা'। বনের রোম্যান্টিক্ পরিবেশ যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন কবির কাছে বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাল্মীকি, কালিদাস—এমন কি রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহা যে রূপে যে ভাবে দেখা দিয়াছে কবি যতীন্দ্রনাথের কাছেও যে ঠিক সেই রূপে সেই ভাবেই দেখা দিবে এমন কথা নাই। একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যতীত কবিতাটির বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা যাইবে না বলিয়া একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতিই দিতেছি।

চলেছিনু শাল-জঙ্গল পরিদর্শনে ;—
দুর্গম পথ দুর্গমতর কালবৈশাখী বর্ষণে।
থেকে থেকে দেয়া চমকায় ;
আর মাঝে মাঝে বাজ ধমকায়
কালো তুরঙ্গে অকাল সন্ধ্যা
পথ খুঁজে ফিরে শালবনে,
যেথা গজারু গড়ের সঙ্কটা বুড়ী
শত শঙ্কার জাল বোনে,
সেই শালবনে, দূর শালবনে।
দুর্যোগঘন রাত্রিযাপন
নির্জন বনবাংলায় ;

নিম্নে পাহাড়ী নামহারা নদী
বাঁকে বাঁকে টাল সামলায়।
জল কেন হোথা ছলকায় ?
বুঝি বাঘে-বাইসনে জল খায় ?
সুদূরে তরুণী গারোনীর ডাকে
পথহারা গাভী হামলায়।
আনন্দমঠি সন্ন্যাসিদল জাগিয়া
যেন ভাঙ্গা মন্দির নির্মাণে গেল লাগিয়া,
উঠে কল কল কল হুম্‌কার,
বলো নির্জন বনবাংলায় আসে
ঘুম কার ?

কিন্তু কবি জানেন, এই নিদ্রাবিহীন স্বপ্ন পরের দিন সকালের রূঢ় আলোকে ভাঙিয়া যাইবে, এবং সেই সকালে এই বনে বসিয়াই কালো মলাটের মোটা মোটা খাতার রুলটানা পাতা উল্টাইয়া যাইতে হইবে, আর তাহার ভিতরে লেখা সব সূক্ষ্ম হিসাব মিলাইতে হইবে, দেখিতে হইবে, বনে কত গাছ আছে তাহা গণা হইল কি না, সকল ঠিকানা সঠিক লেখা হইল কি না, সীমানা আঁটিয়া নক্সা হইল কি না, ক' নম্বরে কোন্ শালতরু, ক' ফুট লম্বা—মোটা ও বেঁটে! দেখিতে হইবে, বিনা পাশে কেহ বনের ঘাস কাটিয়া ফাঁকি দিল কি না, যে লোক গাছের ডাল ভাঙিয়াছিল তাহার জরিমানার টাকা আদায় হইয়াছে কি না! সুতরাং এই কবির পক্ষে—

হায় রে হায়,—
আজি রজনীর স্বপ্নশঙ্কামোহঘন এই
নির্জন বনবাংলায়
কল্য প্রভাত ভরিয়া উঠিবে
আমলায় আর মামলায়!

এই বন আজ আর বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠের বন নয়, এখানে রাম-সীতা, গুহক-মিতা, কাম্যক, হিড়িম্বা, বক, দণ্ডক, সূর্পণখা, মায়ামৃগ, ছিন্নপক্ষ পিতৃসখা—কিছুই নাই।

ক্ষটিক ফিরানো চলনদী-জলে
জপময় কোথা তপোবন!
হোম-ধূমাঙ্কী সাম-ওম্‌কৃত
জটিল বটের ছায়াঘন?
ফুল-পল্লব-মঞ্জরী-ময়ী
আশ্রম-সঞ্চারিণীরা কই?
যতন-পিহিত-বল্কলা বালা?
হলা পিয়া সখি? কোথা বা কণ্ব?
অরণ্য হায় দারুভূত আজ
বনবিভাগের বিপণি পণ্য।

যে-যুগে আমরা জন্মিয়াছি সে-যুগের হয়ত ইহাই অভিশাপ যে, 'বনে আসিলাম, সাথে সাথে এল খাতা ও ফিতা' এবং 'বনবাসে এসে সই ক'রে চলি বাঁধা খাতায়!' এখন হয়ত আর 'মনে মন নাই,- বনে বন নাই'; কিন্তু আজকের

দিনেরও বন-রহস্য আছে,—সেই রহস্যই ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে বর্তমান যুগের কবির মনে—

তবু,

কালি রজনীতে স্বপ্নশঙ্কাসম্মোহঘন
নির্জন বনবাংলায়
আমি হেরেছিনু কোন্ শিখরচারিণী
বাঁকে বাঁকে টাল সামলায়!
আর শুনেছিনু কোন্ বনঘরণীর
হারা গাভী দূরে হামলায়!
ঘোর মেঘাচ্ছন্ন ঝঞ্ঝাপন্ন
গহনারণ্য বাংলায়।

মধ্যবিত্ত চাকুরে জীবনের পরিবেশটি কবি তাঁহার বিভিন্ন যুগের বহু কবিতায়ই একটি আবহসঙ্গীতের ন্যায় জুড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীচৌরঙ্গীধামে যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া ছকু খানসামা লেনের 'ডেরা'য় লইয়া গিয়া কবি কেরোসিন কুপি জ্বালিয়া আঁধার কক্ষ আলো করিলেন—এবং সেইখানে বসিয়াই বন্ধুর সঙ্গে চলিল মুক্তিতত্ত্বের সব আলোচনা। 'চিরবৈশাখ' কবিতার গম্ভীর আনন্দময় পটভূমিকাটি হইল—

কাবার হতেছে বোশেখ এবার, কালবৈশাখী নাই,
রোদে ও গরমে বাসে আর ট্রামে আনচান্ আইচাই।
পীচে ও পাখায়, ঘবে কি ফাঁকায়, বাতাসে হুতাশে হায়,
প্রাণের পরণে শিথিল এ দেহ খসিয়া পড়িতে চায়।

এ-হেন দু'পরে আফিসে আসিয়া হেরিলাম, কি আনন্দ,
কাল চন্দ্রের গ্রহণ হয়েছে, আজিকে আফিস বন্ধ।

এ-জাতীয় পটভূমিকা অনাড়ম্বর আত্মীয়তার সুরে এবং ঘরোয়া আবেষ্টনীতে সহজগ্রাহ্য এবং সানন্দগ্রাহ্য। কবির পরিবেশ-সচেতনতা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্য, তাঁহার সূক্ষ্ম রোম্যান্টিকতার ভিতরে এই পরিবেশ-সচেতনতা যে নূতন স্বাদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করা। রোম্যান্টিকতার পরিপোষকতা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রেও ইহা পাঠক-হৃদয়ের অন্তরঙ্গতাকে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

১২

পরিণত বয়সের কবিতায় যতীন্দ্রনাথের মন-পরিবর্তনের চিহ্ন প্রকট হইয়াছে তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টি-পরিবর্তনের মধ্যেও। এ-ক্ষেত্রেও সর্বত্রই যে তাঁহার দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত এ-কথা বলা যায় না; তাঁহার পূর্ববর্তী দৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহুস্থলে প্রস্ফুট,—কিন্তু তাহারই ভাঁজে ভাঁজে নূতন রঙের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির যে একটা অচেতন আকর্ষণ তাহা ঢাকা পড়িয়াছিল তাঁহার সচেতন অবিশ্বাস এবং বিরূপতায়। কবির 'মরুমায়া'য় দেখিয়াছি, 'শাওন-রাতি' কবিতায় শ্রাবণের নির্ঝরকে কবি 'অন্ধ অনন্তের ক্রন্দন-ছন্দের সান্ত্বনা-গান' বলিয়াছেন; আকাশে মেঘের গুরুগুরু ডাককে গগন-অরণ্যে

শাবক-হারা বাঘিনীর গর্জন বলিয়া মনে করিয়াছেন, বিদ্যুতের ঝলসানিকে বেদিনী মেয়ের হাতে নাগিনীর নৃত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'সায়ম্'-এ আসিয়া যখন সেই 'শাওনিয়া' সম্বন্ধেই 'একতারার গান' শুনি—

শাওন এল ওই
থৈ থৈ শাওন এল ওই!
পথহারা বৈরাগী রে তোর
একতারাটা কই?
থৈ থৈ শাওন এল ওই!
ফুলভরা কোন্ ভুল আঙিনায়
হায়রে ও বাউল!
ভিখ্ মাঙনে গিইছিলি তুই
কোন্ ভাঙনের কূল!
থৈ থৈ শাওন এল ওই!

কোন্ কালো চোখের বাদলে
ভিজ্‌ল গেরু'বাস?
কোন্ শেফালির শাখায় বেঁধে
শুকিয়ে নিতে চাস্?
থৈ থৈ শাওন এল ওই!
... ...
বৈরাগী তোর অঙ্গ বেয়ে
বাদল ঝরোঝর,

বকুল-বীথির ফুল-বাদলে
ভিজ্‌ল কি অন্তর ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !
... ...
শাওন গাঙের ভাঙন্‌ বেয়ে
ঘট-ভরি কাঁখে
কোন্‌ বিজলী ডেকে গেল
ঘোমটারি ফাঁকে !
থৈ থৈ শাওন এল ওই।

তখন কবির চোখের দৃষ্টি-পরিবর্তন এবং কণ্ঠের সুর-পরিবর্তনকে অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না।

প্রকৃতি পাছে রূপের মোহে ফেলিয়া কবি-মনকে তত্ত্ব-বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে এবং যে মঙ্গলময় বিশ্ব-চৈতন্যের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ তাহারই নিকট পরাজয় স্বীকার করাইয়া দেয় এই জন্য কবির মন সর্বদাই ছিল 'স-তর্ক'; কোনও অসতর্ক মুহূর্তে এই তত্ত্বের 'টোপ' গিলিয়া ফেলিবার ভয়ে কবি প্রকৃতির বাহিরের রূপটাকেও কোনও দিন নিশ্চিন্ত মনে যেন উপভোগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু জীবনের হেমন্ত-সন্ধ্যায় বাহিরের হেমন্ত-সন্ধ্যার মাঠ কবিচিত্তকে রূপানুরাগে ব্যাকুল করিয়াছিল।—

সব্‌জি সুটির ক্ষেতে ফুলে ফুলে শেজ পেতে
বিপথিক রশ্মিরা শুয়েছে,
শ্যামলী আলুর লতা কুন্তলালুলায়িতা

সাঁঝ সোঁতে সদ্য গা ধুয়েছে,—
হেমন্ত-সন্ধ্যার বন্ধু।

... .

মাঠে মাঠে পাকা ধান অঘ্রানী আঘ্রাণ
কার আসা-পথপানে তুল্‌চে?
দ্বিতীয়ার চাঁদখানি কাস্তের আধখানি
কোন্ কৃষাণীর মুঠে দুল্‌চে?
হেমন্ত-সন্ধ্যার বন্ধু! (হেমন্ত সন্ধ্যায়, ত্রিযামা)

কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রকৃতির যে এমন রূপ আছে তাহা যৌবনে দেখিতেও পান নাই, উপভোগও করিতে পারেন নাই; তাহা তাঁহার চোখে মায়াময় অঞ্জন বুলাইয়া দিল জীবনের হেমন্ত ঋতুতে। যৌবনে তিনি সুন্দরকে স্বীকারই করেন নাই—আর সন্ধান করিবেন কি। কিন্তু—

বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি,
বর্ষায় মেঘে মেঘে আহ্বান,
হেমন্ত-সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন্ সুন্দরে করি সন্ধান!—
হেমন্ত-সন্ধ্যার বন্ধু! (হেমন্ত সন্ধ্যায়, ত্রিযামা)

তাই দেখিতে পাওয়া যায়, কবির জীবনে সবই বিপরীত—সবই যেন সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম। যখন মানুষের মনে থাকে রূপ-লোলুপতা তখন কবির মনভরা ছিল রূপ-বিমুখতা; আর যখন মানুষের দৃষ্টির ক্রমবর্ধমান ধূসরতায় জাগিতে থাকে রূপ-বিমুখতা—তখন কবির মনে নামিল রূপ-লোলুপতা।

কবি নিজেও এই ব্যতিক্রম সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ; তাই নিজেই বলিতেছেন,—

রবি না বসিতে পাটে মন ছুটে চলে মাঠে,
এ জীবনে সবই যে ব্যতিক্রম,—
হেমন্ত-সন্ধ্যার বন্ধু,
বন্ধু গো মরমীয়া বন্ধু ! (ঐ)

'ত্রিযামা'র বহু কবিতার মধ্যে রহিয়াছে এই রূপানুরাগের স্ফুট-অস্ফুট প্রকাশ। যৌবনে কবি একবার শীতকে তাহার আরাধ্য দেব শঙ্করের সহিত অভিন্ন করিয়া কি বলিষ্ঠ মনে আহ্বান জানাইয়াছিলেন প্রলয়যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দান করিতে ('শীত', 'মরীচিকা') ; কিন্তু সেই কবিই 'ত্রিযামা'র 'হিমভূমি' কবিতার মধ্যে শীতে যেন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছেন। আর্তকণ্ঠে যেন বলিতেছেন—

এত শীত,—
আমার অন্তরে এত শীত !
অকূল ভবিষ্য আর অনাদি অতীত
দুই হিমসাগরের ক্ষীণ ব্যবধান
এই মোর বর্তমান
অবলুপ্ত,—
হিমাচ্ছন্ন যোজকপ্রমাণ।

চারিদিকের এত শীত যেন কবিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, —সেই আচ্ছন্নতার ভিতর দিয়া যেন ঈষৎ বাসনার উন্মেষ একবার ফাল্গুনের কিশোর দেবতা সুন্দরের জন্য—

হাতে ধনু পৃষ্ঠে তূণ
কিশোর ফাল্গুন,—কত দূর ?
সুতীক্ষ্ণ সায়কাঘাতে তার
কুহু বলি' চমকি উঠিছে কোন্
বেদনা-বিধুর
দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দ্বীপান্তের বন !
... ...
নারিকেলকুঞ্জতলে
গন্ধ-বিনিময় চলে
চন্দনে ও পেলব এলায়,
সাধে ঢেউ সারাবেলা আতপ্ত বেলায়।

'ত্রিযামা'র 'নববর্ষের সূর্য' কবিতার মধ্যে একদিকে দেখিতে পাই কবি বলিতেছেন যে, নববর্ষের উৎসবের অর্থ সময়ের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যে একটি খড়ি দিয়া দাগ কাটিয়া দেওয়া ; সে দাগের তাৎপর্য এই,—'মহাশূন্যে নির্বন্ধ-বন্ধন-চক্রপথে' 'দুর্ভাগিনী ধরিত্রী'র যে ঘুরিয়া মরা তাহারই একটি 'শুভ পহেলা বৈশাখ' এই ক্ষণটি : আবার অন্যদিকে দেখিতেছি সবিতৃদেবের বর্ণনায় তাঁহার রশ্মিসমূহের মধ্যে যে বিশ্বব্যাপী বন্ধন রহিয়াছে তাহারই উল্লেখ করিয়া কবি বলিতেছেন,—'নববর্ষে তব মুখে শুনিবারে নবতর বন্ধনের গীতা আমিও উন্মুখ আজি।' প্রভাতী ভ্রমণ সারা হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে হইতেছে, তাহার এই প্রভাতী সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অসীম শূন্যের মধ্যে সেই সবিতৃদেবেরও

ঘটিতেছে সংক্রমণ—মীন হইতে মেষে সংক্রমণ—এবং কবির অন্তরালে 'কোন্ নক্ষত্রের দেশে বিশাখা মিলিছে চন্দ্রমায়';—কবি জানেন না 'কোন্ দুঃসাহসী' অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিয়া 'তব করে বাঁধিছে বৈশাখী রাখী'। কিন্তু কবি সে সকলের সন্ধানের জন্য তেমন ব্যস্ত নহেন,—

আমি শুধু জানি,—
আমার মাঠের শেষে—
বৃদ্ধ অশ্বত্থের বলিজীর্ণ শাখে
আতাম্র নধর নব পল্লবের ফাঁকে
কাল তব হেরেছি উদয়।
আজও তারি পানে আছি চেয়ে,
বৃদ্ধ অশ্বত্থের বুক বেয়ে
দেখিব তোমার
শ্যাম পত্র হ'তে পত্রান্তরে—
নিঃশব্দ সঞ্চার।

ইহার ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় ধর্মবোধাশ্রিত ঐতিহ্যের সহিত কবির যে একটা নিবিড় যোগ ব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়াও দেখিতে পাই, এখানে বিশ্বপ্রকৃতির সহিতও কবি-হৃদয়ের যে একটা সুকোমল এবং সুগভীর বন্ধন প্রকাশ পাইয়াছে কবির প্রথম যুগের কবিতার মধ্যে তাহা দুর্লভ। 'সায়ম্'-এর 'সুন্দর' কবিতাটিতে দেখি, অন্তরতম সুন্দরকে তিনি 'অশ্রুদহের কমল নব' বলিয়াছেন। এই সুন্দরের কমল 'কত বরষার অশ্রু-থিতানো পঙ্ক-শয়নে' কবির

অন্তরের অতলে যেন 'সিন্ধু-অঙ্কে লক্ষ্মী-সম' যুগ যুগ ধরিয়া ঘুমাইয়া ছিল; কিন্তু সমস্ত জলভার ভেদ করিয়া আপন মৃণালে এই সুন্দরের কমল যেদিন কবির বুকে জাগিয়া উঠিয়াছিল সেই কৈশোর-যৌবনের প্রভাত বেলায়ও—

ভাগ্য আমার,—সেদিন মেঘের
কালো গুণ্ঠন উষার মুখে!

কিন্তু আজ যেন মনে হয়, কৈশোর-যৌবনের দিনে সুন্দর-কমলের প্রকাশক্ষণে কবিচিত্তের সেই যে মেঘ-গুণ্ঠিত পরিবেশ —আজ যেন তাহা কবিচিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাকুল বাসনার অস্পষ্ট উদ্বোধ দেখিতে পাই—

ওগো সুন্দর, আমার জীবনে
আনন্দরূপে ফুটিবে না কি?
সজল এ চোখে রাখিবে না তব
হাস্য-উজল মোহন আঁখি?
মেঘল প্রভাতে আলোকের দল
গুটালো অরুণ মর্মকোষে,—
কত সাধনার সুন্দরে পেয়ে
কাঁদিয়া কাঁদানু কর্মদোষে।

ইহার সহিত আমরা কবির পূর্ব-স্বীকৃতি তাঁহার জীবনে সবই যে ব্যতিক্রম,—বসন্তে, বর্ষায় সুন্দরের মিনতি ও আহ্বান পৌরুষ কর্কশতায় প্রত্যাখ্যানের পর হেমন্ত-সন্ধ্যায় আবার তাঁহার 'সুন্দরের সন্ধান'—এই সব যদি মিলাইয়া লই তাহা

হইলে আমরা বোধ হয় যতীন্দ্রনাথের কবিমানসের পরিবর্ত্তন ও পরিণতির যাথার্থ্যকে উপলব্ধি করিতে পারিব।

'সায়ম্'-এর 'কুরঙ্গিণী' কবিতার মধ্যেও কবি-চিত্তের গভীর গহনের একটি স্বীকৃতি-সঙ্কেত লক্ষ্য করিতে পারি— কবির মনোমরুর মধ্যেই একটি বাসনার 'চিরপিয়াসী' 'চিরতৃষিতা' কুরঙ্গিণী ক্ষণে ক্ষণে চরণের 'দ্রিনিকি দ্রিনি' সুরে কবিকে সচকিত করিয়া দিত। কবি বিশ্বের আকাশ-জোড়া রুদ্রবহ্নিরই স্তুতি গহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই মনোমরু-বাসিনী কুরঙ্গিণী—

দীপ্ত নভের রুদ্র কৃষক
খেয়াল-সুখে
আসে আর যায় যে বীজ ছড়ায়
সহস্রকরে বালুর বুকে
তারি অঙ্কুর খুঁটিয়া খেয়ে,
দিগ্‌দিগন্তে চলিতে ধেয়ে,
অন্তরপথে মরু-মরুতের
অজানা জলের গন্ধ পেয়ে।

কবি বলিতেছেন, তাঁহার জীবন-মরুভূমিতে মনের গহনচারী অস্ফুট বাসনা-হরিণীর এই মরীচিকার তৃষ্ণা নিত্যই ব্যর্থ হইয়াছে এবং ব্যর্থ যে হইবারই কথা। মরীচিকার অস্তিত্বে আশ্বাস বা আশা ত' মানুষের জীবনের তন্দ্রাজাত চৈতসিক চাঞ্চল্যমাত্র। জীবনের নটরাজ রুদ্রের ভালে যে অনির্বাণ-বহ্নিশিখা জ্বলে তাহাই সত্য, তাঁহার জটাজালের নীচে যে গঙ্গার কুলুকুলু

নাদের মিথ্যা কল্পনা তাহা নিদ্রিত রুদ্রই সহ্য করেন—জাগ্রত রুদ্র নহেন; 'দিগম্বরের গ্রন্থি কসিয়া' সেই রুদ্র-দেবতা যখন দিগন্তরে জাগিয়া বসেন, তখন তাঁহার ললাট হইতে শুধু অগ্নিই ক্ষরিয়া পড়ে এবং 'মরীচিকাজাল ছিঁড়িয়া পড়ে'; কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও কবি-চিত্তের হৈমন্তিক গোধূলিতে সেই মরুবিহারিণী হরিণীর জন্যই কি করুণা!

হে মরুমৃগ,
যতদূর চাই মরীচিকা নাই,
এ মরুরে তাই ত্যজিলে কি গো?
শস্যশ্যামল সজল বনের
হরিণী তুমি,
কবে কি কারণে করিলে বরণ
ধূসর উষর এ মরুভূমি?

এখানে এই কথাটিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, কবির 'ধূসর উষর মরুভূমি'র মধ্যে যে শস্যশ্যামল সজল বনের' এক হরিণী জলের পিপাসা এবং স্বপ্ন লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত তাহার সম্বন্ধে জীবনের প্রথম অর্ধে যেন কবি তেমন অবহিতই ছিলেন না,—সেই হরিণীর চিরতৃষ্ণা এবং চির-আশা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং অসীম দরদবোধ তাহাও ফুটিয়া উঠিয়াছে এই 'সায়ম্'-কালে। কবি তাঁহার কবিতায় অবশ্য বলিয়াছেন, 'বুকের মাঝারে শুনি না ত' আর তব চরণের ড্রিনিকি ড্রিনি'; কিন্তু মরুবনবিহারিণী এক হরিণীর চরণের ড্রিনিকি ড্রিনি, একদিন যে কবি ক্ষণে ক্ষণে শুনিতে পাইতেন আমরা সে কথাটা

তাঁহার 'সায়ম্'-এ আসিয়াই জানিতে পারিলাম। 'সায়ম্'-চেতনায় আগত এই কুরঙ্গিণীর সঙ্গে কবির এই যে চিত্ত-কারুণ্যের যোগ ইহার সহিত আমরা এক করিয়া লইতে পারি এই 'সায়ম্'-কালেরই আহ্বান 'ভ্রমরের প্রতি'।—

কহ গো ভ্রমর কহ—
সে অতৃপ্তের তৃষা মিটাতে কি
শুকাল পদ্মদহ?
'ফটিক জলের' ক্ষীণ আবেদন,
কুহু কুহু কুহু পিকের বেদন,
আজও কি সহসা সে ক্ষ্যাপার চোখে
বিদ্যুদশ্রু আনে?
কালবৈশাখী মাতনে মাতিয়া
তবে সে ক্ষান্তি মানে?
নিদাঘ যে আজি সুদুঃসহ—
শ্যামল দেশের বারতা বন্ধু
শ্রবণে আমার গুঞ্জরহ।

আজ যে 'নিদাঘ' এমন করিয়া 'সুদুঃসহ' হইয়া উঠিয়াছে এবং ভ্রমরের কাছে শ্যামলদেশের বারতার গুঞ্জরণ শুনিবার জন্য এতখানি আকুলতা দেখা দিয়াছে যতীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে ইহাই বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

কবির এই চিত্ত-পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গে 'ত্রিযামা'র 'প্রত্যাবর্ত্তন' কবিতাটিও বিশেষভাবে স্মরণীয়। নিজের যৌবনকে কবি উপভোগ করিতে পরেন নাই, সেই বেদনা

এবং ক্ষোভ তাঁহার চিত্তকে বার্ধক্যে শুধু শুষ্ক নয়, ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। পরিণত বয়সে জীবনের 'কুমার দেবতা' যৌবনকে কবি 'পূজা-অর্ঘ্য' বা 'স্নেহ-শুভাশিস' জানাইতে চাহিয়াছেন নিজের তনয়-তনয়াকে অবলম্বন করিয়া। তাই দেখি—

কতদিন পরে মোর ভাঙা ঘরে
ফিরে এলি কি রে যৌবন?
ফাটা ইঁটে কাঠে তাই ফুটে উঠে
বেলি-চামেলির ফুলবন।

দাঁড়াইয়ে আজি জীবনসীমায়
তনয়-তনয়া-তনুসুষমায়
হেরি নববেশে
তব কল্যাণরূপ,
ভাঙা মন্দিরে দীপশিখা ঘিরে
আরতি গন্ধধূপ।
রাতের মুকুলে কুণ্ঠিত লাজ,
প্রভাত পুষ্পে ফুটিয়াছে আজ
অন্তর ছাড়ি' দাঁড়ায়েছ আসি
বাহিরে;
অঙ্গনে পথে কুটীরে দাওয়ায়—
তোরি উত্তরী উড়িছে হাওয়ায়,

ওরে চঞ্চল লীলাবিহ্বল
ফিরিছ কি গান গাহি' রে

প্রথম জীবনে কবি দুঃখের সত্যজীবনকে কেবলই অতিক্রম করিয়া সুখবিলাসের চারিদিকে যে আবেশ ও আয়োজন লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাঁহার বিরুদ্ধেই এত তিক্তভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে জীবনের সম্বন্ধে কাটা-ছাঁটা 'হক্'-কথা শুনাইয়া দিবার একটা দুর্বার আগ্রহই কবিচিত্তকে প্রায় সবখানি অধিকার করিয়াছিল। দুঃখকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিতে গিয়া জীবনকে কবি গভীরভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারেন নাই। নৈরাশ্যবাদের যুক্তান্তমোদিত গতি মৃত্যুর পথে—কবি তাই জীবনকে কোনও গভীর আকর্ষণে টানিয়া রাখিতে চান নাই—জীবনের বৃন্তে মরণের ফুলকেই একমাত্র সার্থক পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াছেন। জীবনের প্রতি আবার যখন কবিচিত্তের বেদনাময় গভীর আকর্ষণ দেখা দিয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে, যন্ত্রণাদায়ক দুঃখবোধের অন্ততঃ সাময়িক উপশম ঘটিয়াছে: জীবনের প্রতি এই মায়াময় গভীর আকর্ষণ সুস্পষ্ট কবির 'ত্রিযামা'র ভিতরকার 'কাঁদে কিশলয়' কবিতাটির ভিতরে। সম্ভাবনাপূর্ণ প্রাণপ্রবাহের কমকান্তি এই নব কিশলয়। পাণ্ডু পাতার পাশে কাঁদিয়া ওঠে নব কিশলয়, 'দখিনার ঝড়ে পাছে খ'সে পড়ে'—এই তাহার বেদনা; তাই জীবনরসের প্রথম বিকাশ কিশলয় আশপাশের পাণ্ডুপাতাকেই বাহুপাশে বাঁধে—আর জীবনের আশঙ্কায় কাঁদে। এ যেন প্রেম-বৈচিত্ত্যে জীবনের গাঢ় আলিঙ্গনের

মধ্যেই জীবনের বুকে মুখ লুকাইয়া 'কাঁদে কিশলয়'! সে কাঁদে আর—

কহে কিশলয়,—এই অবেলায়
পারি কি বিদায় দিতে?
ভবিষ্যতের তীর্থপথের
গৈরিক গোধূলিতে?
এখনি ও পথে যেওনাকো নামি
হে মোর অতীত, হে মম আগামী,
এখনো বৃন্তে বাঁধা আছি আমি;
—কাঁদে কিশলয়।

তরুণ কিশলয় তরুর তলার ঝরাপাতের দিকে তাকায়, আর শঙ্কা জাগে—তাহার নিজের অঙ্গের যে শ্যাম-সম্ভার তাহাই বা ক'দিনের তাহা কে জানে! জীবনের নীলে মরণের পীতবসন জড়াইয়া যে তাহার সাজ তাহা কি শুধু একটা ক্ষণ-অস্তিত্বের পরে চির-বিস্মরণ বরণ করিয়া লইতে? নবীন জীবনের কিশলয় উদাসী বেলায় মর্মর বাতায়নে বসিয়া পাণ্ডুপাতার বৃন্তে নিজের মর্মের ধ্বনি শোনে; আর—

কুহু কুহু যত কুহরে কোকিল,
সঘনে শিহরে গগনের নীল,
ফুটে আঁখিকোণে শিশিরের কণা;
—কাঁদে কিশলয়।

এই কিশলয় যে কোন্ জীবনের প্রতীক এবং কোন্

বেদনায় নিজের মনেই অশ্রুসজল তাহা চমৎকার ফুটিয়াছে কবিতাটির শেষ স্তবকে।—

যৌবন বঁধু অধরের মধু
মাগিছে ওষ্ঠপুটে,
ক্ষণে অক্ষণে দখিন পবনে
বুকের কাঁচুলি ছুটে।
একে একে একে জ্ব'লে উঠে দীপ,
সখীরা পরিল জোনাকির টীপ,
পাণ্ডুপাতার মুকুর সমুখে
কাঁদে কিশলয় ;
শ্যাম-সমাকুল কুন্তল তার তুলে বাঁধে আর
কাঁদে কিশলয়।

দার্শনিক মহলে 'নৈরাশ্যবাদে'র বিরুদ্ধে যত যুক্তিতর্ক রহিয়াছে তাহার ভিতরে সেরা যুক্তি হইল এই যে, মানুষ যে এই জীবনটিকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, পাকে পাকে ইহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, ইহাই প্রমাণ করে, সব জড়াইয়া জীবন দুঃখের নয়, আনন্দের,—ত্যাজ্য নয়, আকর্ষণের। কবি যতীন্দ্রনাথও নিজের কবি-অনুভূতির মধ্যে স্থানে স্থানে এই সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'ত্রিযামা'র 'রোগশয্যায়' কবিতাটিতে তাই দেখিতেছি, কবির দৃষ্টির সম্মুখে জীবনের সকল দৃশ্য ও ঘটনাই দুঃখের ও কষ্টের রূপ লইয়া দেখা দিতেছে—মানুষের পূজিত দেবতাকে দেখিতেছেন—'গণ্ডকীর খরস্রোতে গড়াতে গড়াতে

অনয়ন অশ্রবণ হস্তপদ নাই' ;—কিন্তু তথাপি কবি অন্তরের গভীরে অনুভব করিয়াছেন,—

তবু কেন
সে দেবতা সে মানুষ সে ধরণী ছেড়ে
চ'লে যেতে হবে ভেবে
শান্তি নাহি পাই ?
মনে হয়—সবই ভালবাসি,
নহে শুধু আলো, শুধু হাসি :
অন্তরে অন্তরে
বাস করে দীর্ঘ উপবাসী
যে লীলাবিলাসী,
সে আমার—
রোগ শোক দৈন্যেরও পিয়াসী।
... ...
আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যুমদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।

জীবনের নেশা মানুষকে এমন করিয়া পাইয়া বসে বলিয়াই ত' দুঃখমৃত্যুর মদিরাকে সে ভুলিয়া থাকিতে চায়—প্রাত্যহিক দুঃখ-দৈন্যকে ভুলিয়া থাকিতে চায় উৎসবের বেহিসাবী আনন্দে। সেই উৎসবের আহ্বান কবিও অনুভব করিয়াছেন তাঁহার জীবনে—এবং সেই দিন তিনিও বলিয়াছেন,—

এ মন্দিরে একদিন
সুন্দর-সুন্দরী নবীনা-নবীন
সাজিয়া আসুক সবে বিচিত্র সজ্জায়
গৌরবে গরবে অলঙ্কারে।

ভুলি' নিত্য তুচ্ছতা ও কুৎসিতের স্মৃতি
এক সন্ধ্যা সুন্দরের করুক আরতি—
বাহুল্যের সহস্র শিখায়। (উৎসব, ত্রিযামা)

॥ ১২ ॥

াবনের প্রতি মানুষের যে গভীর আকর্ষণ তাহার স্বাভাবিক পরিণতি সৌন্দর্যে এবং প্রেমে। মানুষের রূপ-মুগ্ধতাও শুধু চোখের অনুকূলবেদনীয়ত্বই নয়,—তাহার সঙ্গে মিলন ঘটে চিত্ত-বিস্ফাররূপ বিস্ময়বোধের; উভয়ে মিলিয়া সৃষ্টি করে আমাদের সৌন্দর্যানুভূতির। মানুষের ক্ষেত্রে এই সৌন্দর্যানুভূতির ক্রম-পরিণতি প্রেমে। এই প্রেমের পরিণতি আবার ব্যক্তি-চেতনার ক্রমঘনীভবনে। এই চেতনার ক্রম-ঘনীভবনে যে অনুকূলবেদনীয় স্পন্দন তাহার ভিতর দিয়াই অভিব্যক্ত জীবনের স্বাদনীয়তা। চেতনার এই স্বাদ্যমান ক্রমঘনীভবন আপনা হইতেই বহন করে একটা গভীর মূল্য, সেই মূল্যই জীবননিষ্ঠ মনে প্রেয়ঃ প্রেমকে ধীরে ধীরে করিয়া তোলে শ্রেয়ঃ। তখন প্রেমের মূল্যেই নির্ধারিত হয় জীবনের সকল মূল্য। প্রেম কবি মাত্রেরই শ্রেয়োবোধের সহিত যুক্ত

হইয়া ক্রমে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, ইহার মূল কারণ সত্যকার কবিমাত্রের জীবননিষ্ঠা ও জীবনপ্রীতি। কবি যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করিলাম, পরিণত বয়সে জীবনের প্রতি আকর্ষণ যত বাড়িয়া গিয়াছে ততই কবির রূপতৃষ্ণা প্রকাশ পাইয়াছে—কবির মনে দেখা দিয়াছে সুন্দরের আহ্বান। সুন্দর গভীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে প্রেমে। কবি এই প্রেমকে তাহার প্রত্যক্ষরূপে আর পাইলেন না, পাইলেন প্রেমের স্মৃতিরূপে। সেই প্রেমস্মৃতিই কবি-চেতনাকে ঘনীভূত করিয়া পরম শ্রেয়োবোধে রূপান্তরিত হইয়াছে; প্রেম তখন কবির পরম দয়িত—চির-প্রার্থিত দেবতা; প্রেমেই তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধি। এ অবস্থায় অতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার প্রেমের অবলম্বন তাঁহার মর্ত্তের প্রিয়াই কবি-হৃদয়ে দেবীরূপে উদ্ভাসিতা হইয়াছেন। প্রিয়ার এই দেবী-রূপায়ণে যতীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্ম অনেকখানি রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাই প্রিয়ার বর্ণনায় দেখিতে পাই—

আদি যুগ হ'তে যত কটাক্ষ
 নীল পাখা মেলি' আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
 ক্লান্তি মিটায়ে গেল কি ঘুরে?

... ...

কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
 মোর আঁখি হ'তে উড়িয়া চলে?

গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।

... ...

আমরা দু'জনে চলেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা !

.. ..

অসীমের পথে নূতন পান্থে
একে একে তুই আনিস্ ডাকি',
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে দিস্,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি।
পথপাশে বসি' ক্ষণেক জিরাই,
উঠে কলরব মোদের ঘেরি' —
চাই সুধা চাই, চাই ক্ষুধা চাই—
নূতন কণ্ঠে পুরানো ফেরি !

(বোঝা, সায়ম্)

নিজেদের প্রেমলীলার মধ্য দিয়া কবি এখানে নিখিল বিশ্বের নিত্যকারের প্রেমলীলাকেই উপলব্ধি এবং আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন, অথবা বলা যাইতে পারে, নিখিল প্রেমের নিঃসীম বিস্তৃতির মধ্যে কবি নিজের প্রেমকে গভীর করিয়া উপলব্ধি এবং আস্বাদ করিয়াছেন। 'সায়ম্'-এর 'বরনারী' কবিতায়—

শূন্যকুম্ভ সম
শূন্য জীবন মম
কাঁখে তুলে' নদীকূলে এলে বরনারী ;—
কেন নামিলে না নীরে ?
বেলা প'ড়ে এল ধীরে,
চলিয়াছ ঘরে ফিরে ভরি' আঁখিবারি ।

প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রেমময়ী নারীর সেই শাশ্বতী রূপটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং কবির প্রেমানুভূতির গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে বড় কোমল এবং করুণ রূপে শেষ পংক্তি কয়েকটির ভিতর দিয়া,—

ভাঙা ফুটো শূন্যে হই,
যেথা সেথা প'ড়ে রই,
হে মোর বেদনাময়ি, সহিতে তা পারি ।
তোমার অশ্রুভার
বার বার বহিবার
শকতি নাই যে আর—শোন বরনারী ।

'সায়ম্'-এর 'মন্ত্রহীন' কবিতায় দেখিতে পাই, গভীরতায় এবং ব্যাপ্তিতে এই প্রেমেরই শ্রেয়োবোধে ক্রম-উর্দ্ধায়ন। বার্ধক্যে মন্ত্রদীক্ষা এবং ধর্মাচরণের প্রশ্ন উঠিলে কবি স্বীকার করিয়াছেন, সাধারণ তীর্থ, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রচর্চা কিছুই তিনি জীবনে করেন নাই. কিন্তু তথাপি জীবনে তিনি দেবতাহীন বা দীক্ষাহীন নন ;—প্রেমই তাঁহার জীবন-দেবতা, প্রিয়ার কাছেই সেই দেবতার আরাধনায় দীক্ষা লাভ।

তবু শোন সতি, গোপনীয় অতি
কহি আজ কিছু আশার কথা,
তোমার পতি যে মন্ত্র নেয় নি
শুনেছ যা, নহে যথার্থ তা।
আমার মন্ত্র জনম অবধি
আমারে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,
তব মুখ হ'তে আমার দেবতা
সে মন্ত্র মোর শ্রবণে দিল।
সেই দিন হ'তে ওই তনু মাঝে
তনু হারাইল দেবতা মম,
জপি আমি নাম— হে আমার কাম,
হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম!

প্রেমকে এই কবিতার ভিতরে কবি এত গভীর করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহা তাহার 'নিকষিত হেম' রূপে এবং নিঃসীম ব্যাপ্তিতে এবং অনন্তের স্পর্শগভীরতায় মর্ত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে বৃন্দাবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কবি তাই জীবনে অতি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিলেন, তিনি মন্ত্রহীন নন,—তিনি নাস্তিক নন।—

বৃন্দাবনের চিরসুন্দরে
ডুবিতে দেখেছি ও-রূপদহে,
তারে খুঁজে তাই সাঁতারি' বেড়াই,
বিশ্বাস নাই সকলে কহে।

তোমারি মিলন আস্বাদে মম
তাহারি বিরহ হৃদয়ে জাগে,
কত কটু তারে কহি বারে বারে,
কভু অনুরাগে, কখনো রাগে।
বন্ধু, বন্ধু, হৃদয় বন্ধু,
কেঁদে কেঁদে তারে কত যে ডাকি,
দুখের বাঁশরী বাজায় সে শুধু
সকল সুখের আড়ালে থাকি'!

(জীবনের সকল প্রেমানুভূতির ভিতর দিয়া সেই অসীম-প্রেমস্বরূপের আভাস পাওয়া গিয়াছে—হৃদয়-মন সেই পরিপূর্ণ প্রেমানুভূতির জন্য চিরতৃষিত,—কিন্তু জীবনে সেই 'অধরা'র ধরা মেলে নাই! জীবনভরা এই 'না-পাওয়ার ব্যথা'কে কবি অশ্রু দ্বারা মালা গাঁথিয়া লইয়াছেন, এবং নিজের প্রিয়াকে লইয়া দু'জনে মিলিয়া সেই মালাই জপ করেন।

একদিন কবি 'অজানাটা অজানাই' এবং আসলে তাহা কোথাও নাই—এই কথাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'অধরা'কে ধরার চেষ্টাকে বাতুলতা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি বিশ্বের সব কিছুকে অস্বীকার করিয়াও শেষপর্যন্ত প্রেমকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না,—আর সেই প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই কবির জীবনে স্বীকৃতি লাভ করিল বহু-অস্বীকৃত 'অধরা'।)

প্রেম যখন যৌবনে 'অঙ্গধারী' ছিল কবি তখন তাহাকে সুস্থ মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই,—কিন্তু তাহার পরে

জীবনে প্রেমকে তিনি পূজা করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন স্মৃতির বেদীতে তাহার 'অনঙ্গ'রূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া। ভাল প্রেমের কবিতা তাই যতীন্দ্রনাথের কাছে দেখিতে পাইলাম 'সায়ম্' এবং 'ত্রিযামা'য়। সেই প্রেমের কবিতার উপজীব্য মুখ্যরূপে স্মৃতি এবং সেই স্মৃতির সঙ্গে জড়িত ভ্রষ্টলগ্ন পূজারীর ঈষৎ অনুশোচনা। কিন্তু স্মৃতির প্রতিই কবির যে নিবিড় আকর্ষণ তাহার ভিতর দিয়া একটা সত্যকার মানসিক উপভোগের আবেগ ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

তোমার যৌবন গেছে,
তবু আমি আছি বেঁচে
এ বড় বিস্ময়।
আজি ঐ তনুমন
কানুহীন বৃন্দাবন
শুধু স্মৃতিময়।
কপালে পড়েছে আঁকা
বিদায়-রথের চাকা
কুসুমকেতন,
রূপের ভিটার' পরে
আঁখি মোর খুঁটে মরে
কী হারা রতন? (শপথ ভঙ্গ, ত্রিযামা)

প্রভৃতির ভিতরে শুধুমাত্র একটা স্মৃতির রোমন্থন স্পৃহাই ব্যক্ত হয় নাই, ইহার ভিতর দিয়া যথার্থ জীবনানুরাগই

ব্যঞ্জিত হইয়া ওঠে। ‘ত্রিযামা’-ক্ষণেও ‘বকুলতলীর ঘাটে’ কবি যখন বলিতেছেন,—

সকাল হইতে সে অপরূপার
ধেয়ানে ঘনালো সন্ধ্যা আমার,
রূপনদীতীরে তারি নিরাশার
আশ্বাসে বেলা কাটে,

তখন এই ‘নিরাশার আশ্বাসে’র ভিতর দিয়াই কবির রূপানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অপরূপার কৈশোর এবং যৌবনলীলা স্মরণ করিয়া কবি যেখানে বলিতেছেন,—

শতছিন্ন সে চিহ্নের মালা,
বক্ষে শুকালো মোর—
বকুলতলীর ঘাটের পবন
বকুলগন্ধে ভোর।

তখন মনে হয়, কবির বক্ষের সেই শুকনো মালা এখনও একেবারে নির্গন্ধ হইয়া যায় নাই,—বকুলতলীর ঘাটের পবনের বকুলগন্ধের সঙ্গে তাঁহার বুকের শুকনো মালার গন্ধও মিশিয়া রহিয়াছে। চোখ মেলিয়া আজ আর যাহাকে দেখার সম্ভাবনা নাই কবি চোখ বুজিয়া আজ তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রিয়ার ভস্মমাখা চাঁচর কেশ, ত্রিবলিটানা ললাটদেশ, গেরুয়া চীনাংশুক এবং বুকভরা রুদ্রাক্ষের মালা; কিন্তু এই বৈরাগিণী মূর্তির অন্তরালে এক যৌবন-নির্বাসিতা অভিমানিনী যক্ষবিরহিণী আজিও যেন তাহার ‘কবি’র জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছে; কবির অধীর আগ্রহ—

ধেয়ানে তাই নয়ন বুজি'
তোমারি মাঝে তোমারে খুঁজি,
খেয়াল-খেলা খেলিতে বুঝি
গিয়েছ খোয়া কবির প্রিয়া।
ক্ষমো এ লীলা নিঠুরতম
ফিরায়ে দাও প্রেয়সী মম—
তোমারি সংগোপন মনে
নির্বাসনে কাঁদিছে যে,
বরষা-ঘন বিরহ-ভরে
যে প্রিয়া তার কবিরে স্মরে,
বিভ্রষ্ট-বলয় করে
কবরী নাহি বাঁধিছে যে॥

(মনোরমা, ত্রিযামা)

কিন্তু এই সন্ধ্যার সন্ন্যাসিনীর মধ্য দিয়াই কবি তাঁহার মনোবমাকে ফিরিয়া পাইতে চান,—

সন্ন্যাসিনি তোমারে ঘেরি সন্ধ্যা উঠে পিঙ্গলিয়া,—
লুপ্তকারু অভ্রভেদী
দেউল,—সে কি শূন্য-বেদী?
দুয়ার খোলো প্রদীপ জ্বালো দেখিবে কবি কবির প্রিয়া—
তোমারি মাঝে তোমারে, আর
হারানো মনোরমারে তার। (মনোরমা, ত্রিযামা)

'ত্রিযামা'র প্রথম কবিতা 'ঘুমের সাথী'র ভিতরে কবি এই 'মনোরমা'কেই তাঁহার চিরদিনের ঘুমের সাথী—চিরজাগ্রৎ-

সঙ্গিনী এবং চিরস্বপ্ন-সঙ্গিনী করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'ত্রিযামা'র 'নির্বাসন' কবিতায় কালিদাসের মেঘদূতের ছোঁওয়া লাগিয়াছে, সেখানে শুধু 'অপলাপ হ'তে বেঁচে যাক্ প্রেম লভিয়া নির্বাসন' এই কথাটাই বড় হইয়া ওঠে নাই,—সেখানে গভীর হইয়া উঠিয়াছে নির্বাসিত প্রেমের নবতর মহিমা।

দুর্লভ করো বন্ধু আমায়
দুর্লভ করো হে.
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
করো অতিবল্লভারে আমার,
ঘননীল বাসে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে ।

এই নির্বাসনের পিছনেও কবির একটা আশাবাদ জীবনের নূতন পটভূমি এবং পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করিয়াছে। সে আশাবাদ রূপ লাভ করিয়াছে কবির 'ভোরের স্বপ্ন' (ত্রিযামা) কবিতায়. যেখানে কবি বলিয়াছেন—

এ প্রেম হোম-ভস্মটীকা
হবে গো মম ললাট-লিখা
স্মরণ-পারে আগামী জনমে।
মিলনকামী তুমি ও আমি বাঁধিব ফিরে' ঘর
ধরণীমাঝে নূতন সাজে নবীন বধূবর।

(জীবনে এই প্রেমের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কবি প্রেমের সব দিক্ সম্বন্ধেই যেন সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার 'মা'

(ত্রিযামা) কবিতাটিও এই সঙ্গে স্মরণীয়। এ ক্ষেত্রেও কবি যদিও বলিয়াছেন,—

শুষ্ক তরুর ভগ্ন শাখায়
কাঠ-ঠোকরার ঠোকর সম
মায়ের মহিমা পারে কি রাখিতে
মাতৃনাম এ কণ্ঠে মম ?
অরূপার রূপে মায়ের স্বরূপ
ফুটায়ে তুলি যে সে ভাষা কোথা ?
কোলাহল তুলে' চেতনার মূলে
ভাঙে কালিন্দী কলস্রোতা।

কিন্তু মায়ের 'ষোড়শী' মূর্তির উপাসনা আর সম্ভব না হইলেও 'ধূমাবতী' রূপে তাঁহার উপাসনার জন্য যে কবি-হৃদয়ের বাসনা তাহাও তাঁহার পূর্বালোচিত কবিতাগুলির সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমাসক্তির সহিত কবির জীবনাসক্তি জাগ্রত হইয়াছে —জীবনাসক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে দেহাসক্তিতেও—তাহারই প্রমাণ কবির 'জংশন স্টেশনে' (সায়ম্) কবিতায়। সেখানে কবি আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার 'দেহ' ও 'জীবে'র অনাদি যুগল-প্রেমের কথা। এই প্রেমের মধ্যেই ত' অতিগাঢ়তার জন্য প্রেমবৈচিত্ত্য; তাই দেখি—

তবু দু'য়ে হবে ছাড়াছাড়ি !
এই যে জীবনরাতি ক্ষীণ দীপ জ্বালি'
কাটাই দু'জনে

তুঁহু কোড়ে তুঁহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,—
এ রজনী হবে ভোর।

পরক্ষণেই এই যুগল-প্রেমের ক্ষেত্রে নিজের ভিতরকার 'জীব'কে কবি শঙ্কর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, দেহ তাঁহার 'সতী'; জীবনের যজ্ঞ যেদিন পণ্ড হইয়া যাইবে—

দারুণ সে যজ্ঞপণ্ডদিনে
দেহহারা জীব হবে সতীহারা শিব।

আমরা এতক্ষণ নানাভাবে কবি যতীন্দ্রনাথের 'সায়ম্'-এর পর হইতে কবিমানসের পরিবর্তন বা পরিণতি লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার সুন্দর-বিদ্রোহী মনে সুন্দরের আসঙ্গ-স্পৃহা দেখিলাম, রোম্যান্টিক্-বিরোধী রুদ্র মনে নব-রোম্যান্টিকতার আমেজ লক্ষ্য করিলাম, প্রেমকে অবলম্বন করিয়া একদিকে গভীর জীবনাসক্তি দেখিলাম, অন্য দিকে প্রেমের ঊর্ধ্বায়নে প্রেমের উপরে অনন্তের স্পর্শ এবং তাহারই ভিত দিয়া বৃন্দাবনের স্পর্শ পর্যন্ত লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু মনে হয়, এই সকল-জাতীয় মনোধর্মের পরিবর্তনের পিছনে আছে একটি মৌলিক পরিবর্তন। পূর্বে আমরা যেমন লক্ষ্য করিয়াছি প্রথম বয়সেই কবির জীবনে দেখা দিয়াছিল জড় ও চেতনের মধ্যে একটা আপোষহীন দ্বন্দ্ব,—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কবি স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিয়াছেন,—এই উভয়ের মধ্যে জড়ই সত্য,—চেতনের এই জড় হইতেই উদ্ভব এবং জড়েই পুনরায় লয়। জড়ই যদি সত্য হয় তবে চেতনার মিথ্যাত্বের সঙ্গেই ত'

প্রেমেরও মিথ্যাত্ব অনস্বীকার্য।) তাই কবি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন,—

প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।
(মরীচিকা, ঘুমের ঘোরে, ১ম ঝোঁক)

(কিন্তু পরিণত বয়সে কবির এই মৌলিক ধারণারই পরিবর্তন ঘটিল, তিনি আবার নূতন সমাধান লাভ করিলেন, এবং সেই সমাধানে জড় আসিয়া চেতনায়ই লীন হইতে চাহিতেছে—অন্ততঃ জড়ে আসিয়া নূতন করিয়া চেতনার ঝাঁজ লাগিতেছে। 'ত্রিযামা'র 'সমাধান' কবিতায় রহিয়াছে সেই মৌলিক পরিবর্তনেরই অকপট স্বীকৃতি। আজ কবি বুঝিতেছেন, জীবনব্যাপী একটা বিশ্বগ্রাসী পিপাসাই যেন সমগ্র জীবনটিকে মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছিল। নিজের ভিতরকার অনির্বাণ পিপাসাকেই তিনি জীবনভরা অনির্বাণ দাবদাহ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। অন্তরের সেই যে অনির্বাণ পিপাসা তাহাই ত' জীবনের প্রেম—সেই প্রেমই সমগ্র জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা,—"প্রেম ব'লে কিছু নাই,
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।"
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতনার ঝাঁজ?
যে-হুতাশনের হুতাশে আমার শুকাইল যৌবন,
যে-পিপাসা মোর রূপ-কূপোদকে নহিলে নির্বাপণ,

বৈশাখী তাপে তুলসীর ঝারি,—
যে-সিনান মোরে করে মরুচারী,
যে-দাবদাহনে বাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম,—
আজ মনে হয়, এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে বলেছিনু—নাই,
চেতনার কূলে বসি' চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই।

কবিতাটির শেষ করিয়াছেন কবি একটি তাৎপর্যপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসে।—

তুমি নাই তুমি নাই তুমি নাই,—
উঠে ঢেউ পড়ে ঢেউ,—
চেতন ও জড়ে কাঁদে গলা ধ'রে,
দরদী নাহিকো কেউ॥

এই 'নাই' কথাটি এখানে অনস্তিত্ববাচক নহে—একটি গভীর 'দরদী' অস্তিত্বকে সর্বদেহমন দিয়া অত্যন্ত ভাবে জড়াইয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা। কবি তাহাকে তেমন গভীর করিয়া পান নাই—তাহাই যেন তাঁহার সমস্ত জীবনের বেদনাময় অভিযোগ, এ অভিযোগের সঙ্গে গভীর আসক্তি এবং অপ্রাপ্তির অভিমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। শেষের দিকের অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে এই অপ্রাপ্তির অভিমান, কিন্তু সেই অপ্রাপ্তির পশ্চাতে পূর্বে যে রূঢ় অস্বীকৃতি—যে অসম্ভাব্যত্বের ঘোষণা আমরা দেখিয়াছি, এখানে তাহা আর দেখিতেছি না। 'সায়ম্'-এর 'নাস্তিক' কবিতার মধ্যে বেশ বুঝিতে পারা যায়, কবির নাস্তিকতার ভোল বদলাইয়া গিয়াছে।

আমরা কবির প্রথম ও মধ্য জীবনের কাব্যে লক্ষ্য করিয়াছি, সেখানে কবির যে নাস্তিকতা তাহা তাঁহার চিত্তের কোনও সংশয়-জাত নহে,—বিশুদ্ধ অবিশ্বাস-জাত। কিন্তু সেই অবিশ্বাসই 'সায়ম্'-এর পর হইতে দেখা দিয়াছে চিত্ত-সংশয় রূপে। সেই সংশয়ই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল বন্ধুর অস্তিত্বকে। এই 'নাস্তিক' কবিতায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারি কবির কতগুলি জিজ্ঞাসা—

এ জীবনে যত যাহে হইনু বঞ্চিত
মরণের তীর্থে সবই হ'ল কি সাঞ্চত ?
শৈশব, কৈশোর মোর, অতৃপ্ত যৌবন,
আয়ুঃ শক্তি আশা প্রেম কল্পনা মোহন
সকলই কি গেছে ভাসি সেই মহানীরে—
পূর্ণগ্রাস-পুণ্যস্নানে ছুটি যার তীরে ?
শ্বাস রোধি' ডুব দিয়ে, মাথা তুলে' চাব,—
অমনি কি নবরূপে সব ফিরে পাব ?
মরণোত্থ বিস্মৃতির স্নিগ্ধ রসায়ন
ফিরে দিবে নগ্নকান্ত শিশুর জীবন ?
... ...
সিন্ধুপারে অনিন্দিতা নিদ্রিতা সুন্দরী
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের তরী ?

এই-জাতীয় সংশয়াচ্ছন্ন জীবন-জিজ্ঞাসা পূর্বে দেখা যায় না। এখানে যাহা-যাহা প্রশ্ন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্র-কাব্যে আমরা দেখিতে পাই একদিকের একটা অসংশয়িত সমাধানবোধ

—সে সমাধান সবই অস্তিদ্যোতক। পূর্বে যতীন্দ্রনাথেরও এ-জাতীয় সংশয়ঘন প্রশ্ন ছিল না এই জন্য যে তাঁহারও মনে এ-বিষয়ে দৃঢ় অবিশ্বাসের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল। এই সংশয়-দোলায়িত চিত্ত হইতে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়াছে বিদ্রোহের বদলে বিলাপের ধ্বনি—

সকলের আছ তুমি, আমার যে নাই,
হেঁয়ালীর দুঃখ মোর কারে বা জানাই!
আমার কাটিবে কাল চির-তোমাহারা,
নয়ন হেরে না যথা নয়নের তারা।
তুমি ক্ষিতি, তুমি জল বায়ু অগ্নি ব্যোম,
দেহ তুমি, মন তুমি, তুমি সূর্য সোম।
স্থাবরের স্থিতি জঙ্গমের গতিধারা,
যেখানে যা কিছু তুমি,—শুধু আমি-ছাড়া!
মাঝখানে দোলে চির-লীলা-পারাবার,
তুমি আমি অনন্তের এপার-ওপার।
দুঃখ মোর তাই,—
হইয়া পরাণ-বন্ধু থাকিয়াও নাই।)

ইহা ব্যঙ্গের উপহাসের ফুৎকারে 'বন্ধু'র অস্তিত্বকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা নয়—সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে একটা অপ্রাপ্তির বেদনা এখানে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরে আস্তে আস্তে দেখিতে পাইলাম, 'জীবন-মরুক্ষেত্রে রচিত শ্রীমদ্দুর্ভাগবত-গীতা'র রচয়িতা কবিই জীবন-কুরুক্ষেত্রে রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্-

গীতারই বাঙলা অনুবাদ করিলেন এবং অনুবাদ-কৃত পাপ-পুণ্য সকলই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন।)

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতার শ্রদ্ধাশীল পাঠক ছিলেন। কিন্তু 'মরীচিকা' হইতে 'মরুমায়া' পর্যন্ত কবিতার যুগে যতীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রভক্তি অনেকখানি ছিল যেন শ্রীরাবণের শ্রীরামভক্তি। বাঙলা রামায়ণ মতে রাবণ শ্রীরামের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সে ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে—শ্রীরামের প্রতি মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া পুষ্প-বর্ষণে নয়, শ্রীরামের প্রতি মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তীক্ষ্ণশর-বর্ষণে। একদিক হইতে বিচার করিলে যতীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার উপরে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী ভাবদৃষ্টি প্রকাশ করিতে যতীন্দ্রনাথ বহু স্থলে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রসিদ্ধ কবিতাকেই বিষয়বস্তু এবং ছন্দ উভয় দিক্ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন; বহু কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাবদৃষ্টি স্মরণে রাখিয়াই সেই পটভূমিকার উপরে নিজের মনের রেখা ও রঙ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের বহু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তি যতীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। যতীন্দ্রনাথের 'ছাতার কথা' কবিতাটির মধ্যে জয়দেব-চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস', 'দুই বিঘা জমি' এবং 'পুরাতন ভৃত্য' প্রভৃতি কবিতা অপূর্ব কৌশলে মিশিয়া থাকিয়া বিচিত্র রসাস্বাদ দান

করিয়াছে। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, 'সায়ম্'-এর পূর্ব পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথে আর রবীন্দ্রনাথে কোথাও মিল নাই—দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া দুঃখের কালো দাগটাকে নির্ভেজাল কালো বলিয়া চোখের সামনে ধরিবার জন্যই যেন রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ। জীবনদর্শনে জড় ও চেতনের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি চেতনাশ্রয়ী,—যতীন্দ্রনাথ কাব্যজীবনের প্রথমার্ধে জড়াশ্রয়ী; উভয়ের ভিতরে মৌলিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছে এইখানে। কিন্তু 'সায়ম্' হইতে সেই জড়াশ্রয়ের বজ্রমুষ্টি কিঞ্চিৎ শিথিলীকৃত—এবং সেই শিথিলীভবনের ক্রমপরিণতি চেতনাশ্রয়ের দিকে ঝোঁকে। এই ঝোঁকের আরম্ভ হইতেই রবীন্দ্রধর্মের মিল-মিশ এখানে লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা 'সায়ম্'-এর পর হইতে কবির মানস-পরিবর্তনের যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি একটু লক্ষ্য করিলেই তাহার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের সহিত যতীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। এই সাধর্ম্যের সহিত এক করিয়া পড়া যাইতে পারে 'সায়ম্' এবং 'ত্রিযামা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবাহক যতীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা। শ্রদ্ধা যে শুধু 'সমধর্মী'র প্রতি প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহা নয়, যে 'সমধর্মী' নয় তাহারও মহৎ হইতে কোনও বাধা নাই—সে মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেও কোনও বাধা নাই। তাই 'সায়ম্'-এর 'রবি-প্রণাম' কবিতায় যখন দেখি—

সেই অহঙ্কারে আজ
ভুলিয়া আসন্ন লাজ

আমরা সাঁঝের পাখী তব
"জয়তু প্রসন্ন রবি
পাখীর প্রাণের কবি।"
ক্ষীণকণ্ঠ উর্ধ্বে তুলি' কব।
এ পঞ্জরে রক্তমাখা
যে পাখী ঝাপটে পাখা
বন্ধন বেদনে অবিরাম,
ছিন্ন তার ওষ্ঠপুটে
যে গান কাঁদিয়া উঠে
সেই গানে করে সে প্রণাম।

তখন বুঝিতে পারি, কবি স্বধর্ম এবং রবীন্দ্র-ধর্মের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন; তবু নিজের ওষ্ঠপুটে ক্রন্দন-গান ছাড়া আর কিছু না জাগিলেও রবীন্দ্রনাথের আনন্দেব গান তিনি সানন্দেই গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাহার পরে 'ত্রিযামা'র 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতায় যখন দেখি—

তবু আজি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি' বাতায়নে,
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি'
হেরি মুগ্ধমনে—
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু-গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর

সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়াছে ধরা
যৌবনের রাগে,
সেখানে উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে।

তখন রবীন্দ্রধর্মের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, ইহার সহিত কবি যতীন্দ্রনাথের মানস পরিবর্ত্তনের কিছু যোগ আছে। রবীন্দ্র-প্রশস্তি গাহিতে গিয়া কবি যেখানে বলিলেন,—

তুমিই ত' এ নিখিলে দিকে দিকে লিখে দিলে
রসের মূরতি,
তোমারি চঞ্চল সুরে স্থিরতার অন্তঃপুরে
বাণী মূর্তিমতী।

তখন নিখিলের 'রসের মূরতি'র দিকে কবিচিত্তের একটা সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ব্যঞ্জিত হইয়া ওঠে না কি? রবীন্দ্রনাথ যখন আর মরদেহে আমাদের মধ্যে রহিলেন না, যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, অমর কবি তখনও আমাদের মধ্যেই আছেন। কিন্তু কোন্ রূপে?

উঠিছে ঝিল্লীর গান তরুর মর্ম্মরতান
নদী-কলস্বর।
প্রহরের আনাগোনা যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে
সঙ্গীত উদার,

সে নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার।
দেখ তারে বর্ণে বর্ণে প্রভাত-সহস্র-পর্ণে
প্রস্ফুট আলোকে।
পরিচয় লহ তার মহামৌন তমিস্রার
নক্ষত্র পুলকে।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এই বর্ণনাও অনেকখানি রবীন্দ্রধর্মের প্রতি আনুগত্য বহন করিতেছে।

শেষ বয়সে যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসবাদী হিন্দুর সর্বপ্রিয় শাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার যে ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন তাহা যেমন অর্থপূর্ণ, তেমনই মহাত্মা গান্ধীর বাণী হইতে বাণী সংগ্রহ করিয়া তাহার যে কবিতায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় মনে হয়। যতীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই গান্ধীবাদী ছিলেন। তিনি চরকা-তাঁতের আন্দোলনের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কলিকাতাতে বা তাহার উপকণ্ঠে দেখা গিয়াছে অনেক সাহিত্য-বাসরেও তিনি এক পাশে বসিয়া একমনে তকলীতে সূতা কাটিতেন। কিন্তু গান্ধীবাদকে তিনি যে ঠিক কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বোঝা শক্ত। কারণ, গান্ধীবাদ প্রথমাবধিই একটা আস্তিক্য-বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি—যতীন্দ্রনাথের প্রথমাবধি এই আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। সুতরাং মনে হয়, গান্ধীবাদের যে অংশের প্রতি যতীন্দ্রনাথের মনের

বিশেষ আকর্ষণ—তাহা হইল গান্ধীজীর চারিত্রিক সারল্য, সততা এবং অকপটতা; আর গান্ধীবাদের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল দেশের অবজ্ঞাত, বঞ্চিত এবং নিপীড়িত জনগণের জন্য যে দরদ ও নূতন আশা-আদর্শ তাহার সহিতও কবি যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমনের গভীর মিল ছিল। কিন্তু গান্ধীদর্শনের আস্তিক্যবাদের দিকটার প্রতি কবি প্রথম জীবনে উদাসীন ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। শেষ জীবনে কবিতায় এই গান্ধীবাণীকে কবি যখন প্রচার করিবার উদ্যম গ্রহণ করিলেন তখন গান্ধীবাণী হইতে কবির নির্বাচন লক্ষ্য করিতে হইবে। যেরূপ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত তিনি এই সময়ে গান্ধীজীর আস্তিক্যবাদী বাণীসকল অনুবাদ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়—এই বাণীর সহিত কবিমনের একটা নিগূঢ় যোগ এই যুগে গড়িয়া না উঠিলে এই-জাতীয় বাণীর নির্বাচন এবং এই ভাষায় তাহার রূপায়ণ—কোনটাই সম্ভব হইত না। 'গান্ধী-বাণী-কণিকা'র একটি কবিতায় দেখিতে পাই—

প্রত্যক্ষের মত প্রত্যয়
জন্মেছে অন্তরে,
তাঁর ইচ্ছার দোলা না লাগিলে
পাতাটিও নাহি নড়ে।
প্রতি নিশ্বাস সহ
বুক ভ'রে মোরা করি যে গ্রহণ
তাঁহারি অনুগ্রহ। (পৃঃ ৪)

বলা যাইতে পারে, ইহা নিছক গান্ধীবাণী, যতীন্দ্রবাণী নয়। কিন্তু আমার মনে হয় শেষ জীবনে যখন কবির এই-জাতীয় বাণীর প্রতি এতটা শ্রদ্ধা দেখা যাইতেছে তখন সেই বাণীর ভিতরকার সত্যের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা গড়িয়া উঠিয়াছিল। অন্য একটি বাণীর অনুবাদে দেখি—

তাইতো শাস্ত্রে বলেছে এ সবই
তাঁরি লীলা মায়া ছল,
'অস্তি' বলিতে শুধু সেই এক,
মোরা 'নাস্তি'র দল।
নাস্তি মোদের অস্তি হবার
সাধ যদি জাগে তবে
কণ্ঠ মিলাও সে লীলাময়ের
মোহন বংশীরবে। (পৃঃ ৭)

কিন্তু এই-জাতীয় কথা শুনিবামাত্র কবি যে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্তভাবে 'মার-মুখো' হইয়া উঠিতেন তাহা আমরা বিস্তারিত ভাবেই দেখিয়া আসিয়াছি। কবির শেষ জীবনের কবিতায় আমরা চেতনার স্বীকৃতির ভিতর দিয়া প্রেমের জয়গান করিতে দেখিয়াছি ('সমাধান', ত্রিযামা); এই সত্যটিকে কবি আরও স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন একটি গান্ধীবাণীকে অবলম্বন করিয়া।—

'অণু'র সাথে 'অণু'র যাই
'সংশক্তি' আছে তো তাই
বেঁধেছে দানা অন্ধ জড়চয়,

হইলে সংশক্তিহারা
মুহূর্ত্তেকে মরুসাহারা
হইবে ধরা চূর্ণরেণুময়।
তেমনি ভাই যে বন্ধনে
চেতনা বাঁধা চেতনা সনে
সে বন্ধনই ধরে যে প্রেমনাম,
এই প্রেমেরই সাধনা জীবে
শিবের সাথে মিলায়ে দিবে,
পুরাবে তার মহৎ পরিণাম। (পৃঃ ২৫)

॥ ১৩ ॥

যতীন্দ্রনাথের কবিধর্মের পরিমাণ অনেক নয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁহার পাঁচখানি কবিতা-গ্রন্থ। 'নিশান্তিকা' কোন পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত কবিতা-পুস্তক নয়, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কয়েকটি কবিতাকে তাঁহার কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ 'অনুপূর্বা'র শেষের দিকে স্থান দিবার সময় এই নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত যতীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ 'কুমার-সম্ভব' কাব্যখানিকে অবলম্বন করিয়া একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহা আক্ষরিক অনুবাদ ত' নয়ই—ঠিক অনুবাদও নয়,—মূল শ্লোকের বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত কাব্য—বিষয়বস্তুটিকেও নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণ এবং পরে প্রয়োজনমত সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সরল এবং অতি সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ রূপে

তিনি শেষের দিকে (১৩৫৭ সাল) 'রথী ও সারথি' নামে কাব্য রচনা করেন। গান্ধীজীর কিছু বাণীও বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করিয়া 'গান্ধী-বাণী-কণিকা' রূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৩৫৮-৫৯ সনের মধ্যে তিনি মহাকবি সেক্সপীয়রের তিনখানি প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডির অনুবাদ করেন। মূলের অনুরূপে এই অনুবাদগুলিও গদ্য-পদ্যে লিখিত। 'ম্যাক-বেথ' 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে—'হ্যামলেট' 'শনিবারের চিঠি'তে। 'ওথেলো' এখনও প্রকাশিত হয় নাই। গদ্যলেখা যতীন্দ্রনাথের খুব কম. উল্লেখযোগ্য লেখা কাব্য-বিচার সম্বন্ধে বই 'কাব্য-পরিমিতি' (১৩৩৮)। আমরা তখন কলেজে পড়ি, সাহিত্যিক সত্য বুঝাইতে গাণিতিক রেখাচিত্র আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মোটামুটিভাবে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের রসবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আলোচনার মধ্যে যতীন্দ্রনাথ অনেক সূক্ষ্ম তথ্য ও সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কিছু কিছু গদ্য প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছেন বিভিন্ন বয়সে। বহরমপুরে বাসকালের শেষ দিকে তিনি 'গণরাজ' নামক স্থানীয় কংগ্রেস-পরিচালিত একটি পাক্ষিক পত্রিকার সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ-বিষয়ে রেজাউল করিম মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কবি যতীন সেন সেই পত্রিকাকে বিবিধ প্রকার প্রবন্ধ দিয়া সাহায্য করিতেন। তিনি দয়া করিয়া সপ্তাহে একটি টিপ্পনী লিখিয়া দিতেন। টিপ্পনীগুলি এত মধুর সরস ও তীব্র হইত যে

তাহার ফলে "গণরাজে"র সুনাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সেই টিপ্পনীগুলি যেন হীরার টুকরা। সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করিতেন। আবার সরকারবিরোধীদের নেতিমূলক পদ্ধতিকেও আক্রমণ করিতে ছাড়িতেন না। নিরপেক্ষ সমালোচনা কাহাকে বলে তিনি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সাময়িক আলোচনা আরও অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু কবি যতীন সেনের মত অল্পকথায় অমন তীব্র তীক্ষ্ণ অথচ সরস আলোচনা খুব কম দেখিয়াছি।" (হোমশিখা, ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন)।

কিন্তু তাঁহার গদ্য লেখা এবং অনুবাদ মননশীলতা এবং সাহিত্যগুণের জন্য শ্রদ্ধেয় হইলেও তাঁহার স্বধর্ম-বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট পরিচয় বহন করে মুখ্যতঃ তাঁহার কবিতা, এই জন্য তাঁহার কবিতার বিভিন্ন দিক্ লইয়াই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিলাম।

আমরা এতক্ষণ যতীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে যত আলোচনা করিয়াছি তাহা মুখ্যতঃ তাঁহার কবিতার ভাববস্তু এবং কবির কবিধর্ম সম্বন্ধে। মনে করা যাইতে পারে, তাঁহার কবিতার 'নির্মিতি' বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু উল্লেখ থাকিলেও সে বিষয়ে আনুপাতিকভাবে আলোচনা হয় নাই। কিন্তু কোনও সার্থক কবির নির্মিতির এই দিকটাকে বিশ্লেষণের সাহায্যে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টাকে সর্বত্র আমার সাধু চেষ্টা বলিয়াও মনে হয় না। যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি যখন সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইতেছিল

তখন তাঁহার নূতন ধরণের অন্ত্যানুপ্রাস, বাস্তব জীবনের আশপাশ হইতে গৃহীত তাঁহার উপমা এবং সমজাতীয় অলঙ্কারের লাগসই ব্যবহার--অভিজাত তৎসম শব্দের পাশাপাশি আটপৌরে বাঙলা শব্দ ব্যবহারে ফলপ্রসূ দুঃসাহসিকতা তৎকালে সাহিত্যিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল,—এবং স্বাভাবিক ভাবেই তাহার অনুকরণও দেখা দিয়াছিল নানাভাবে ; কিন্তু সমজাতীয় কবিতা তাহাতে লেখা হয় নাই।

নির্মিতি বিষয়ে রন্ধন এবং কবিতা-বন্ধনের মধ্যে একটা সাধর্ম্য আছে—বোধহয় উভয়েরই কাজ স্বাদ বিতরণ বলিয়া। একটি বিশেষ স্বাদ-সৃষ্টির গভীর অন্তঃপ্রেরণা না লইয়া শুধু রোচ্য উপাদানসমূহের মিশ্রণে বন্ধনের পরিণতি যেমন আস্বাদে নয়—রীতিমত কুস্বাদে, কাব্য-নির্মিতির ক্ষেত্রেও সত্য সেই একই। এখানে স্বাদ-সৃষ্টির অন্তঃপ্রেরণা মিশিয়া থাকে ভাবানুভূতির গাঢ়তার মধ্যে। যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে দাবদাহের ভ্রূকুটির পাশে বিদ্রূপের তির্যক্ হাসি, বলিষ্ঠ স্পষ্টোক্তির সহিত শাণিত বক্রোক্তির অপ্রত্যাশিত সঙ্গতি, দৈবের প্রতি বজ্রমুষ্টি বিক্ষেপের পাশে জীবনের ছেঁড়া কাঁথা-খানি জড়াইয়া লইবার অভ্যাসসিদ্ধ বাহু-প্রসারণ—এই সকল যতীন্দ্রনাথের ভাব ও নির্মিতি উভয় ক্ষেত্রেই একটা দ্বান্দ্বিক বিচিত্র স্বাদ সৃষ্টি করিয়াছে। অতিরেক যে কোথাও ঘটে নাই একথা বলা যায় না, অনুভূতির উপরে চিন্তার কড়াপাক যেখানে বেশি লাগিয়াছে সেখানেই কষ্টকল্পনার এবং কষ্ট-

রচনার অতিরেক দেখা দিয়াছে। দুঃখবাদই যে মাঝে মাঝে কবিকে ভূতের মতন পাইয়া বসিয়াছে তাহা নয়, বক্রোক্তির ভোলে পড়িয়াও যে তাঁহাকে নাজেহাল একেবারেই হইতে হয় নাই—একথাও বলা যায় না।)

কিন্তু এহো বাহ্য—আর একটি আগের কথা আছে; আগের কথাটাই হইল পিছের কথা—অর্থাৎ মূলের কথা। কবিতার নির্মিতির মধ্যে যতীন্দ্রনাথ যে বলিষ্ঠ সরসতা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন তাহার মূল কারণ ভাষার সঙ্কেতশক্তি সম্বন্ধে কবির একটা সতর্ক সচেতনতা। এই সচেতনতা তাঁহার সহজাত বলিয়া ইহাকে সচেতনতাও বলিতে পারি, বিশ্বাসের প্রেরণাও বলিতে পারি। ভাষা হইল জমির মাটির মত—একই মাটিতে বহুদিন ধরিয়া বার বার আমরা যদি একই ফসল ফলাইতে থাকি তবে মাটির উর্বরা শক্তিই ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে—তাহার পরিণতি ফসলের আকৃতি-প্রকৃতিরও সর্বথা হ্রস্বত্বে। নূতন ফসল ফলাইবার দুরন্ত ঝোঁক ছিল কবির মনে—নূতন শব্দ-ধ্বনির উর্বরতার মধ্যে বিচিত্র ফসলের প্রাণাধানের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই কবি লেখনী ধারণ করিতেন—নূতন প্রাণরস লাভ না করিলে ফসলই বা কোন্ রস দান করিবে?

যতীন্দ্রনাথের ভাষা-ব্যবহার সম্বন্ধে আরও একটি প্রণিধান-যোগ্য তথ্য রহিয়াছে। ভাষাকে তাহার বহুব্যবহৃত মামুলী অর্থে ব্যবহার না করিয়া যতীন্দ্রনাথ তাহার ভিতরে যে নূতন সঙ্কেতশক্তির আধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আধুনিক

কবিতার ইতিহাসে সেই চেষ্টার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ১৩৩০ হইতে আরম্ভ করিয়া নূতন কাব্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারাই কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কবিতার ভাষা এবং গঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সকলেই অবহিত ছিলেন। তিরিশের পর হইতে এক্ষেত্রে যাঁহারা যেটুকু চেষ্টা করিয়াছেন—সে চেষ্টার পথনির্দেশক ছিল মুখ্যভাবে ইংরেজী কবিতা—বিশেষ করিয়া প্রথম যুদ্ধোত্তর ইংরেজী কবিতা। শব্দ-গঠন এবং পদ-বিন্যাস-রীতিতে ইহারা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ইংরেজী বিধানেরই অনুসরণ করিয়াছেন—নূতন নূতন কাঁচা-মাল সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যথাসম্ভব সংস্কৃত হইতে। ইহার ফল সর্বত্রই নিন্দার্হ হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না; আবার সংস্কৃত হইতে যথেচ্ছগৃহীত কাঁচা-মালের সহিত ইংরেজী পদ-বিন্যাস এবং বাক্য-বন্ধ-রীতি প্রযুক্ত হইয়া যে প্রকাশভঙ্গি সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে এখন পর্যন্ত সর্বত্র বাঙলা বলিয়া চিনিতে পারিতেছি না, একথাও অকপটে স্বীকার করিতে হইতেছে। প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব প্রতিভা—একটা স্বভাব থাকে; সেই স্বভাবের সমগ্র পরিচয় ছড়াইয়া থাকে ভাষার বিভিন্ন যুগের বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যে; তাই ভাষার স্বভাবের সহিত যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে হইলে ভাষার এই বৃহৎ অংশের সহিত যোগ না থাকিলে তাহা সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের যে ভাষা-সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল, তাহার কারণ তাঁহার একদিকে সংস্কৃত-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, অন্যদিকে বাঙলার শুধু

তাঁহার সমসাময়িক ভাষার সহিত নয়, 'রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণব-কবিতা, মঙ্গলকাব্য, আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত, বাউল গান, এমন কি দাশুরায়েব পাঁচালি—ছেলে-ভুলানো ছড়া—সমস্ত আনাচ-কানাচের সহিতই ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু আমার ধারণা তিরিশের পর হইতে বাঙলা কবিতায় যে ঢঙটি প্রবর্তিত হইয়াছে, ইংরেজীগন্ধিতাই তাহার কোনও দোষ হইত না যদি এই ঢঙ-এর প্রবর্তকগণের বাঙলা ভাষার স্বভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিত। আমার ধারণা, এই কবিগোষ্ঠীর বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচয় বহুস্থলে রবীন্দ্র-নাথকে অবলম্বনে—ব্যতিক্রমস্থলেও মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বনে। অথচ শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষা লইয়া যথেষ্টভাবে রবীন্দ্রোত্তর' হওয়া যায় না; সুতরাং ঝুঁকিতে হইয়াছে যুদ্ধোত্তর ইংরেজী কবিতার দিকে, যেখানে ভাষা-গঠনের নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রবলভাবে চলিতেছিল; আর রসদ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে অপরিচিত সংস্কৃত হইতে। ইঁহাদের মধ্যে ভাষাকে নূতনভাবে শর-সুলভ গভীরবেধক তীক্ষ্ণতা এবং ধ্বনিবৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য দান করিবার যে মহান্ উদ্দেশ্য ছিল এবং আছে তাহা যথার্থই শ্রদ্ধার্হ, অবলম্বিত পন্থাও যে সর্বত্র অসার্থক একথা স্বীকার্য নয়; কিন্তু স্থানে স্থানে কবিতা যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার মিশ্র-প্রজাত বর্ণসাঙ্কর্য আমাদের চিত্ত-রোচন হইয়া ওঠে না।

কবি যতীন্দ্রনাথের ভাষা-প্রয়োগ সম্বন্ধে এত কথার উল্লেখ করিলাম সাম্প্রতিক কালে কবিতার গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে একটি

অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা ব্যথিতভাবে লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া,—কবিতাকে আধুনিক হইয়া উঠিতে হইলে যেন মোটামুটিভাবে অ-বাঙলা না হইয়া উঠিলে নয়। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে দেখিয়াছি,—তিনি ভাবে এবং ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নূতন আদর্শের কবিতা লিখিয়াছেন যে ভাষায় তাহা খাঁটি বাঙলা। ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রথাবদ্ধ পথে চলিবার ধাতটি তাঁহার মোটেই ছিল না,—বাঙলা ভাষার স্বভাবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁহার নূতন প্রকাশভঙ্গি বাঙলা-ভাষাকে নবভাবে শক্তিশালিনী করিয়াছে—কিন্তু বাঙলা ভাষার স্বভাবকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। সংস্কৃত শব্দ তিনি প্রচুরভাবে ব্যবহার করিয়াছেন,—আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন এমন অনেক কথ্য শব্দ যাহার ব্যবহার যতীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙলা কবিতায় বিরল। কিন্তু আশ্চর্য এই, এখানে হীনবর্ণের শব্দগুলি যেমন বর্ণশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত শব্দগুলির জাতি নাশ করে নাই, বর্ণশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতও আবার নিম্নবর্ণের কথ্য রূপকে কোথাও অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার অসঙ্গত শুচিবাই প্রকাশ করে নাই। আমার মনে হয়, পরস্পরের এই সহজ মিলন সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল কবির বাঙলা-ভাষার স্বভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই—বাঙলার স্বভাবের সহিত কোন্ শব্দের কতটুকু যোগ এসম্বন্ধে অটুট বোধের ফলে। শুনিয়াছি, কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে যতীন্দ্রনাথ রামায়ণ-গান, পাঁচালি, কবি-গান এবং যাত্রা প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত

ছিলেন। গুরুজনের 'গরজন' উপেক্ষা করিয়া যতীন্দ্রনাথ নাকি রাত্রিকালেও গ্রামে গ্রামান্তরে এই-জাতীয় গান শুনিতে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি নিজেই নাকি এই-জাতীয় গান রচনা করিতেন।* এই সমস্তের ভিতর দিয়া বাঙলার লৌকিক ভাষাকেই সাহিত্যে ব্যবহার করিবার একটা সহজাত প্রবৃত্তি, নিপুণতা ও আত্মপ্রত্যয় গড়িয়া উঠিয়াছিল কবির প্রথম হইতে। সেই শক্তিই পরবর্তী জীবনের কাব্য-নির্মিতিতে তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে।

ইংরেজী সাহিত্যের সহিত যতীন্দ্রনাথের কোনও সময়েই তেমন উল্লেখযোগ্য ঘনিষ্ঠতা ছিল না, সুতরাং ইংরেজীর প্রভাব তাঁহার কবিতার উপরে কিছুই ছিল না। যুদ্ধোত্তর যুগের কবি বলিয়াও তাঁহাকে ঠিক আখ্যাত করা চলে না এই কারণে যে, তাঁহার দুঃখ-অবিশ্বাস লইয়া কিছু কিছু কবিতা মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব হইতেই রচিত হইতেছিল। কাজি নজরুল ইস্‌লাম প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব যেমন প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন যতীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও ভঙ্গি সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য তথ্যের উল্লেখ করিতেছি। ইংরেজী কবিতার সহিত যতীন্দ্রনাথের কোনও দিনই তেমন কোনও ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি জন ডনের কবিতার ভাব ও প্রকাশভঙ্গির সহিত যতীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও প্রকাশভঙ্গির স্থানে স্থানে বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। জন

* কবির জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট এ সকল কথা শুনিয়াছি

ডন্ ইংরেজী কবিতার প্রথম সার্থক 'স্যাটায়ারিস্ট' কবি ; এদিক হইতে সমধর্মজাত মিল উভয়ের ভিতরে হয়ত সম্ভব হইয়াছে। নতুবা ডনের কবিতা যতীন্দ্রনাথের কখনই পড়িবার কথা নয় ; সুতরাং এই মিল কোনও প্রভাবজনিত নয়, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

আমরা দেখিয়াছি, জীবনের সমস্ত দুঃখ-অপমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার যতীন্দ্রনাথ একটি নূতন ব্যবস্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—তাহা হইল কবির 'ঘুমিওপ্যাথী'। ডনের কবিতায়ও দেখি,—

Sleep, next society and true friendship,
Man's best contentment, doth securely slip
His passions, and the world's troubles ; rock me,
O sleep, wean'd from my dear friend's company,
In a cradle free from dreams or thoughts,…
(To SR Nicholas Smyth, Satire VII.)

আবার—

Soe, if I Dreame I have you, I have you,
For all our joyes are but fantasticall ;
And soe I 'scape the paine, for paine is true ;
And Sleepe, which locks upp sense, doth lock out all.
(Elegies, XI, The Dream.)

অন্যত্র দেখি,—

Jonas, I pitty thee, and curse those men,
Who when the storme radge most, did wake thee then :
Sleepe is paine's easiest salve, and doth full-fyll
All offices of death, except—to kill.

(The Storme.)

ডন্ অবিশ্বাসী কবি ছিলেন না, গভীর বিশ্বাসী ছিলেন; তথাপি তাঁহার কবিতায় থাকিয়া থাকিয়াই দেখিতে পাই,—

And, oh ! it can no more be questioned,
That beautie's best portion, is dead,
Since even griefe itselfe, which now alone
Is left us, is without proportion.

(Funeral Elegies, An Anatomie of the World.)

অন্যত্র দেখি,—

For even at first Life's taper is a snuffe.

(Elegies, XI, Dream.)

যতীন্দ্রনাথকে আমরা বলিতে দেখিয়াছি,—

কি হবে কথার ছলে ?
ভগবান চান—তবু হয় নাকো, একথা পাগলে বলে !

ভগবদ্বিশ্বাসী হইলেও ডন্‌কেও প্রশ্ন করিতে দেখি—

Would God (disputes the curious Rebel)
make
A lawe, and would not have it kept ?
(The Progress of the Soul.)

আমরা পূর্বে দেখিয়া অসিয়াছি 'মরুমায়া'র 'মৎস্য-শিকার' কবিতাটির ভিতর দিয়া যতীন্দ্রনাথের শোষণ-বিরোধী মনটি কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ডনের 'The Progress of the Soul' কবিতাটির মধ্যেও একস্থানে ঠিক সেই কথা দেখিতে পাই,—

He hunts not fish, but, as an officer
Stays in his Court, at his owne net, and
there
All suitors of all sorts themselves enthrall;
... ...Fish chaseth fish, and all,
Flyer and follower, in this whirlpoole fall,
O, might not states of more equalitie
Consist ? and is it of necessity
That thousand guiltless smales,
to make one great, must die ?

'ঘুমের ঘোরে'র প্রথম ঝোঁকে যতীন্দ্রনাথ সূর্যকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন,—

কেন ভাই রবি, বিরক্ত করো ? তুমি দেখি সব-ওঁচা,
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা।

ইহার সহিত সূর্যের প্রতি ডনের তিরস্কার মিলাইয়া দেখা যায়—

Busie old foole, unrulie Sunne,
Why dost thou thus
Through windows and through curtains
cull on us ?
(The Sun-Rising)

কাব্যাদর্শ বিষয়ে ডনের কিছু কিছু বিদ্রূপ-পরিহাসও আমাদিগকে যতীন্দ্রনাথের অনুরূপ বিদ্রূপাত্মক উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। অতিমাত্রায় ছন্দ-সর্বস্ব কবিগণকে যতীন্দ্রনাথ ছন্দানন্দস্বামী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। ডন্‌-ও এই ছন্দ-সর্বস্ব কবিগণ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন,—

One would moue loue by rhimes ;
but witchcraft's charms
Bring not now their old fears, nor their
old harms. (Satire II)

তবে ডনেরও সর্বাপেক্ষা বেশি ঘৃণা ও বিদ্বেষ কবিতার ক্ষেত্রে চর্বিতচর্বণকারিগণের প্রতি।—

But hee is worst, who beggarly doth chawe
Others' wits' fruits, and in his rauenous
mawe,
Ranckly digest, doth those things out-spue,

As his owne things ; and they are his
owne, it's true ;
For if one eate my meate, though it be
knowne excrement's
The meate was mine, the excrement's
his owne. (Satire II)

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য আরও একটি মিল লক্ষ্য করিতে পারি। যতীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা শাণিতবিদ্রূপাত্মক কবিতা হইল তাঁহার 'ঘুমের ঘোরে'র কবিতাগুলি ; প্রথম ঝোঁক হইতে সপ্তম ঝোঁক পর্যন্ত পর পর সাতটি কবিতায় এই 'ঘুমের ঘোর' শেষ হইয়াছে। ডনেরও দেখিতে পাই ঠিক সাতটি ঝোঁকে সাতটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা, 'স্যাটায়ার প্রথম' (Satire I) হইতে আরম্ভ করিয়া 'স্যাটায়ার সপ্তমে' (Satire VII) তাহার শেষ।

একজন 'স্যাটায়ারিস্ট' কবি হিসাবে ষড়্‌রসের মধ্যে কবি যতীন্দ্রনাথের সহজাত প্রসক্তি ঝাঁঝের দিকে। জিহ্বার অন্নময় রূপে যাহার পরিণতি ঝালে—তাহারই প্রাণময় এবং মনোময় উদ্‌গতি ঝাঁঝে। তিক্ত এবং অম্লেও কবির অরুচি নাই—মধুরের প্রতিই সহজাত বিতৃষ্ণা। ঝালের সহিত মিলন অম্লেরই বেশি—তাই ঝাঁঝের সহিত প্রায়ই মিশিয়া আছে অম্ল টিপ্পনী ; আর মধুর যদি কোথাও আসিয়া দেখা দিয়া থাকে তবে কবি যতটা পারেন তাহার সহিত বিদ্রোহের ঝাল ও বিদ্রূপের অম্লত্ব মিশ্রিত করিয়া তাহাকে একটি তীব্র স্বাদ দান করিয়া নিজেও পান করিতেন, কবিতার পানপাত্র ভরিয়া গৌড়জনের কাছেও পরিবেশন করিতেন। তবে ঝালের

গুণক্রিয়া সম্বন্ধে এখানে চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে, ঝাল দেহমনের তাপবৃদ্ধি করে—ওজোগুণ বৃদ্ধি করে; বাঙলা দেশের 'বাতাবরণে'র মধ্যে যে আর্দ্রতাধিক্য রহিয়াছে তাহার প্রতিষেধকরূপে ইহার বহুব্যবহার হয়ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ঝাল গ্রহণের জন্য জঠরানলের বিশেষ তীব্রতার প্রয়োজন—সেই জঠরানলের যেখানে অভাব সেখানে পুনঃ পুনঃ ঝাল প্রয়োগ আর্দ্রতা হেতু বাতজ উপসর্গের সহিত অপরিপাকের উপসর্গ মিলাইয়া হয়ত দেহ ও মনের হানির আশঙ্কা বাড়াইয়া দিতে পারে।

যতীন্দ্রনাথের কবিতার মূলরসের মধ্যে এই যে ঝাঁঝ ও অম্লত্বের প্রাধান্য ইহার একটি নিগূঢ় কারণ ছিল। কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি, যতীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে লিখিত কিছু কিছু অপ্রকাশিত কবিতা রহিয়াছে; সে কবিতাগুলি একান্ত ভাবেই মামুলি—ভাবে বা ভাষায় কোথাও কোনও মহৎ প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় না। এই কবিতাগুলি এবং তাঁহার 'মরীচিকা'য় প্রকাশিত প্রথম কবিতাগুলির ভিতরে কোথাও কোনও সজাতীয়ত্ব নাই। তিনি যখন প্রথম সার্থক কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন তখন সেই কবিতা রচনার পিছনে বিশুদ্ধ কাব্যরস আস্বাদ করা এবং আস্বাদ করান ব্যতীত আর একটি বিশেষ অভিপ্রায় নিহিত ছিল। কবির একদিনের একটি স্বীকৃতির ভিতর দিয়াই সেই অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কবির সেই স্বীকারোক্তিটিই এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"মজাটা দেখুন। আমার বাল্যকাল থেকে কখনও ভাবিওনি যে আমি কবি হবো। কবি হতে চাইওনি। লেখাপড়া শিখলাম, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলাম। আমি পাশ করা ইঞ্জিনিয়র। স্বভাবের মধ্যে এক দুঃস্বভাব জেগেছিল হঠাৎ। সেটা হচ্ছে কবিদের পিছনে লাগা। তাদের ঠাট্টা করা। কারণও স্পষ্ট। আমি ইঞ্জিনিয়র। বুঝি বস্তু। ইঁট-কাঠ, লোহা-লক্কড়, ঘর-বাড়ী, ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তা-ঘাট। অর্থাৎ এক কথায় বস্তুতান্ত্রিকতা—Materialism। কাজেই এটা তো সোজা কথা—কবিদের ভাবালুতা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হবেই। অলস মস্তিষ্কে তাদের যতো আকাশকুসুম কল্পনা তারই বিরুদ্ধে বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়বার ইচ্ছা জাগলো আমার মনে। কিন্তু তার আঙ্গিক কি রকম হবে? ভেবে দেখলাম পদ্যবাণ নিক্ষেপই বাঞ্ছনীয়। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের আঘাত হানতে হবে। তাই লেগে পড়লাম। যাকে বলে উঠে পড়ে লাগা।"......

"কিন্তু আকাশচুম্বী মহলার জানালায় বসে জগৎ দেখার সময় এবং সুযোগ আমার কই? আমি ইঞ্জিনিয়র লোক। পরের চাকরী করি। তাই পথে নামতে বাধ্য। সহর থেকে গ্রাম। গ্রাম থেকে গ্রামে পরিক্রমা চালাতে হয় আমাকে কাজের তাগিদে। আর এই পরিক্রমার জন্য, ধুলোবালি, ঝক্কি-ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেতে কাঁচঢাকা হাওয়া-গাড়ীকে তো বাহন পাইনি। দু'চাকার সাইকেল সার। ক্রিং ক্রিং ঘণ্টা বাজানো আর টুকুস টুকুস ক'রে এগিয়ে চলা। এই চল্‌তে গিয়েই ত

প্রত্যক্ষ করলাম বাঙলা দেশকে। বাঙলাদেশের গ্রামকে। কি আশ্চর্য! এই বাঙলার পল্লী সম্বন্ধে কতো কবিতা পড়েছি। আহা, এই বাঙলার রূপ বর্ননা করতে কতো কবি উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছেন। দেখেছেন তার শ্যামল রূপ। নদীমাতৃক, শস্যশ্যামলা কৃষকের উল্লাসমুখরিত বাঙলা দেশ। এখানে রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা সারা হয়। বাঙলার বধূর বুকভরা মধু ইত্যাদি আরো কতো ঐশ্বর্য নাকি বর্তমান। হায়! আমার ভাগ্য মন্দ। এর একটিও কি চোখে পড়ল? আমি তো দেখলাম ঠিক বিপরীত। নদীমাতৃক দেশের নদী আজ মজে গেছে। খানা ডোবা যেদিকে তাকাই পানায় ভর্তি। শস্যক্ষেত্র খাঁ খাঁ করছে। চাষীরা সর্বহারা, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, শীর্ণকায়। আর বাঙলার বধূ—তাদের দেখলাম জেলাবোর্ডের দেওয়া ইঁদারার পাশে জমায়েৎ হতে। গ্রীষ্মের দারুণ দুপুরে উন্মুক্ত প্রান্তরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে। আর এই নদীমাতৃক বাঙলার বধূদের দেখলাম এক কলসী জলের জন্য পরস্পর বাক্য-গরল বর্ষণ করতে। উপায় নেই তাদের। হয়তো স্বামীপুত্র ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে। উনুনে বালি ফুটে যাচ্ছে। সাইকেল চেপে যেতে যেতে এই সবই চোখে পড়েছে আমার। চোখে পড়েনি শুধু বাংলার সেই কাব্যরূপ্।

তাকে পাওয়ার জন্য মন আমার আকুলি-বিকুলি করছে। অনেক খুঁজেছি। পাইনি তবুও। প্রথমে নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করেছি। পরে ক্ষোভ হয়েছে, অপরাধী করেছি কবিদের। মনে হয়েছে, তাঁরা এমন কি সত্যরূপ প্রকাশ করেন

যা আমাদের নজরে পড়ে না। আর যে সত্য আমাদের নজরে পড়ে না, আমাদের কাজে লাগে না, কি প্রয়োজন তাকে নিয়ে? তাই তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শরতে বঙ্গে'র প্যারডি লিখলাম এবং সেই রকম আরো নানারকম লিখতে আরম্ভ করলাম। সেই চলার পথেই যা চোখে পড়ত, যা দেখতাম, যা মনে লাগতো সেই ধুলোবালিমাখা জগৎই হয়ে উঠল আমার অস্ত্র। তাই তুলে তুলে ছুঁড়তে লাগলাম কবিদের বিরুদ্ধে। উঃ, আমার কত আশা, বসিয়ে দেব সব। ওঁদের উৎখাত করে দেব। কিন্তু হায়রে—" কবি থামলেন। মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

বল্লাম, কি হ'ল তাতে?

কি আর হবে? নিয়তি কেন বাধ্যতে? হোল না, ওঁদের উৎখাত করা গেল না। উপরন্তু হোল কি জানেন? ভারতবর্ষ যেমন সমস্ত বিদেশকে, বিদেশীর চিন্তাকে, সব শক, হূন, পাঠান, মোগলকে একদেহে লীন করে নিয়েছে, ঠিক তেমনি করেই বাঙলার কবিদল অর্থাৎ আমার শত্রুদল—চেঁচিয়ে উঠলেন,—কবি—কবি—কবি—"*

এই দীর্ঘ স্বীকৃতির মধ্যেই কবির বিদ্রূপ-প্রবণতার উৎস-মূলের সন্ধান পাওয়া যাইবে। মূলতঃ রস-পরিবেশন নয় রস-পরিহসনই ছিল কবির উদ্দেশ্য—কবিতাভঙ্গি ছিল সেই উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্র। আমার বিশ্বাস, এই সহজাত প্রবণতার পথে অগ্রসর হইতে হইতে কবি তাঁহার গভীরতর স্বরূপে গিয়া

* 'একটি স্মরণীয় দুপুর'—অজিত দাশ (হোমশিখা, ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন)

প্রবেশ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং স্বধর্মের একটা বিশেষ দিককে প্রকাশ করিতে গিয়া যে একটি অনুকূল ভঙ্গি তিনি গ্রহণ করিলেন তাহা ক্রমে তাঁহার অন্তর্নিহিত সমগ্র কবিধর্মেরই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের বাহন হইয়া উঠিল।

যতীন্দ্রনাথের কাব্য-নির্মিতি সম্বন্ধে আরও একটা গোড়ার কথা মনে রাখিতে হইবে। আমরা আমাদের পূর্ববর্তী অনেক আলোচনা প্রসঙ্গে বহুবার এই কথাটি বলিয়াছি যে আমরা সাধারণতঃ 'ভাবুক কবি' বলিতে যাহা বুঝি, যতীন্দ্রনাথ স্বভাবে সে-জাতীয় কবি ছিলেন না। ভাব মনে জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা সচেতনতার বেড়া সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ভাবালুতায় পর্যবসিত হওয়া হইতে রক্ষা করিতেন; তাহার পর বেশ কিছু দিন চলিত কবির আত্মসংহৃত হইয়া একটি বিশেষ ভাবকেন্দ্রিক হইয়া নিরন্তর 'তা' দিবার পালা; মননের 'তা' লাগিয়া লাগিয়া ভাব-ডিম্ব হইতে কবিতা-শাবকের জন্মলাভ ঘটিত। সত্যটিকে কবির নিজের দেওয়া আর একটা উপমার সাহায্যেও বুঝাইয়া বলা যাইতে পারে। কবির মনের মধ্যে একটি তপ্ত কড়াই ছিল—তরল ভাবকে সেখানে ঢালিয়া কবি কড়াপাক দিতে থাকিতেন —মননের পাকে পাকে সে যখন স্বাদে, বর্ণে ও গন্ধে কবির মনের মতন হইয়া উঠিত তখনই তিনি কবিতার সাজে ফেলিয়া ফেলিয়া তাহা বাহিরে পরিবেশনের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। কবির ভাবের উপরে যেমন ভাবনার কড়া পাক ছিল, তেমনই কবিতার প্রকাশিত রূপের মধ্যেও কবির যথেষ্ট

ঘষা-মাজা থাকিত। ইহার ফল ভালমন্দ দুই দিকেই লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যতীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও নির্মিতিতে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও বাহুল্য বা শৈথিল্য দৃষ্ট হয় না—ছন্দ, শব্দ-চয়ন ও শব্দ-রচন, অলঙ্কার-প্রয়োগ—কোথাও কোনও চিরাচরিতের গা-ভাসান অনুবর্তন নাই;) 'হাতুড়ে' কবির পেশীবহুল হাতের পিটুনীতে তাহা শক্ত ও শাণিতরূপে গড়া পেটা। \ইহা যেমন একদিকের একটা পরম লাভ, অন্য দিকের একটা পরম ক্ষতি হইল, পাঠকমনের একটা বড় সংশয়—কবিমনের খোলামেলা স্পর্শ তাহা হইলে বুঝি সবটা লাভ করিতে পারি নাই। সেই স্পর্শটাও যে পাঠকের পরম কাম্য। অনেক শিথিলতা অনেক ত্রুটি আমরা অনেক সময় প্রেমের স্পর্শে মার্জনা করিতে রাজি হই যদি নিরাবরণ মনটির সহিত খোলামেলা ভাবেই মনটিকে মিলাইয়া দিতে পারি।)

কবিচিত্তে কাব্য-প্রক্রিয়া বিষয়ে যতীন্দ্রনাথ আদৌ ক্রোচেবাদী ছিলেন না। শিল্পের বহিরাকৃতি শিল্পিমনের গভীরে রসানুভূতির মধ্যেই অনুস্যূত থাকে, যতীন্দ্রনাথ এ-কথাটায় তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহার মতে আমাদের চিত্তের মধ্যে রসানুভূতি একটা জিনিস—তাহাকে সর্বো-পযোগী রূপ দিয়া বাহিরে প্রকাশের ক্রিয়া হইল অপর একটি পরবর্তী ক্রিয়া। এ বিষয়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কাব্য-পরিমিতি' গ্রন্থের বহু আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার স্পষ্ট মতা-মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"কল্পনা-সাহায্যে রসাস্বাদ, ও কাব্যে তাহার প্রকাশ, তুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। রসলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত রসসিক্ত কবিচিত্তই উৎকৃষ্ট কাব্যরচনায় সমর্থ হয়। তখন চলিতে থাকে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে'—

অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন।

আর সেই মধুচক্র নির্মিত হইয়া উঠে যাহাতে কেবল 'গৌড়জন' নহে. বিশ্বের সমস্ত রসিকজন নিরবধি আনন্দে মধুপান করিবে। তখন মধুমক্ষিকার ন্যায় কবি পুনঃ পুনঃ রসসিক্ত অন্তরের কুসুমকাননে উড়িয়া যায়, আর ছন্দিত, অলঙ্কৃত এবং ব্যঞ্জিত বচনামৃত আহরণ করিয়া কাব্যের মধুচক্রে রাখিয়া যায়।" (পৃঃ ১৬-১৭)।

(রসানুভূতি চিত্তের যে অবস্থায়ই সাধিত হোক, কাব্যের গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্যে কবিকে সর্বদাই সচেতন থাকিতে হয়, ইহাই যতীন্দ্রনাথের মত। তাই তিনি বলিয়াছেন, "কল্পনা-সমুত্থ কাব্যে কবিচিত্ত বুদ্ধিদ্বারা মার্জিত; বিভাব-অনুভাব-উপভাব সম্বন্ধে জাগ্রত; শব্দচয়ন, ছন্দোবন্ধন, অলঙ্কার নির্বাচন, বাচ্যার্থবোধ ও ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ইহাদের যথাযথ জ্ঞান তাঁহার আছে। এক কথায় কবিচিত্ত তাহার আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে **সজাগ**।" ('কাব্য-পরিমিতি' পৃঃ ৪৫)। এই সজাগ থাকা বা সচেতনতা সম্বন্ধে কবি বহুস্থানেই খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন।) তিনি বলিয়াছেন, "কবিচিত্ত এখানে রসসিক্ত হয় বলিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে তাহা নহে,

বরঞ্চ উত্তম প্রতিভার লক্ষণই এই যে অন্তরলোক হইতে বচনামৃত আহরণ করিয়া আনন্দলোক বিরচন করিবার সময় সে আত্মসম্বন্ধে বেশ সচেতন থাকে। কবিচিত্ত যদি আপনার সৃজনক্ষেত্রে আপনি ডুবিয়া যায় তবে তাহার সৃষ্টিশক্তি বা প্রতিভার দুর্বলতাই সূচিত হয়। এমন কবিচিত্তের পরিচয় আমরা মাঝে মাঝে পাই যাহা শক্তিশালী হইলেও আত্ম-সচেতনতার অভাবে সামর্থ্যোচিত কাব্যসৃষ্টি করিতে পারে নাই।" (ঐ পৃঃ ৮০)

(কাব্য-নির্মিতির ক্ষেত্রে এতখানি আত্ম-সচেতনতা কবি-সাধারণের পক্ষে কতখানি দোষের বা গুণের সে বিষয়ে তর্ক ও সংশয়ের অবকাশ আছে; কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কাব্য-নির্মিতি সর্বদা এই আত্ম-সচেতনতার নীতিকেই অনুসরণ করিয়াছে।) তাই শুনিয়াছি, তিনি পাঁচ-সাত দিন বসিয়াও একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। গল্প শুনিয়াছি, হাওড়া স্টেশনে বসিয়া একটি কবিতার যে পংক্তি মনে আসিয়াছে, কালীঘাটের বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাহার দ্বিতীয় পংক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় তত্ত্ব এবং তর্কের প্রাধান্য অনেকখানি এই পথেই সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কবিতার ভিতরে এই তত্ত্ব সম্বন্ধেও যতীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ মত ছিল,—সে মত তাঁহার বিশেষ প্রবণতারই দ্যোতক। তিনি বলিয়াছেন, "বরং ইহাই সম্ভব যে ভাব-বিশেষের বাসনা চিন্তাশীল কবিচিত্তে দৃঢ় হইলে দানা বাঁধিয়া প্রথমে এক একটি তত্ত্বরূপই গ্রহণ করে এবং সেই তত্ত্ব উৎকৃষ্ট

কবি-প্রতিভার নিকট রসে উঠিবার যোগ্যতর ও উচ্চতর উপাদান হইয়া উঠে। কর্দম সাহায্যে ঘরের দেওয়াল দেওয়ায় বাধা নাই, কিন্তু কর্দম হইতে ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৎ-সাহায্যে দেওয়াল দেওয়াই অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রথা মনে হয়। ইষ্টক ত' আর কিছুই নহে, সে একপ্রকারের মৃৎ-তত্ত্ব মাত্র।" (কাব্য-পরিমিতি, পৃঃ ১০৪)। বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, কবিতার ক্ষেত্রে মাটির ঘরের প্রতি কোনও প্রসক্তি ছিল না যতীন্দ্রনাথের; কাদামাটিকে বাছিয়া-ছানিয়া, প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ বিশেষ ছাঁচে ঢালিয়া—তাহাকে ভাবনার তাপে তাপে শক্ত করিয়া পোড়াইয়া লইয়া তবে সেই উপাদানেই তিনি বিশেষ কবিতার আকার-প্রকার গড়িয়া তুলিতেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের বিচারে এই পন্থার গুণও আছে—দোষও আছে; শক্ত ইষ্টকে গড়া ঘর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং মজবুত বটে—কিন্তু মাটির ঘরের প্রতিও মানুষের মনের একটা কমনীয় মমতা আছে। সেই মমতা-মাখানো মাটির ঘর তাঁহার সৃষ্টিতে দুর্লভ। একেবারে দুর্লভ বলিতে পারি না,—উগ্র আত্ম-সচেতনতার যুগেই দুর্লভ—তাহার পরে জীবনের চিন্তা-পোড়ান শক্ত শক্ত তত্ত্বের থান ইঁট ছাড়িয়া কোমল কাদামাটির দিকেও কবির মন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—তখন নরম দেওয়ালের কাদামাটির ঘরও কিছু কিছু দেখা দিয়াছে।

কবিতার ক্ষেত্রেও যে কবির এই নিপুণ হিসাবী মন—অর্থাৎ এই যে বুদ্ধি-প্রাধান্য ইহাকে কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁহার

একটা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য মনে না করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে একটা যুগবৈশিষ্ট্য বলিয়াই মনে করিতেন। এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার ‘কুমার-সম্ভবে’র ভাবানুবাদের ভূমিকায়। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, “যতক্ষণ কবির সুর-লোকে বাস করিতেছিলাম, ততক্ষণ মন সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইয়াই ছিল। কিন্তু বৈশ্যপ্রধান বিংশ শতাব্দীর মানবচিত্ত বোধ হয় কিছুতেই তাহার হিসাব ভুলিতে পারে না।” কবি ‘কুমার-সম্ভবে’র প্রথম সর্গ পড়া শেষ করিয়া কেমন একটা বেদনা এবং অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। এ বেদনা এবং অস্বস্তি কিসের জন্য ? কবি বলিতেছেন,--“কিন্তু আমার হিসাবী চিত্ত মুগ্ধ হইয়াও ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল—এত মুক্তা, তবু কবি বাছিয়া গুছিয়া মালা গাঁথেন না কেন ?”

মহাকবি কালিদাসের যুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবি যতীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

“আবার মনে হইল—বুঝিবা সে-যুগের প্রকৃতিই ছিল স্বতন্ত্র। সে ছিল সৃষ্টির যুগ, প্রাচুর্যের যুগ। আর আজিকার যুগ—অভাবের যুগ, সুতরাং হিসাবের যুগ। পুষ্প-সৃষ্টির সুগভীর উদ্দেশ্যের সহিত বিশৃঙ্খল অজস্রতার, বেহিসাবী প্রাচুর্যের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু যে ফুল ফুটায় সে মালা গাঁথে না। মালা গাঁথিবার কৌশল তাহাকেই পরম যত্নে আয়ত্ত করিতে হয়, যাহার সৃষ্টি করিবার শক্তি সীমাবদ্ধ. স্বল্পকে সুন্দর করিবার ভার যাহার উপর পড়িয়াছে। সে ছিল অরণ্যের যুগ—স্বতঃ-সমাগত শাল-তাল-শাল্মলী-তমাল-চম্পক-বটের অসংবদ্ধ

আনন্দমুখর মহামিলন। আর এখন আসিয়াছে বোট্যানিকাল গার্ডেনের যুগ। নানাদিগ্‌দেশাৎ সযত্নসংকলিত বৃক্ষলতাগুল্ম-সন্নিবেশে কচিৎ-নিকুঞ্জখচিত এভিনিউ-পরম্পরার সুবিন্যাস। আমার মত যাহারা বোট্যানিকাল গার্ডেনের আওতায় শিক্ষা শেষ করিয়াছে, তাহারা শৃঙ্খলাহীন অপ্রয়োজনের অজস্রতায় পরিপূর্ণ শ্যামলক্ষ্মীর বিরাট আরণ্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার শক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে ইহাই ত স্বাভাবিক।......

"কিন্তু এই নাগরিক যুগে পূর্ণ আরণ্য দৃষ্টি আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। তখন রাজচক্রবর্তীও রাজব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বনে গমন করিতেন। আর আজ সন্ন্যাসীকেও যোগ সারিয়া নগরোপকণ্ঠে আশ্রম খুলিতে হয়। এখন কেয়ারিকরা ফুলবাগিচার লিরিক্ সৌন্দর্যই আমাদের দুর্বল চিত্তের প্রধান পথ্য; কভু কদাচিৎ আমরা বোটাানিকাল্ গার্ডেন পর্যন্ত গিয়া অল্পপরিসরের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য এপিক্ আরণ্য শোভা উপভোগ করিয়া আসিতে পারি, এই পর্যন্ত। ইহার অধিক শক্তি কই, অবসর কোথায়? কাজেই আমাদের অপরিসর কাব্যের ছত্রে ছত্রে হিসাব, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুনির্বাচিত অল্পসংখ্যক রত্নখণ্ডকে সংবিদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করিয়া বাণীর কণ্ঠহার রচিত হইতেছে দেখিলেই আমরা পরম আনন্দ অনুভব করি।"

কথাগুলি একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম এই জন্য যে, কথাগুলি শুধু যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক মহাকবি কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের ভাবানুবাদের ক্ষেত্রেই স্মরণীয় নয়, তাহা

যতীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতা-সৃষ্টির ক্ষেত্রেই স্মরণীয়। উপরের উদ্ধৃতির ভিতরকার দুইটি কথার উপরে আমি বিশেষভাবে জোর দিতে চাই। প্রথম কথাটি হইল, কবিতায় আমাদের বর্তমান কালের যে সূক্ষ্ম এবং সতর্ক হিসাববোধ তাহা কোনও সনাতন কবিধর্মের অন্তর্গত জিনিস নয়,—উহা বর্তমান যুগধর্মের ভিতর দিয়া আবর্তিত একটি বিশেষ প্রবণতা। যুগধর্মজাত এই প্রবণতা আধুনিক কবিতারই একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাই যতীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া কবিতার মধ্যে বুদ্ধি-প্রাধান্যের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম—পরবর্তী কালে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। দ্বিতীয় আর একটি কথা লক্ষ্য করিতে পারি। যেখানে সৃষ্টির স্বতঃ-উৎসারিত প্রাচুর্যের অভাব হিসাবী মনের সতর্ক নির্বাচন এবং সযত্ন সাজানো-গুছানোর চেষ্টা সেখানেই স্বাভাবিকভাবে বড় হইয়া দেখা দেয়। যতীন্দ্রনাথের মধ্যে সৃষ্টির সেই অজস্রতা ছিল না,—সেই কারণেই হয়ত নির্বাচন, শৃঙ্খলা, সুবিন্যাস এবং ঘষণ-মার্জনের দিকে কবির ঝোঁকটা প্রথমাবধিই একটু বেশি ছিল।

॥ ১৪ ॥

কবি যতীন্দ্রনাথের কবিধর্ম কি তাহা লইয়া পূর্বে অনেক আলোচনা করিয়া আসিয়াছি,—কিন্তু সে সম্বন্ধে 'কেন' প্রশ্নটি লইয়া আরও আলোচনার অবকাশ আছে। কাহারও

কাহারও মতে এই 'কেন' প্রশ্নটা এখানে অবান্তর। অবান্তর এইজন্য যে ইহার উত্তর ত এক কথায়ই দেওয়া যাইতে পারে। যদি দৈবকে বিশ্বাস করা যায় তবে বলা যাইতে পারে, কবি-প্রতিভা দৈবশক্তি—তাহার প্রকৃতিও তাই সবটাই দৈব-নিয়ন্ত্রিত। আর দৈব বিশ্বাস না করিলেও বলা যাইতে পারে, প্রকৃতিই মানুষের মনোধর্মকে খেয়াল বশে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া তৈয়ারী করিয়া দিতে পারে। আকস্মিক বৈষম্যের দ্বারাই (accidental variation) ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু মুশকিল হইল এই, আমাদের ঐতিহাসিকবোধ প্রতিভাকে সম্পূর্ণরূপে দৈবনির্ভর করিয়া রাখিয়া তৃপ্তিলাভ করে না,—আর জড়বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের মধ্যে অগ্রপশ্চাতের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য কোনও 'আকস্মিকতা'য় আমরা আর বিশ্বাসী নই। সুতরাং এই একটি বিশেষ কবিধর্ম সম্পর্কিত 'কেন'র উত্তরটিকে বাস্তব ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইবার জন্য আমাদের ঔৎসুক্য।

কবির ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসের মধ্যে এই 'কেন'র উত্তর খুঁজিবার চেষ্টা চলিতে পারে। সে চেষ্টার দিকে প্রথমেই মনের একটা ঝোঁক আসিবার যুক্তিপূর্ণ কারণও রহিয়াছে। সে কারণ হইল এই, প্রথম জীবনে কবি নানা কঠিন রোগে ভুগিয়াছেন। ম্যালেরিয়া তাঁহার বহুদিনের নিত্যসহচর, টাই-ফয়েড-প্লেগ জাতীয় আতঙ্ককর ব্যাধিও প্রথম জীবনেই তাঁহাকে সাময়িক সাহচর্য দান করিয়াছে। ইহার সহিত আরও একটি তথ্যকে যুক্ত করা যাইতে পারে—পাঠ্যাবস্থায় খুব কঠোর না

হইলেও মধ্যবিত্তোচিত দারিদ্র্যনিষ্পেষণও কবিকে কিছুটা ভোগ করিতে হইয়াছে। কড়া প্রতিক্রিয়াশীল বহু ডাক্তারি ঔষধ তাঁহার জৈব-প্রবাহের সহিত প্রথম জীবন হইতেই মিশিয়া গিয়াছিল; এই কড়া ঔষধের প্রতিক্রিয়াই কি ধাতটি অমন করিয়া কড়া করিয়া গড়িয়াছিল? কৈশোর এবং যৌবনের অস্বাচ্ছল্য এবং পরবর্তী চাকুরি-জীবনেরও নানা বিড়ম্বনা এবং আশানুরূপ ফললাভে নৈরাশ্য কি এই কড়া ঔষধের প্রতিক্রিয়াকে তীব্রতর করিয়া কবিকে জীবনভর 'নৈরাশ্যবাদী' করিয়া তুলিয়াছিল? কবি নিজেও কোনও কোনও সময় রসিকতা করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট বলিয়াছেন যে, তাঁহার কবিধর্ম নিরন্তর কুইনাইন সেবনের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কবি নিজেই আবার স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"আমার কাব্যের দুঃখবাদ পারিবারিক জীবনের দুঃখ হইতে উদ্ভূত নহে; এ ভূত কোথা হইতে ঘাড়ে চাপিল, জানি না—প্রথম কৈশোর হইতেই সে আমার পিছু লইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।" কবির এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া বেশ বোঝা যায় কবির যে বিশেষ মানসধর্ম তাহা কোনও আগন্তুক ধর্ম ছিল না—তাহা ছিল তাঁহার সহজাত ধর্ম। কবির এই আত্ম-স্বীকৃতি ছাড়াও আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যতীন্দ্রনাথের ন্যায় একজন সার্থক কবির মানসধর্মকে আমরা যদি শুধু মাত্র দৈহিক আধিব্যাধি বা পারিবাবিক জীবনের দুঃখদারিদ্র্যের দ্বারাই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করি তবে এত বড় একটা কবি-প্রতিভার উপরে আমরা অমার্জনীয় অবিচার করিব। সুতরাং

কবির এই মানস-বৈশিষ্ট্যের কারণকে আমাদের বৃহত্তর পরিধি ও শক্তির মধ্যে খুঁজিতে হইবে। কিন্তু সেই পথে অগ্রসর হইবার পূর্বে একটা কথার উল্লেখ করিতে চাই; দৈহিক ব্যাধি তাঁহার মনের জমিনকে সবটা গড়িয়া না তুলিলেও ব্যাধিত দেহ-মন তাঁহার কবিধর্মের উপরে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস আমরা শুধু ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই গড়িয়া লই নাই—কবির কাব্যের মধ্যেই এখানে সেখানে কিছু কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে। কবির 'সায়ম্' কবিতা-গ্রন্থের দু'একটি কবিতায় ব্যাধিত দেহ-মন কবিদৃষ্টির উপরে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কবি নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'আষাঢ়-মধ্যাহ্নে' কবিতাটির উল্লেখ করিতেছি। কবিতাটির আরম্ভে দেখি—

মধ্যাহ্নে পরের ঘরে নিঃসঙ্গ শয্যার 'পরে
শুয়ে আছি, রুগ্ন দেহ মন,
সুদূর প্রান্তর হ'তে আষাঢ়-মন্থর স্রোতে
গন্ধবহ বহে অকারণ।
বাতায়নে লৌহদণ্ড আয়ত আকাশে খণ্ড
করিয়াছে কালো দাগ টানি';
বহু ঊর্ধ্বে বিন্দুপ্রায় ঘুরিয়া মিশিয়া যায়
শকুনি না গৃধিনী, কি জানি!

ইহার পরে খানিকটা প্রকৃতির বর্ণনা; সে বর্ণনায় দেখি, নীল-মূর্তি নীলাকাশ শতচ্ছিন্ন মেঘবাস পরিয়া উদাসীন বসিয়া আছে, পূর্বের জানালার কাছে বিল্বশাখায় কণ্টকিত ত্রিপত্রের

নাচন, দিগন্ত-ফোঁড়া উচ্চ তালচূড়ায় রুদ্রসেনার ত্রিশূল—এই সমস্তের পর কবি-হৃদয়ের একটি করুণ আর্তি—

ভগ্ন দেহ, রুগ্ন মন নিবিড় নীল গগন,
বাতায়নে লৌহদণ্ড-সারি,
মাঠ-পরে মাঠ শুধু, আষাঢ়েও করে ধূ ধূ!
হে সুন্দর, হে বন্ধু আমারি!

এখানকার কবিমনের আর্তিটুকু আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কবির মনের গহনে যেন রহিয়াছে সুন্দরের বাসনা—কিন্তু ভগ্নদেহ রুগ্ন মনে আষাঢ়ের মাঠও মরুভূমির ধূসরতা বহন করে, নিবিড় নীল গগনের মধ্যেও বাতায়নের লৌহদণ্ডসারির কালো কালো দাগগুলি বড় হইয়া ওঠে—সুন্দরকে আর কোথাও দেখা হয় না—ইহাই কবিমনের আর্তির ব্যঞ্জনা?

(কবির পরিণত বয়সের কবিতার মধ্যে কোথায় যেন একটা অতৃপ্তযৌবনের দীর্ঘনিঃশ্বাস জাগিয়া আছে। একদিন যেন যৌবনের বসন্তরাত্রে তাঁহার জীবনেও শ্যামসম্ভারের মধ্যে একটি চম্পক ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সে যেন সহসা শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে—কবি তাহাকে উপভোগ করিতে পারেন নাই। সেই অকালে শুকাইয়া ঝরিয়া-যাওয়া চাঁপার স্মৃতি কবিচিত্তে একটা স্থায়ী বেদনার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। 'সায়ম্'-এর 'ছায়া-চম্পক' কবিতায় এ-কথার আভাস আছে। কবি এক-দিন কার্ত্তিকের বেলায় শীর্ণ রাজপথে একটি বাড়ির বারান্দায় অকারণে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; আর—

খরতর জনস্রোতে
পড়েছে মনের ছায়া মোর,
অস্পষ্ট অস্থির ;
তা'রি পানে চেয়ে আছি একান্ত একক।

সেই সময়ে—

সহসা ভাসিয়া এল গন্ধ কোথা হ'তে ?
আশুষ্ক চাঁপার গন্ধ যেন !
পল্লব-আড়ালে রহি' বৃন্তের বাঁধনে
যে চাঁপার সবে মাত্র ঘটেছে নির্বেদ ;
কণ্ঠলগ্ন মাল্যমাঝে জড়াজড়ি যে চাঁপারা
সহসা হারালো নিশিভোরে
আসঙ্গ-হরষ-লিপ্সা,
যাদের দক্ষিণে বামে
কুৎসিত সূতার বন্ধে ব্যবধান হয়েছে প্রকট,
সূচিবিদ্ধ পাণ্ডুবৃন্তে
ক্লান্ত দল পড়েছে এলায়ে,
সেই সে-চাঁপার গন্ধ কোথা হ'তে এল !

কবি একাকী ভাবিতে লাগিলেন, কোথা হইতে এই চাঁপার গন্ধ আসিতেছে ! পথে ত কোথাও চাঁপা নাই, ঘরে নাই,—আকাশে-বাতাসে নাই,—কার্ত্তিকে কোনো মালাকর কবরীর জন্য বা ফুলদানিদের ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য চাঁপার আয়োজন করে না ! হেমন্তে কাহারো বাগানে চাঁপা ফোটে না—কবি নিজে কোনও দিন চাঁপার এসেন্স কেনেন নাই—তথাপি কোথা

হইতে আসিতেছে এই আশুষ্ক চাঁপার গন্ধ! কবি ভাবিয়া বুঝিতে পারিলেন,—এই শুষ্ক চাঁপার গন্ধ বাহিরে কোথাও নাই—এগন্ধ রহিয়াছে তাঁহার নিজেরই মনে—

চেয়ে দেখি নিম্নে জনস্রোতে
ভেঙে ভেঙে যায়, দুলে দুলে কাঁপে
আমারি মনের ছায়া অস্পষ্ট অস্থির—
সে ছায়ার মাঝে প্রতিবিম্বে পড়েছে উলটি'
ও কি ও চম্পক-তরু!
গাছভরা ম্লান পাতা শাখাভরা বিবর্ণ বিনত চাঁপা ফুল,
ক্লান্ত কিশলয় স্তবকে স্তবকে নম্র,—
দাঁড়ায়ে কাঁপিছে তরু জনস্রোত-তলে।
কোন্ শ্যাম চৈতীচম্পা আমারি অন্তরে
সহসা শুকায়ে গেল ডালে মূলে ফুলে
হেমন্তের হিমাঙ্গ ছায়ায়?
তাহারই ছায়ার গন্ধ ভেসে এল আজ
আমার কায়ার মূলে।

এই যে বিশুষ্ক ম্লান শাখায় বিবর্ণ বিনত চাঁপাতরুর প্রতিবিম্ব, কবির হৃদয়ে ইহা কি বিশুষ্ক বিবর্ণ যৌবনেরই বেদনাময় স্মৃতি? ভরা যৌবন লইয়া জনস্রোতের মধ্যে কি স্বচ্ছন্দে এবং সানন্দে ভাসিয়া চলিবার সুযোগ পান নাই---তাই কি অপূর্ণ বাসনার স্তবক স্তবক শুষ্কক্লান্ত কিশলয় লইয়া যৌবনের চাঁপা-তরুর প্রতিবিম্ব জনস্রোত-তলে দাঁড়াইয়া কাঁপিয়া মরিতেছে ?) সেই ব্যর্থ যৌবনের স্মৃতিই কি শুষ্ক চাঁপার গন্ধে ক্ষণে ক্ষণে অকারণে

কবির পরিণতকালের মনকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছে? 'সায়ম্'-এর 'কৃষ্ণা চতুর্দশী' কবিতায় এই সত্যের আরও স্পষ্ট স্বীকৃতি রহিয়াছে।—

কে কাঁদে অন্তরে মোর?
গগনে ঘনায় মোর
শ্রাবণের রাতি।
পথ চলি কি সাহসে?
মৃত মুখ মৃদু হেসে
সাথে হয় সাথী।
জড়ায়ে জরার কাঁথা
সঙ্গোপনে তোলে মাথা
অতৃপ্ত যৌবন,
কালো পাথরের কানে
কবোষ্ণ স্বপন আনে
উষ্ণ প্রস্রবণ।

জরার কাঁথা জড়াইয়া যে অতৃপ্ত যৌবন কবির মনের মধ্যে 'সায়ম্'-এ গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিয়াছে তাহা তাঁহার প্রথম জীবনে নিশ্চয়ই সুন্দর-বিমুখতার এবং অবিশ্বাসের ইন্ধন যোগাইয়াছে। আমরা প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছি, কবি সমাজ-জীবনে খুব মিশুক লোক ছিলেন না; আত্মস্থতা এবং কোণ-স্থতা সর্বদা এক নয়। ভগ্নস্বাস্থ্যই কি প্রথম জীবনে কবিকে বহুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবনের আনন্দরস-আস্বাদনে বঞ্চিত করিয়াছিল? তাঁহার জীবনে যে একাকিত্ব তাহাকে

কবি নিজেও সর্বদা সানন্দে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই অতিমাত্রায় একাকিত্বই কবির জীবনকে আরও বিরস বিশীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। তাই পরবর্তী জীবনে কবি অনুভব করিয়াছেন, কৃষ্ণা চতুর্দশীর অন্ধকারের বুকে—

কে কাঁদে অন্তরে মোর,
অন্তরে কে কাঁদে মোর
অতিমাত্র একা?

শ্রাবণের কৃষ্ণা চতুর্দশীর বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

বলিনি, আকাশ-কোণে
আলো তার দিন গোণে,
হাসে অন্ধকার,
অর্থহীন কলরোলে
উত্তাল প্লাবন দোলে
এপার ওপার,—
শ্যেনপক্ষ সারি সারি
মুহূর্তেরা দেয় পাড়ি
সন্ত্রাস অন্তরে;

এই সমস্তের কারণ কবি নিজেই ঠিক পরের পংক্তিত্রয়ের মধ্যে বলিয়া দিয়াছেন,—

ওগো বন্ধু, মাঝে তা'র
কেঁদে কেঁদে কে আমার
শ্রাবণ সন্তরে?

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, যৌবন-জরা এবং মধ্যবিত্ত জীবনের অস্বাচ্ছল্য কবির রুক্ষ মনোধর্মের পরিপোষকতা করিলেও ইহাই কবির 'অন্তর্যামী'কে সম্পূর্ণ গড়িয়া তোলে নাই। কবি বলিয়াছেন, আকৈশোর ইহা তাঁহাকে ভূতের মতন পাইয়া বসিয়াছিল। এই কথাটির মধ্যে একটি গভীর ইঙ্গিত আছে। যাহা কবির মৌহূর্তিক সচেতন সত্তার পিছনে একটা বৃহত্তর সত্তা রূপে ভূতের মতন কবিকে পাইয়া বসে তাহাই ত যথার্থ কবির 'অন্তর্যামী'। কবির এই 'অন্তর্যামী'কে কবির অজ্ঞাতে তাঁহার ভিতরে ভিতরে গড়িয়া তোলে কে? ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একদল বলিবেন, কবির এই 'অন্তর্যামী'কে গড়িয়া তোলে কবির সমাজ-সত্তা। সমাজ-সত্তা কবির ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইবার ফলে সমাজ-চেতনাই কবির ব্যক্তি-চেতনার নিয়ামক হইয়া ওঠে। এক অর্থে তাই কবির ব্যক্তি-ধর্ম কবির যুগধর্মেরই ঘনীভূত প্রকাশ। এই মত সর্বাংশে গ্রহণীয় কি না এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে, এবং বর্তমান প্রসঙ্গে সে তর্কের মীমাংসা আমাদের অবশ্যকর্তব্য নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে এই মতটি সর্বাংশে গ্রহণীয় না হইলেও একটি প্রধান অংশে গ্রহণীয়—কবির সহজাত ব্যক্তিধর্মের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়াও। তাই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের আবর্তন এবং সেই আবর্তন-প্রসূত যুগধর্ম কবিধর্মকে এক্ষেত্রে কতটা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করিয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা কিছু পূর্বেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, যতীন্দ্রনাথ 'কুমার-সম্ভবে'র ভাবানুবাদের ভূমিকায়

কবি হিসাবে নিজের চিত্তধর্মকে যুগধর্মের সহিত অভিন্ন করিয়াই দেখিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের যুগটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার কবিকর্ম ও কবিধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাধিত-মনের প্রতিক্রিয়ামাত্র নহে, শুধুমাত্র পারিবারিক দুঃখ-অস্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারাও গঠিত নয়; তাহার সম্ভাবনা ছিল বৃহত্তর যুগধর্মের সহিত যোগে।

॥ ১৫ ॥

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রোত্তর যুগ বলিয়া যে একটি যুগের কথা উঠিয়াছে, কোনও কোনও মহলে কথাটি যেমন বহুভাষিত—কোনও কোনও মহলে কথাটি তেমন বহু-নিন্দিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও রসিকতাচ্ছলে ইহাকে 'রবীন্দ্রধুত্তর' যুগ বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। অবশ্য 'রবীন্দ্রোত্তর' কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিলে একটু মুশকিলে পড়িতে হয়, কারণ আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের যে অংশটি রবীন্দ্রোত্তর বলিয়া অভিহিত তাহার সবটাই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের রচনা নয়,—অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই লিখিত। রবীন্দ্রোত্তর কথাটিকে তাই কালবাচক রূপে ব্যবহার না করিয়া গুণবাচক রূপে ব্যবহার করা উচিত। আমার মতে রবীন্দ্রোত্তর কথাটির সংজ্ঞা হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথের যাহা জীবনদর্শন এবং সেই জীবন-দর্শন হইতে উদ্ভূত যে তাঁহার শিল্পাদর্শ এবং শিল্পের রূপায়ণ-

পদ্ধতি তাহা হইতে পৃথক্ জীবনাদর্শ, শিল্পাদর্শ এবং শিল্প-রূপায়ণ-পদ্ধতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যে সাহিত্য তাহাকেই অভিহিত করা যাইতে পারে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য বলিয়া—সে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই গড়িয়া উঠুক —অথবা রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের পরেই গড়িয়া উঠুক।

'রবীন্দ্রোত্তর'-যুগাভিধানের দাবীর গ্রাহ্যত্ব-অগ্রাহ্যত্বের বিচারে তাই প্রথম প্রশ্নই উঠিবে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, শিল্পাদর্শ এবং শিল্পনির্মিতি হইতে স্পষ্টভাবে পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লইবার মতন নূতন জীবনাদর্শ, শিল্পাদর্শ এবং শিল্প-নির্মিতি বাঙলা-সাহিত্যে পাওয়া যায় কিনা। প্রশ্নটা আদৌ ওঠে এই জন্য যে, বাঙলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এতই বিরাট—এবং সেই বিরাটত্বের মহিমা তিনি শেষ দিন পর্যন্ত এমনভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন যে, সেই এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে আর সব যেন ঢাকা পড়িয়া যায়। এককভাবে কাহাকেই যেন তাই আর রবীন্দ্রোত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে উৎসাহী হই না। কিন্তু এককভাবে না হোক, যৌথভাবে যদি আমরা বিচার করি তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশা হইতেই বাঙলা-সাহিত্যে আমরা আদর্শগত এবং শিল্পায়নগত নূতন ধর্ম—অন্ততঃ নূতন প্রবণতা অনেক লক্ষ্য করিতে পারি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', তারাশঙ্করের 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রভৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে',

'শেষের কবিতা'র প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য নাই—একথা স্বীকার করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, আর শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি'র গল্প, তারাশঙ্করের 'বেদেনী'র গল্প, বিভূতিভূষণের 'মৌরীফুলে'র গল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুতুল ও প্রতিমা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' প্রভৃতি আকৃতিতে প্রকৃতিতে এক, একথা বলা সঙ্গত হইবে না। তেমনই কবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজি নজরুল ইস্‌লাম এবং তাহার পরবর্তী জীবনানন্দ—প্রেমেন্দ্র মিত্র—বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির কবিতা যে আকৃতি-প্রকৃতিতে এক, একথা স্বীকার্য নয়।

বাঙলা কবিতায় দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং প্রকাশভঙ্গিতে প্রথম লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয় যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং কাজি নজরুল ইস্‌লামের কবিতার ভিতরে; এই জন্য বাঙলা কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর যুগের আরম্ভ এই তিনজন কবির কবিতায়। সাহিত্যের ইতিহাসে এই পরিবর্তন বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গেই যুক্ত। সমাজ-জীবনের বিবর্তনে সমাজ-জীবনের মধ্যে এই পরিবর্তন কিভাবে সঙ্ঘটিত হয়, এই প্রসঙ্গে কথাটি একটু ভাবিয়া দেখিবার মত।

অবশ্য ইতিহাস সম্বন্ধে একটা কথা আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। ইতিহাসের যুগ-বিভাগের মধ্যে কোন সময়ই কোনও স্পষ্ট সীমারেখা থাকে না। একটা ধারা কোনও কাল-রেখা হইতে যাত্রা সুরু করিয়া অপর কোনও

স্পষ্ট কাল-রেখায় আসিয়া সহসা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না, বা গতিবেগকে আকস্মিকভাবে সংহত করিয়া লয় না। একটা ধারার মধ্যেই থাকে ভবিষ্যৎ প্রবণতার নানা সম্ভাবনা—সেই সম্ভাবনাই ক্রমবিকাশের দ্বারা ঘটায় ধর্মান্তর। 'রবীন্দ্রোত্তর' শব্দের তাৎপর্যও এই নব-প্রবণতা।

সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় এই বিবর্তন কখনই একটা একটানা স্রোতে ঘটে না। উপরি স্তরে একটা বড় স্রোত দৃশ্যমান থাকে—কিন্তু নিম্নে পরতে পরতে ফাটলে ফাটলে প্রবাহিত হয় বিবিধ বিরোধী শক্তির পরস্পর-বিরোধী ধারা। নিম্নে প্রবাহিত এই ধারাগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াই উপরস্থ মুখ্যধারাটির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে নিরন্তর শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকে। কোথায়ও এই বিরোধী ধারাগুলি ক্রমনিয়ন্ত্রণের দ্বারা আস্তে আস্তে উপরস্থ মুখ্যধারাটিকেই একটু একটু করিয়া পরিবর্তিত করিয়া ফেলে এবং সেই ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই আসে সমাজ-জীবনের ক্রমাগ্রগতি। অন্যত্র দেখা যায়, উপরস্থ বড় ধারাটি হয়ত সমাজ-জীবনের মূল উৎস হইতে আর প্রাণশক্তি পাইতেছে না—সে ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে—ওদিকে সমাজ-জীবনের প্রাণবেগ লোকচক্ষুর অন্তরালেই নিম্নস্থ কোনও বিরোধী ধারার সহিত মিশিয়া গিয়া তাহাকে ক্রমবর্ধিত এবং দুর্জয়বেগে ক্রমবর্ধমান করিয়া তুলিতেছে। ভূগর্ভস্থ সেই বেগ সহসা এক প্রবল বিস্ফোরণে সকল বাধাকে ভাঙিয়া চুরিয়া উপরে জাগিয়া উঠিয়া উপরস্থ মুখ্যধারাটির স্থান দখল করিয়া লয়।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিংশ শতাব্দীর সমাজ-জীবনের প্রধান প্রতিভূ ছিলেন; কিন্তু তিনি যে জীবনধারার প্রতিভূ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর বিশের কোঠায় পৌঁছিবার অনেক পূর্বেই সেই সমাজ-জীবনের ভিতরে ভিতরে স্তরে স্তরে বহু বিরোধী স্রোত দেখা দিয়াছিল। সমাজ-জীবনের উপরি-ভাগের নীচে নীচে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক বড় বড় চিড় ধরিতেছিল—এবং সেই চিড়ের মধ্য দিয়া অনেক বিরোধী স্রোত শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। সেই একটি প্রকাণ্ড বিরোধী স্রোতেরই তির্যক্ গতি এবং নিরন্তর বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-গর্জন প্রকাশ লাভ করিয়াছে যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কবিতার মধ্যে। আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভাব-ভাবনা-ভাষার মধ্যে আমরা পাই যে বিরোধী সুর তাহা পরবর্তী কালে ক্রম-সম্প্রসারিত হইয়াছে বিভিন্ন খাতে—এবং উপরন্তু মুখ্য সাহিত্য-ধারার ভিতরেও তাহা আনিয়াছে ক্রম-পরিবর্তন। রবীন্দ্রযুগের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ফাটলের মধ্য দিয়াই এইভাবে দেখা দিল নূতন জীবনাদর্শ এবং ভাবাদর্শ—এই খানেই 'রবীন্দ্রোত্তর' যুগের গোড়াপত্তন।

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতকের মধ্য-ভাগ পর্যন্ত বাঙলা-সাহিত্যের মূল ধারা আবর্তিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে অবলম্বন করিয়া। রবীন্দ্রনাথের যাহা কবিধর্ম তাহাই মুখ্যতঃ এ যুগের সাহিত্যধর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল প্রভৃতির কাব্যকাল আরম্ভ মোটামুটি-

ভাবে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আরও অনেক কবি ছিলেন; ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে কিছু কিছু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এবং কিছু কিছু রবীন্দ্রবিরোধিতা সত্ত্বেও যুগটি মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রযুগই রহিয়া গিয়াছে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিহারীলাল বিশ্বসৌন্দর্যের রহস্যে মশগুল ভাবালুতা-প্রধান যে কাব্যধারার সৃষ্টি করিলেন রবীন্দ্রনাথে তাহার পরিস্ফুর্তি ও পরিণতি। বিহারীলালের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'সারদা-মঙ্গল' ১৮৮০ সনের কাছাকাছি রচিত, 'সাধের আসন' তাহারই কিছু পরে। এই সময়কার অন্য প্রসিদ্ধ কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্য মুখ্যতঃ ভাবালু চিত্তের ছন্দোবন্দনায় নারীস্তুতি। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' (১৮৭২-৭৩) নামেই বুঝাইয়া দেয় —ইহা কল্পনায় স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ। কয়েক বৎসরের পরবর্তী কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রেমের রোম্যান্টিক কবি—রবীন্দ্রধর্মের সহিত সেই কবিধর্ম সহজেই মিশিয়া গিয়াছে। স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের (১৮৫৫-১৯১৮) অবশ্য একটা স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হয়; তিনি প্রেমের ক্ষেত্রে মনের সহিত দেহকেও যুক্ত করিয়াছিলেন,—প্রকৃতি-বর্ণনায়ও স্থানে স্থানে নিজের চোখে বিশেষ করিয়া দেখিবার এবং সেই দেখাকে অবলম্বনে নিজস্ব অনুভূতির আভাস দিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় সমাজ-জীবনে বৈষম্য ও তজ্জনিত শ্রেণীবিশেষের যে দুঃখ-লাঞ্ছনা তাহার বিরুদ্ধেও একটা প্রথম বিদ্রোহের সুর

দেখা যায়। অক্ষয়কুমার বড়ালের (১৮৬৫-১৯১৮) কবিত্বে দীক্ষা বিহারীলালের নিকট হইতে—কিন্তু কাব্য-সাধনায় রবীন্দ্রপ্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। মহিলা কবি কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩৩) কবিতার মধ্যে মানবীয় সহানুভূতির স্পর্শটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল—কিন্তু একের প্রেমে সর্বপ্রেমতৃষাকে সার্থক করিয়া তুলিবার পরম লক্ষ্য হইতেই তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন জীবনের রসদ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের বিরোধী ছিলেন—তাঁহার বিদ্রূপ সমালোচনার মধ্যে তাহার প্রমাণ-পরিচয় রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু কিছু কবিতার সুরেও একটা নূতন কাব্যাদর্শের আভাস আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার স্বদেশপ্রেমের কবিতা এবং হাসির কবিতার মধ্য দিয়া তিনি কোনও গভীর কবিধর্মের নূতন আদর্শ বাঙালীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

যতীন্দ্রনাথের ঠিক অব্যবহিত পূর্বের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায় প্রভৃতি। যতীন্দ্রনাথের কবিতার আরম্ভ ১৩১৭ সালে,—১৩১৭ সালেই প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র, 'শান্তি-নিকেতন' সিরিজের লেখাগুলির, 'গোরা' উপন্যাস ও 'রাজা' নাটকের। যতীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'মরীচিকা'র কবিতাগুলি লিখিত হইবার যুগটা ছিল রবীন্দ্রনাথের

'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতির যুগ, এই তথ্যটি ইতিহাসের দিক্ হইতে বিশেষ স্মরণীয়।'

যতীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হইবার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের প্রায় সব কবিতার বই-ই প্রকাশিত হইয়াছে। এ যুগে বাঙালী কবিগণের উপরে সর্বাতিশয়ী প্রভাব হইল রবীন্দ্রনাথের—তারপরে সত্যেন্দ্রনাথের। ভাবের দিক হইতে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রধর্মের অনুসারী—সুতরাং সেক্ষেত্রে আর তাঁহার প্রভাব তাঁহার অনুজ কবিগণের উপরে পড়িবার কথা নহে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এবং বহুক্ষেত্রে ছন্দোবৈচিত্র্যজনিত একটি চমৎকৃতি অল্লাধিক বহুকবির উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ ভাবে রবীন্দ্রধর্মী হইলেও তাঁহার দুই একটি কবিতার মধ্যে যেন যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-ধ্বনি শুনিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা সত্যেন্দ্রনাথের 'আফিমের ফুল' কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি।—

আমি বিপদের রক্ত নিশান
আমি বিষ-বুদ্‌বুদ্,
আমি মাতালের রক্ত চক্ষু,
ধ্বংসের আমি দূত।
আমার পিছনে মৃত্যু-জড়িমা
আফিমের মত কালো,
বিধির বিধানে যেথা সেথা তবু
সুখে থাকি, থাকি ভালো!

কমল গোলাপ যতনের ধন
অল্পে মরিয়া যায়,
আমি টিকে থাকি মেলি রাঙা আঁখি
হেলায় কি শ্রদ্ধায়।
... ...
গোলাপ কিসের গৌরব করে ?
আমার কাছে সে ফিকে ;
আমি যে রসের করেছি আধান
জীবন তাহে না টিকে !

যে ফুল 'বিপদের রক্তনিশান', যে ফুল 'বিষ-বুদ্‌বুদ্', যে ফুল 'মাতালের রক্তচক্ষু'—'ধ্বংসের দূত'—যে ফুলের সংগৃহীত রসে জীবন টিকে না—সেই ফুলের প্রতি এমন সাগ্রহ দৃষ্টি বাঙালা-সাহিত্যের একটা ধর্মান্তরেরই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। আর, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এই কবিতার সুরের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কবিতার সুরের কি অন্তরঙ্গ মিল। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, ফুলের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ চাঁপা ফুলের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন,—কারণ রৌদ্রপায়ী চম্পকের সঙ্গে রুদ্রপন্থী কবির হৃদয়ের সহজ যোগ। কবি সত্যেন্দ্রনাথেরও 'চম্পা' সম্বন্ধে যে একটি কবিতা রহিয়াছে তাহার মধ্যেও 'চম্পক-ধর্মে'র সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা যতীন্দ্রনাথের 'সায়ম্' কাব্যের 'পারুলের আহ্বান' কবিতায় লক্ষ্য করিয়াছি, বসন্তের শেষে যেদিন 'জ্বলে গেল চূতকলি ঝরে গেল কিংশুক', রাঙা পায়ে অশোকগু চলিয়া গেল,

তখন তাহারা যাইবার আগে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছিল, 'চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!' ফাল্গুনের দিন গাঁথিতেছিল,—কিন্তু সেদিন গত হইয়া যেদিন নিদাঘ জ্বলিয়া উঠিল—নৈদাঘ সূর্য যখন রৌদ্রক তূর্য বাজাইয়া দিল, তখন ডাক পড়িয়াছিল—'কে রাখে ফুলের মান?' পাতার ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া কে ভাস্করকে প্রণাম করিবে—নির্নিমিখে কে সেই রুদ্রের মুখে চাহিবে, অনল-রাশি পান করিয়া কে তরল হাসি হাসিবে? তখনই ডাক পড়িয়াছিল—'চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!' সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতারও

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে;
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ-ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।

যতীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখি—

শূন্য কাননে কেঁদে ফিরে অনুকম্পা,
জাগো ভাই বনে বনে বনানীর চম্পা!
... ...
দিকে দিকে সাত দ্বীপ কাঁদে সাত সাগরে,
গরবিনী পারুলের সাত ভাই জাগো রে!

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়ও দেখি,—

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্মরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর;

জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জর।
তবু এনু বাহিরিয়া, বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিব না মরি';
উগ্রমত্ত সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি';
মূর্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব!
সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি';
দিনদেবে নমস্কার! আমি চম্পা! সূর্যেরি সৌরভ।

এই প্রসঙ্গে আমরা কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'আকন্দ' ফুল বিষয়ে কবিতাটিও স্মরণ করিতে পারি।—

স্ফটিকের মত শুভ্র ছিলাম আদিম পুষ্পবনে,
নীল হ'য়ে গেছি নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-আলিঙ্গনে।
বিষাদের বিষ ভখিয়া পেয়েছি গরলের নীলরুচি,
স্থাণুর ধেয়ানে পেলব এ তনু হয়েছে পাথরকুচি।
রুদ্র নিদাঘে খর বৈশাখে রুদ্রেরি পূজা করি,
আধ-নিমীলিত পাপড়ি আমার ঢুলু ঢুলু আঁখি স্মরি'।
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ ঘিরিয়া সর্পের আনাগোনা,
আমি তারি সনে আছি একাসনে পেয়েছি প্রসাদকণা।

'দেবী শবাসনা'র পূজার জন্য ধরণীর বুকে যে 'জবা' ফুল ঝরে ওঠে তাহার বর্ণনায় দেখি-

এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া উজলি পুষ্পসভা.
ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ডটি আমি যে রক্তজবা।

এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা এই যে, স্নিগ্ধতা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রতীক ফুল সম্বন্ধে কবিতা লিখিতে গিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ এই জাতীয় একটি দৃষ্টি গ্রহণ করিলেন; অন্য কোনও প্রসঙ্গকে অবলম্বন করিয়া এই-জাতীয় দৃষ্টি গ্রহণ করিলে তাহা আমাদিগকে এমন স্পষ্ট ভাবে সচকিত করিয়া দিত না। ইহার পূর্বে বাঙলা কবিতায় ফুলকে অবলম্বন করিয়া এই-জাতীয় মনোভাবের প্রকাশ আর কোথাও দেখি নাই—সেই জন্যই আমাদের কবিতার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে ইহাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, সুন্দরের পূজার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র-রুদ্রাণীর পূজাও এইখান হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; ঐতিহাসিক নিয়মে সেইটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত।

সত্যেন্দ্রনাথ মোটামুটি ভাবে বিশ্বাসী কবি—বিশ্বাস তাঁহার সুন্দরে—বিশ্বাস তাঁহার মঙ্গলময় চৈতন্য-শক্তিতে। কিন্তু এই বিশ্বাসের ভিতরে আত্ম-সচেতন এবং সমাজ-সচেতন কবির ভিতরে দেখা দিয়াছে যেখানে সত্যকারের জিজ্ঞাসা সেখানে তাঁহাকে আমরা এক নবযুগের 'সাম্য-সাম' গাহিতে শুনি। সেদিন তিনি নিজেই বিশ্বজনকে ডাকিয়া নূতন পৃথিবীতে এক নববিধানের 'বারতা' শুনাইয়াছেন,—'বারতা এসেছে প্রভাত পবনে—প্রসন্ন দশ দিক্।' নবপ্রভাতের

এই নূতন 'বারতা' আসিয়াছে বিশেষ করিয়া কাহাদের জন্য ?

কে আছ আজিকে অবনত মুখে পীড়িত অত্যাচারে ?
কে আছ ক্ষুণ্ণ, কেবা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে ?
যুগ যুগ ধরি' কি করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা ?
পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, দহিতে কারণ বিনা !

সেই ষণ্মাত্রিক ছন্দে সার্ধত্রয় পর্বের একটানা ছন্দে শোষিত এবং নিপীড়িত মানুষকে ডাক—এই একটানা ছন্দের বাহনেই দেখা দিয়াছিল যতীন্দ্রনাথেরও বিদ্রোহ—সর্বপ্রকার শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে ! সত্যেন্দ্রনাথের এই 'সাম্য-সামে'র মধ্যে মানুষের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জাগিয়াছে কাহাদের জন্য ? এক জাগিয়াছে শ্রমিক-শ্রেণীর জন্য, আর জাগিয়াছে কৃষক-শ্রেণীর জন্য।—

খনির তিমিরে কা'রা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি কাণ,
অনেক নিম্নে পড়ি' আছে যারা শোন তাহাদেরো গান !
দূর সাগরের হল্‌হলা সম উঠিছে তা'দের বাণী,
বহু সন্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি ;
অশ্রু হারায়ে রক্ত-নয়ন জ্বলিছে আগুন হেন,
পঙ্কিল ভাষা, স্বল্প বচন ;—নাহি সে মানুষ যেন !

অন্যদিকে আবার—

যারা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল ফল,
তারা আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া ফেলিবারে শ্রমজল ;

তারা আছে শুধু কথায় কথায় হইতে যোত্রহীন,
'দেড়া ডুনো' দিয়ে বর্ষে বর্ষে কেবল বহিতে ঋণ ;
সমুখে করাল রয়েছে 'আকাল', মৃত্যু রয়েছে পিছে,
ঘিরি' চারিধার আছে হাহাকার, পালাবার আশা মিছে।

সত্যেন্দ্রনাথ এমনই করিয়া যে ছন্দে সাম্যের গান গাহিলেন, যতীন্দ্রনাথ যে ছন্দে একহাতে শোষণ ও অন্যহাতে তোষণের ভণ্ডামিকে বিদ্রূপের শরবর্ষণে নির্মম আঘাত করিলেন, কিছু পরে কাজি নজরুল ইস্‌লাম সেই একই সুরে একই ছন্দে সাম্যের গান গাহিয়াছেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, এই যুগে বাঙলা কবিতায় এই যে শ্রেণী-বিরোধী সাম্যের সুর ইহা কোনও উগ্র রাজনৈতিক চেতনা বা তর্কতাপিত 'বাদ'-প্রসূত নয় ; এ সুর দেখা দিয়াছিল একটা ব্যাপক সমাজ-চেতনার অন্তস্তল হইতে। নূতন সমাজ-বিবর্তনের প্রবাহে জাত এই চেতনার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বড় কথা ছিল—'মুক্ত রাখ গো মনের দুয়ার, মানুষ এসেছে কাছে' (সাম্য, সত্যেন্দ্রনাথ)। মানবতার প্রতি এই অন্যবিরহিত শ্রদ্ধা-প্রীতির সহচারী রূপেই কবি সত্যেন্দ্রনাথের মনের মধ্যেও উঁকি মারিয়াছে সংশয় ও অবিশ্বাস।—

কে জানে, কেমন পরলোক, যাহে আকাশ রয়েছে ঢাকি'!
মূক মরি' সেথা পায় কি গো বাণী, অন্ধ কি পায় আঁখি ?

... ...

পুণ্যের ক্ষয়ে এই লোকালয়ে জন্ম কি হয় আর ?
কিবা সে পুণ্য ? কিবা সে পাতক ? মূল কোথা ছিল কার ?

সৃষ্টির সাথে কে সৃজিল মায়া ? কে দিল বৃত্তি যত ?
কে করিল হায় মনু-সন্তানে স্বার্থ সাধনে রত ?
তিমিরের পর তিমিরের স্তর, দৃষ্টি নাহিক চলে,
মৃত্যু সে কথা গুপ্ত রেখেছে, জীবিতে কভু না বলে ;—

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে যে সংশয়ের ক্ষণিক আলোড়ন, যতীন্দ্রনাথে তাহাই দেখা দিল চিত্তের স্থায়িভাব রূপে। সত্যেন্দ্রনাথে শুধু সংশয়াচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা—যতীন্দ্রনাথে তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা নাস্তিত্বের দৃঢ় সিদ্ধান্ত। এই নাস্তিত্বের দিকে ঝোঁক সত্যেন্দ্রনাথের মনের মধ্যেও যে একেবারে আসে নাই তাহা নয়। তাঁহার কবিতাও দেখি—

রথের মাঝারে জন্ম মরণ, চিনে জীব শুধু রথ,
সমুখে পিছনে শুধু বিস্তার—সীমাহীন ছায়াপথ!
কলরব করি যাত্রা চলেছে, গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে,
মৌন আকাশে শব্দ পশে না, বায়ু স্রোতে যায় ভেসে;
প্রার্থনা ভেসে কূলে ফিরে এসে ব্যথিয়া তুলে গো মন,
মানুষ আবার মানুষে আঁকড়ি' প্রাণে পায় সান্ত্বন!

তাহাই যদি সত্য হয় তবে মানুষ ছাড়িয়া উর্ধ্বের দিকে চাহিয়া সর্বদা মাথা নত করিয়া থাকিয়া লাভ কি? কবি বলিতেছেন—

জাগ' জাগ' ওগো বিশ্বমানব! বারতা এসেছে আজ!
তোমার বিশাল বপু হতে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ;

মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তার ঘর ;—

এই কথারই রকম-ফের দেখিলাম আরও দৃঢ়কণ্ঠে যতীন্দ্রনাথের কবিতায়—

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য—দেবতা আছে কি নাই !

সত্যেন্দ্রনাথের 'জতির পাঁতি', 'শূদ্র', 'মেথর' প্রভৃতি কবিতাও এখানে স্মরণীয়। বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিয়া তিনি যে লিখিয়াছিলেন,

সৃজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন মহী ছায়।

এবং—

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়—

কবির মানবতা-বোধের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই পংক্তিগুলিও স্মর্তব্য।

॥ ১৬ ॥

যতীন্দ্রনাথের ঠিক সমসাময়িক কবি মোহিতলাল মজুমদার। যতীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা-বইয়ের কবিতাগুলি লিখিত ১৩১৭ হইতে ১৩২৯ সালের মধ্যে, পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৩৩০ সালে। মোহিতলালের প্রথম কবিতার বই 'স্বপন-পসারী'র প্রকাশ

১৩২৮ সাল—কবিতাগুলি লেখা তাহার পূর্ববর্তী দশ বৎসরের মধ্যে। সুতরাং উভয় কবিরই কবিতার ক্ষেত্রে আবির্ভাব প্রায় একই সন-তারিখে, আর কবিধর্মের ভিতরেও কতক অংশে রহিয়াছে আশ্চর্য মিল। প্রথমেই কাব্যাদর্শের কথা ধরা যাইতে পারে। কাব্যাদর্শে মোহিতলালও ওজোগুণের সাধক—আদর্শে এবং নির্মিতিতে তিনি এই ওজোগুণকে বরাবরই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার কাব্যাদর্শ তাঁহার নিজের কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার 'স্মর-গরলে'র 'পয়ার' কবিতায়।—

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা, ছন্দ-বিলাসিনী !
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরুধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী ?
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রাবিনাশিনী,
উদার উদাত্তগীতি গাও বসি' হৃদ্-পদ্মাসনে—
যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম-নিবাসিনী।

মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথের অনুরূপভাবে বহ্নি-পূজারী না হইলেও আমরা কবির 'বিস্মরণী'র 'অগ্নি বৈশ্বানর' কবিতাটি স্মরণ করিতে পারি। আবার মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবে রুদ্র-সাধক না হইলেও তিনিও 'রুদ্র-বোধন' করিয়াছেন—

জাগো মহাকাল ! রুদ্র দেবতা ! বর্ণ-বিহীন বিভূতিময় !
দাও খুলে তব গ্রন্থিল জটা, ব্যোমকেশ ! কর সৃষ্টি লয় !

ফেটে যাক্ নীল নভোবুদ্বুদ—রঙের হাট।
মেদিনীর এই বেদী ভেঙে যাক্—রূপের ঠাট!
সুন্দরে হানো সত্যের শূল, টুটাও স্বপন হে নির্দয়!
নিত্য মরণ হরিয়া দাও গো নিত্য-জীবন শূন্যময়। (স্মর-গরল)

মোহিতলালের এই 'রুদ্র-বোধন' দেখিলে মনে হয়, তিনিও রুদ্রগোত্রীয় বটেন। মোহিতলালের প্রথম কবিতা 'স্বপন-পসারী'র নাদির শাহ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটির সঙ্গে কবির রুদ্রগোত্রীয়ত্বের যোগ আছে বলিয়া মনে হয়। আসলে এই রুদ্রপন্থা বীর্যের পন্থা, মানুষের পৌরুষকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা। তাই 'নাদির শাহের জাগরণে' দেখি—

কত বড় আমি—একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই,
অধীর হয়েছে বক্ষকারায় শুধু সেই কামনাই!

আমিকে এমনই বড় করিয়া দেখিতে হইলে বুঝিয়া লইতে হয়—

বুল্‌বুল্ আর বস্‌রার গুল্ নয় শুধু আল্লার—
বজ্র-বাজনা মরু-মরীচিকা আরো যে চমৎকার!
শুধু মিট্‌মিটে তারার লাগিয়া আকাশের শামিয়ানা!
ধূমকেতু আর উল্কার দলে পাতে নি সেথায় থানা?
শিশুর অধরে মার পয়োধরে মিলায় খেলার ছলে,
তেমনি খেলার খেয়ালে ছড়ায় মারী-বিষ থলে জলে!
বাহবা কি বাহবা রে।
আল্লার মত দিলাওয়ার যেই এ খেলা খেলিতে পারে।

কিন্তু এই রুদ্রগোত্রীয় কবি আসলে ছিলেন শৈব-তান্ত্রিক, তাহারই ফলে দেখা দিয়াছিল তাঁহার আসবমত্ততা, 'জীবন-

সুরা'র প্রতিই কেন্দ্রীভূত তাঁহার দুর্বার প্রবৃত্তি। এই 'জীবন-সুরা' পানে কবি ছিলেন একান্ত 'অঘোরপন্থী।'—

কাচের পেয়ালা ভেঙ্গে ফেল্ তোরা, লওরে অধরে তুলি'
—শ্মশানের মাটি লাগিয়াছে যা'য়—মড়ার মাথার খুলি।
ভাবে বুঁদ হয়ে বুদ্‌বুদে ভরা
বাসনার রঙে রাঙা-রঙ্-করা
নাঁর নাহি যা'য়—বক্কির প্রায় সুরায় পড় গো ঢুলি';
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, লও মরার মাথার খুলি—
চুমুকে চুমুক দাও বার বার
পড় গো সবাই ঢুলি'।

(অঘোরপন্থী, স্বপন-পসারী)

উভয় কবিই শিব-গোত্রীয় হইলেও এইখানে মোহিতলালে এবং যতীন্দ্রনাথে একটা মৌলিক তফাৎ; মোহিতলাল জীবন-রসের মাতাল ছিলেন—অপর জন জীবন হইতে সৌন্দর্য মাধুর্যের নির্যাসকে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলিবার বেতাল হইয়া উঠিয়াছিলেন। জীবনের ঊর্ধ্বে বা অন্তঃস্থলে কোনও চেতন সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথের ন্যায় অবিশ্বাসী না থাকিলেও—সে বিষয়ে তিনি উদাসীন অথবা বিমুখ। সে সমস্ত দিক্ হইতে কবি চিত্তকে সংহরণ করিতেন বটে, কিন্তু চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করিতেন রূপরসময় জীবনের দিকে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ জীবনের চারিদিকে কল্পিত 'অদৃষ্টে'র লীলা এবং তাঁহার রূপ-রস-বিভূতির বিরুদ্ধে প্রথমাবধি এমন মারমুখো হইয়া জীবনের উপরকার কল্পনার কুজ্ঝটিকা-জাল

অপসরণে এত শক্তিক্ষয় করিলেন যে সেই 'অদৃষ্টে'র ছায়া বিমুক্ত উজ্জ্বল জীবনকে আর ভোগ করিবার অবকাশ পান নাই। যতীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতি'কে সর্বদাই মোহিনী অথচ মিথ্যা মায়াবিনী বলিয়াছেন; মিথ্যা মায়াবিনী বলিয়াই তিনি মোহিনীর মায়াস্পর্শ হইতে নিজেকে সর্বদাই বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মোহিতলালের মনোভাব অন্যরূপ। মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথের মনোভাবকে বলিবেন 'সোপেন-হায়ারী' মনোভাব; এই দার্শনিক সন্ন্যাসী সোপেনহায়ারের উদ্দেশেই তিনি 'পান্থ' নামে যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতেই তিনি লিখিয়াছেন-

সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী!
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা!
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ব লাবণী!
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ?—কে করে শোচনা!
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচুকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা।
(বিস্মরণী)

যতীন্দ্রনাথের ন্যায় মোহিতলালের মনের মধ্যেও এক 'বিদ্রোহী শয়তান' ছিল, বিধাতা দুঃখের চাবুক মারিয়া সেই শয়তানকে কখনও পোষ মানাইতে পারেন নাই। যতীন্দ্র-

নাথের ন্যায় মোহিতলালও একই সুরে একই ছন্দে বলিয়াছেন,—

এত যে দুঃখ দিলে তুমি মোরে—করি নি তোমার নাম,
উল্কার মত জ্বলিল অক্ষি, তবু নাহি কাঁদিলাম!
কে চিনে তোমারে? কিসের করুণা?—বলি নাই, 'দয়া কর',
তব রোষ-ভয়ে করি নাই কভু নাম-জপ অবিরাম।

... ...

আঁধারের 'পরে আঁধার নেমেছে, অতল গহ্বরতলে
নামিয়াছি আমি, ক্ষীণ জানু মোর যতদূর টেনে চলে!
পদযোড়ে শেষে গড়ায়েছি, তবু করি নাই, করযোড়,—
ভ্রূকুটি তোমার করে নাই বশ—লোকে 'নাস্তিক' বলে!
(পরাজয়, স্বপন-পসারী)

কিন্তু তথাপি উভয় কবির মনোধর্মে একটু তফাৎ ছিল,—সে তফাৎ প্রকাশ পাইয়াছে কবিতাটির শেষ স্তবকে—

তাই ভাবি, একি! আজ একি হ'ল—নিমেষে করিলে জয়!
একটু হরষ-পরশ মাত্রে রোমাঞ্চ সমুদয়।
ব্যথা বেদনায় করি নাই সাথী, মানি নাই প্রয়োজন—
সুখ সঁপিবারে আজি এ পরাণ তোমার শরণ লয়! (ঐ)

মনোধর্মে যতীন্দ্রনাথের সহিত মোহিতলালের গভীর মিল মর্ত্ত্য হইতে দেবতা-বিতাড়নের উৎসাহে, দৈবের দাসত্ব-বন্ধন হইতে মনুষ্যত্বের মুক্তি-বিধানে। এই আগ্রহ লইয়াই কবি মোহিতলালের 'কালাপাহাড়'-বন্দনা। কালাপাহাড় দেবতা-বিজয়ী বীর্যবান্ মনুষ্যত্বের জীবন্তবিগ্রহ!

ঘুচাইতে আসে মহাভয়হারী দেবারি-মানব যুগাবতার—
ঘুচাবে কায়ার ছায়া-শৃঙ্খল, চূর্ণ করিবে পাষাণ-ভার!
—কালাপাহাড়!

(কালাপাহাড়, বিস্মরণী)

মানুষের কায়ার পিছনে চিরদিন ধরিয়া দেবতার ছায়া শৃঙ্খলের মতন তাহার দৃপ্ত গতি রুদ্ধ করিয়াছে; সেই ছায়া-শৃঙ্খল ঘুচাইয়া দিবার যুগ আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি মানব পাষাণ দেবতার পদমূলে মাথা লুটাইয়াছে—তাহার ফল হইয়াছে কতটুকু? ফল হইয়াছে শুধু আত্ম-বঞ্চনা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা; সেই যুগান্তের মোহ ভাঙিবার দুন্দুভিই বাজিয়াছে কালাপাহাড়ের বিজয়োল্লাসে।—

কোটি আঁখি-ঝরা অশ্রু-নিঝর ঝরিল চরণ-পাষাণ-মূলে,
ক্ষয় হ'ল শুধু শিলা-চত্বর—অন্ধের আঁখি গেল না খুলে!
জীবের চেতনা জড়ে মিলাইয়া আঁধারিল কত শুক্লনিশা!
রক্তলোলুপ লোল-রসনায় দানিল নিজের অমৃত-তৃষা!
আজ তারি শেষ! মোহ অবসান!—দেবতা-দমন
যুগাবতার আসে ওই! তার বাজে দুন্দুভি—
বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়!
—কালাপাহাড়! (ঐ)

মানুষের কাছে দেবতার এই পরাজয়ের মধ্যে আত্ম-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বীর্যবান মানুষের যে তপ্ত আত্ম-প্রসাদ আছে কালাপাহাড়ের বিজয়োল্লাস তাহারই প্রতীক। মানুষের লাঞ্ছনাকে অবলম্বন করিয়া দেবতা অনেকদিন অট্টহাসি

হাসিয়াছে,—আজ তাহারই প্রতিশোধের দিন সমাগত; দেবতার লাঞ্ছনা আজ তাই সমভাবে মানুষকে অধীর আনন্দে আত্মহারা করিয়াছে।—

নিজহাতে পরি' শিকল দু'পায়, দুর্বল করে যাহারে নতি,
হাত যোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হের তার কি দুর্গতি!
কোথায় পিনাক? ডমরু কোথায়? কোথায় চক্র সুদর্শন?
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দিরবাসী অমরাগণ!
ছাড়ি লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙ্গে যায়! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়! (ঐ)

মানুষের দেহের দেউলের মধ্যেই যে সত্য দেবতা রহিয়াছে তাহাকে এতদিন অপমান করিয়া মানুষ বাহিরে দেবতা খুঁজিয়া বাহিরের দাস হইয়া পড়িয়াছিল। আজ মানুষের সেই অপমানভার ঘুচাইবার দিন।—

দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্বিষহ!
অন্তরে হ'ল বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ।
স্তম্ভিত হৃদ্‌পিণ্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ গ্লানি মানবসিংহ যুগাবতার
—কালাপাহাড়! (ঐ)

এই বীর্যবান্ মনুষ্যত্বের আদর্শ একটা অগ্নিতাপের মতন কবির দেহমনকে প্রতপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া মৃত্যুকে কবি কবিপ্রথানুযায়ী 'বঁধু' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারেন

নাই, ধর্মের আবরণেও তাহার সত্য বিকট রূপকে ঢাকিয়া রাখিতে চান নাই, দেখিতে চাহিয়াছেন—

রক্তনয়ন, বিকট বদন, হাসিতে রক্ত ঝরে,
নিশ্বাসে বাক্ হরে! (মৃত্যু, স্বপন-পসারী)

জীবনের চারিদিকে এই যে বিভীষিকা—এই যে মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বা—এই যে ভীষণ অন্ধকার এবং রুদ্ধনিঃশ্বাসে হাহাকার—ইহার ভিতরে মানুষের করণীয় কি? কবির মতে—

ধর্মের ধ্বজা রেখে দাও দূরে—
মন্ত্রে তন্ত্রে প্রাণ নাহি পূরে!
আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে'
বুকে করি' লব সব,
জীবনের হাসি, জীবনের কলরব। (ঐ)

'স্বপন-পসারী'র মধ্যে কবি নিজের 'কামনা' যেখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, সেখানেও দেখি—

আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে—জ্বলুক অসীম রাতি।
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অমৃত ভাতি!
ধরার কুসুম বার বার হাসে, বার বার কেঁদে যায়—
আঁধারে-আলোকে শিশিরে-কিরণে আমি হব তার সাথী।

মোক্ষ-মুক্তির আদর্শকে কবি যতীন্দ্রনাথ একদম 'ভুয়া' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কোথাও তাহাকে মহাঘুম বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। এই মোক্ষ-মুক্তির আদর্শকে কবি মোহিতলালও বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। জীবনের মোহকে ভাঙিয়া মানবচিত্তকে মোক্ষোন্মুখী করিয়া তুলিবার জন্য তাই

পূর্ববর্তী কবিরা 'মোহমুদ্গর' রচনা করিয়াছেন,—মোহিতলাল তাহার জবাবে মোক্ষের মিথ্যা মায়াকে ভাঙিয়া মানুষের মনকে জীবনোন্মুখী করিয়া তুলিবার জন্য রচনা করিয়াছেন 'মোহমুদ্গর' (বিস্মরণী), এবং সেই 'মোহমুদ্গরে'র প্রথম কথাই এই,—

দেহে তোর প্রাণ আছে ?
তবে কেন ওরে ভীরু নিত্য উপবাসী—
চিরমৃত্যু-মোক্ষ-অভিলাষী ?

অন্যত্রও দেখি—

সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা !—
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন !

(পান্থ, ২৭ ; বিস্মরণী)

কবির 'শব-সঙ্গীতে'র (বিস্মরণী) ভিতরেও কবি বলিয়াছেন,—

শিবের চেয়ে শবের শোভা !—
শিব যে হেথায় মূর্ছা গেছে !

যতীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি জড়বাদী রূপে ; তাহারই একটু রকমফেরে মোহিতলালকে পাইতেছি 'দেহবাদী' রূপে। রকমফের বলিলাম এই জন্য, জড়বাদই ত দেহবাদের বনিয়াদ। যতীন্দ্রনাথ চেতনাকে জড়ে মিশাইয়া লইয়াছিলেন, মোহিতলাল চেতনাকে দেহে মিশাইয়া লইয়াছেন।

হায় দেহ!—নাই তুমি ছাড়া কেহ—
জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,
মূরতি-পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমাপানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহাপরিবেশ!—
দেহলীলা অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে! (মৃত্যুশোক, বিস্মরণী)

আমরা কবি যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, তাঁহারও দৈবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিণতি লাভ করিয়াছিল মানবতার প্রতিষ্ঠায়। এই স্বাধীন সুস্থ বীর্যমহিমান্বিত মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁহার আগ্রহ ছিল প্রথমাবধি। আর জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি প্রথম যুগে স্পষ্ট না হইয়া উঠিলেও তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 'সায়ম্' কাল হইতে। আমরা দেখিয়াছি, যতীন্দ্রনাথের এই জীবনাসক্তি ঘনপরিণতি লাভ করিয়াছে প্রেমে এবং সকল সত্য এবং দেবতাকে অস্বীকার করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রেমকেই জীবনের সারসত্য জানিয়া প্রেমকেই তিনি দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক্ষেত্রে মোহিত-লালের কবিধর্মের সহিত যতীন্দ্রনাথের কবিধর্মের গভীর মিল লক্ষিত হইবে। এই প্রেম-পূজারিত্ব হইতেই মোহিতলালের যত রূপতান্ত্রিকতা।

ক্রন্দন--মোর সঙ্গীত সে যে
হাসিতে অশ্রুরাশি !
আমার দেবতা—সুন্দর সে যে !
পূজা নয়, ভালোবাসি !
আঁধারে মন্ত্র ভুলি,
আলোক-তুফানে হৃদয়-জড়িমা টুটে—
সুন্দর লাগি' ভালোবাসা মোর,
অন্তর-আঁখি ফুটে !

(রূপ-তান্ত্রিক, স্বপন-পসারী)

এই প্রেমের মধ্যে রোম্যাণ্টিক্ আমেজ আনিতে যতীন্দ্রনাথ 'বেদিনী' লিখিয়াছেন (সায়ম্). আব মোহিতলাল 'বেদূঈন' (স্বপন-পসারী) লিখিয়াছেন। আমাদের বিচারে এই 'বেদিনী' আর 'বেদূঈনে'র মধ্যে কবি-চিত্তের প্রবণতার দিক হইতে (যতীন্দ্রনাথের নিজেব ভাষায়ই) 'প্রভেদ জানিহ থোড়া'।

মোহিতলালের এই প্রেমপূজার কথা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার 'স্মর-গরল' কবিতাগ্রন্থে। 'স্মর-গরলে'র কবিতাগুলির মূল সুর 'স্মব-গরল' কবিতাটির প্রথম স্তবকের মধ্যেই ব্যঞ্জিত।—

আমি মদনের রচিনু দেউল—দেহের দেহলী 'পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ-ফুল সাজাইনু থরে থরে।
দুয়ারে প্রাণের পূর্ণকুম্ভ

পল্লবে তার অধীর চুম্ব,
রূপের আবীরে স্বস্তিক তায় আঁকিনু যতন-ভরে !

'বুদ্ধ' সম্বন্ধে মোহিতলাল যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতেও দেখি, কবি বুদ্ধদেবের দৈব-নাস্তিত্ববাদ সাগ্রহে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সর্বনাস্তিত্ববাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সেই প্রেম !—জন্ম জন্ম তারি লাগি' ফিরিছে সবাই !
এই দেহ-পাত্র ভরি' যেইদিন উঠিবে উছলি'—
ঘুচিবে দুরূহ দুঃখ, মৃত্যুভয় রবে না যে আর !
বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ ধ্যানে বসি' রবে না সদাই :
সুজাতা আনিবে অন্ন, পূর্ণা-তিথি উঠিবে উজলি'—
'মার' দিবে হাসিমুখে হাতে তুলি' বাঁশীখানি তার।

(বুদ্ধ, স্মর-গরল)

প্রেমের প্রতি এই সর্বাতিশয়ী মূল্য অর্পণের স্বাভাবিক ফলেই মোহিতলাল এবং যতীন্দ্রনাথ উভয়ের কবিতাতেই নারীই দেবীমূর্তি লাভ করিয়া বাসনার রক্তকমলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রোত্তর কবিতার গোড়ার দিকটার নানা প্রবণতা বুঝিয়া লইতে হইলে যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের কিঞ্চিৎ পরবর্তী (প্রথম কবিতা প্রকাশের দিক হইতে) কবি কাজি নজরুল ইস্‌লামের কথাও স্মরণ করা উচিত। এই কবিও যে বীণাখানি লইয়া বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে বীণাখানিতে প্রথমেই অগ্নিসংযোগ করিয়া লইয়াছিলেন।

এই 'অগ্নিবীণা'র গান শেষ করিয়া আবার যে বাঁশীটি লইয়া আসিলেন তাহার সুরের সঙ্গেও তিনি বিষ মিশাইয়া লইয়াছিলেন। এই 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী'র সহিত কবির 'ভাঙার গান', 'প্রলয় শিখা' 'সর্বহারা', 'ফণী-মনসা', 'রিক্তের বেদন', প্রভৃতি নামগুলি মিলাইয়া লইলে এই নামগুলির মধ্য দিয়াই একটা কবিধর্মের সাধারণ পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করি। তাঁহার পরিচালিত পত্রিকার নামও ছিল, 'ধূমকেতু'। অবশ্য ইহার সঙ্গে 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধুহিন্দোল', 'ঝিঙে ফুল' প্রভৃতির কথাও একেবারে ভুলিয়া যাইতেছি না। তাঁহার কবিতায় তাণ্ডব ও লাস্য পাশাপাশিই স্থান পাইয়াছে।

১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' কাজি নজরুল ইস্‌লামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। নিন্দা-প্রশংসায় কবিতাটি বাঙলা-সাহিত্যে আজ সর্বজনখ্যাত। কবিতাটির মধ্যে সংক্ষেপে তিনটি জিনিস লক্ষণীয়,—প্রথমতঃ সর্ববিজয়ী মানুষের অভ্রভেদী মহিমা—যাহা

মহা বিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ছেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ভেদিয়া

বিশ্ব-বিধাত্রীর চির-বিস্ময় রূপে জাগিয়া উঠিয়াছে,—এবং যাহার 'ললাটে রুদ্র ভগবান্ জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর'।

ইহাই নূতন যুগের মানবতা-বোধ, যে-যুগে মানুষ অনুভব করিয়াছে—

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির দুর্জয়,
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য!

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে পারি, মানুষের এই 'জগদীশ্বর-ঈশ্বর' রূপেরই একটি অংশ হইল—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম, উদ্দাম, আমি ধন্যি।

ইহাই হইল মানব-স্তুতির সহিত অবিনাভাবে বদ্ধ প্রেম-স্তুতি। কবিতাটির ভিতরে তৃতীয়তঃ লক্ষণীয়—

মহা- বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

ইহাই নব মানবতা-বোধের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই তিনটি উপাদানকেই তাহা হইলে মোটামুটিভাবে এই কালের

যুগধর্মের মধ্যে প্রধান করিয়া দেখিতে পাইতেছি। আরও একটি তথ্য আমরা বেশ লক্ষ্য করিতে পারি,—যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল ইস্‌লাম এই তিন কবির কাব্যের মধ্যেই রুদ্রদেবতা মহাদেব বার বার তাঁহার বিচিত্র ভৈরবমূর্তিতে পদক্ষেপ করিয়াছেন। কবিধর্মের দিক্ হইতে তথ্যটিকে আমি বিশেষ লক্ষণীয় বলিয়া মনে করি।

কাজি নজরুল ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে বসিয়া যে 'আগমনী'র (অগ্নিবীণা) গান করিয়াছেন তাহা কাহার আগমনী?

নাই দানব
নাই অসুর—
চাই নে সুর,
চাই মানব!—

কবি তাঁহার যুগের আকাশে যে 'ধূমকেতু'র আবির্ভাব সদর্পে, সাগ্রহে এবং সানন্দে ঘোষণা করিয়াছেন এই ধূমকেতু হইল সেই ধূমকেতু যাহা মানুষের জীবনের দীর্ঘ ইতিহাসে যুগে যুগে আসিয়াছে—এবং মহাবিপ্লবের জন্য আজও আবার আসিয়াছে—যাহা 'স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু'।—

সাত সাতশ' নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে!
মম ধূম-কুণ্ডলী ক'রেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে!
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ,
আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ হাহাকার—
আর মর্ত্যে সাহারা-গোবী-ছাপ
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ!

এখানকার শুধু ভাব নয়, ভাষার সহিতও কবি যতীন্দ্রনাথের সহিত আশ্চর্য মিল লক্ষণীয়। ধূমকেতুর বড় পরিচয়ই বার বার করিয়া পাইতেছি—'এই স্রষ্টার শনি'। যতীন্দ্রনাথের মধ্যে এবং মোহিতলালের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে 'বিদ্রোহী শয়তান'কে, তাহাকেই লক্ষ্য করি কাজি নজরুলের মধ্যেও। তফাৎ শুধু এইখানে—যতীন্দ্রনাথ যাঁহাকে শুধু বিদ্রূপ করিয়াছেন, কাজি তাঁহার বুকে সোজা হাতুড়ি মারিয়াছেন!

ঐ বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়িয়েছিল রে হাত
মম অগ্নি-দাহনে জ্ব'লে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ!
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে, ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি।
আমি জানি জানি ঐ ভূয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তা'ও!
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও!

ইহারই আবার একটু পরে দেখি—

পঞ্জর মম খর্পরে জ্বলে নিদারুণ যেই বৈশ্বানর
শোন্ রে মর, শোন্ অমর!—
সে যে তোদের ঐ বিশ্বপিতার চিতা!

এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জান কি তা?
কি বল? কি বল? ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা!
হো হো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালায়েছি বুকে চিতা।

কবির 'অগ্নিবীণা'র মধ্যে যে-সুর, 'বিষের বাঁশী'র (১৩৩১) মধ্যেও সেই সুর নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে। 'বিষের বাঁশী'র 'আত্মশক্তি' কবিতায় কবির আহ্বান—

তুরীয়ানন্দে ঘোষ সে আজ
'আমি আছি' বাণী বিশ্ব-মাঝ,
পুরুষ-রাজ !
সেই-স্বরাজ !
জাগ্রত কর নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মরুবাসীর ;
আত্ম-ভীতু এ অচেতন-চিতে জাগো 'আমি-স্বামী' নাঙ্গা-শির ॥

এই বইয়ের 'অভিশাপ' কবিতায় দেখি,—

প্রথম যেদিন আপনার মাঝে আপনি জাগিনু আমি,
চীৎকার করি কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎ-স্বামী !

কবির শোষণ-বিরোধী তীব্র মনোভাব এবং সাম্যবাদের আদর্শে ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে নানাভাবে তাঁহার 'সর্বহারা'র (১৩৩৩) কবিতাগুলির মধ্যে।

॥ ১৭ ॥

যতীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং কাজি নজরুল ইস্‌লামের কবিতার যে আলোচনা করিলাম তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে পারি,—যে যে বিশেষ ধর্মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বাঙলা কবিতায় একটি রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক যুগের ধারণা করি সেই সেই ধর্মের কিছু কিছু উদ্বোধ প্রথমে দেখি

সমাজসচেতন কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই। যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল ইস্‌লামের কবিতায় তাহারই প্রথম প্রতিষ্ঠা বলিয়া আমি এই কবিত্রয়কে আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই। ভাবের সহিত ভাষা-প্রয়োগের দিক হইতেও ইঁহাদের মধ্যে একটা সাধারণ যোগ লক্ষ্য করিতে পারি; ভাষা ব্যবহারে ইঁহারা কেহই গতানুগতিক নহেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রবর্তিত অভিনবত্ব বাঙলা-ভাষার মূল প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়া দেয় নাই, তখন পর্যন্তও বাঙলা কবিতার ভাষা খাঁটি বাঙলাই রহিয়া গিয়াছে,—নূতন শক্তি ও ঐশ্বর্য তাহার স্বধর্মকে আবৃত বা বিকৃত করিতে পারে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি,—বাঙলা কবিতার ভাষার আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ে, যখন যুদ্ধোত্তর ইংরেজী কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাঙলা কবিতার ভাষা লইয়াও প্রবল ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হইল। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিদের মধ্যেও একজন কবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যিনি কবিতা-নির্মিতির আদর্শে ইংরেজী কবিতার কিছু প্রভাব গ্রহণ করিলেও, ভাষা-প্রয়োগে বাঙলার বাঙলাত্বের কোনও হানি ঘটান নাই,—ইনি হইলেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবি অজিত দত্তকেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ একটা অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত আছে যে 'কল্লোল' পত্রিকার আরম্ভ হইতে বাঙলা কবিতার আধুনিক ধারার প্রবর্তন। 'কল্লোলে'র সহিত হাত মিলাইয়াছিল

'কালি-কলম', এবং প্রবাস হইতে প্রকাশিত 'উত্তরা'। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, 'কল্লোল' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩৩০ সালে। যতীন্দ্রনাথের, মোহিত-লালের এবং নজরুল ইস্‌লামের প্রথম কাব্য ইহার পূর্বেই লিখিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জন্যই আমি এই তিনজন কবিকেই নবধারার বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়ের কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। ১৩৩০ সালের পর হইতে নবধারার বাঙলা কবিতায় যাঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য তাঁহারা হইলেন জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কবি জীবনা-নন্দের প্রথম কবিতা বই 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সনে; কিন্তু তিনি কবিতা ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সনে—ইঁহারও কবিতা লেখা চলিতেছিল কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সনে, অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' ১৯৩০ সনে, বিষ্ণু দে'র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ১৯৩৩ সনে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী'র প্রকাশ ১৯৩০ সনে। এই কবিগোষ্ঠীকেই আধুনিক বাঙলা কবিতার দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কবি বলিয়া অভিহিত করা চলে।

এই দ্বিতীয় কবিগণের ভিতরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার সহিতই পূর্বগোষ্ঠীর কবিতার যোগ ভাষা ও ভাব উভয় দিক্ হইতেই বেশ ঘনিষ্ঠ, বিশেষ করিয়া তাঁহার 'প্রথমা'য় প্রকাশিত

কবিতাগুলির সহিত। নূতন যুগের সংশয়-সন্দেহ, জীবনের প্রতিপদে জিজ্ঞাসা—যুক্তির দাবী—বিদ্রোহ—বিক্ষোভ—ইহা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও স্পষ্ট এবং অকপট। ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি বিধাতাকে যে প্রণাম জানাইয়াছেন, তাহা মুক্তসংশয় ভক্তের প্রণাম নয়—

জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার!
লহ এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।
ক্রীতদাস মানবের মৃত্যু-পুর হ'তে
আজি কমণ্ডলু ভরি'
আনিয়াছি স্বেদ ও শোণিত,
—পূত পূজা-বারি।
আনিয়াছি পুঞ্জিত কালিমা
লেপিতে ললাটে তব চন্দন বিহনে,—
পূজা তব আজি বিপরীত!

বিশ্বজোড়া হাহাকারে বাজে আজ নব-স্তোত্র তব,
অভিনব স্তুতি;
চিতাগ্নিতে অপরূপ আরতি তোমার,
ভস্মশেষে নৈবেদ্য নূতন।
(প্রথমা, ২য় সং, পৃঃ ১৫)

আমরা পূর্বে নানা প্রসঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি, এই বিদ্রোহ যাহার এ-পিঠ তাহারই ও-পিঠ হইল মানুষের প্রতিষ্ঠায়—অমূর্ত তাত্ত্বিক মানবতার প্রতিষ্ঠায় নয়—মূর্ত গোটা মানুষের

প্রতিষ্ঠায়। কথাটা অতি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতায়—

মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে!
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।
মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হ'ল—
এবার চাই মানুষের মানে—নইল যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না!

* * *

মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর
মোছা চলেছে? (প্রথমা, পৃঃ ৬৩)

যে-যুগে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে-যুগের দুইটি দিকই তাঁহার কবিতায় প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সে-যুগের দুর্বার গতি—তাহার নির্ভীকতা এবং অনন্ত প্রসারোন্মুখতা—আবিষ্কার-অভিযানের—পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিত্য-নূতন নেশা ও কর্মবিপুলতা কবি-মনকে 'ঝঞ্ঝা-মদ-রসে মত্ত' করিয়া তুলিয়াছে।—

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির;

প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির !
বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী ;
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা ;
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে ক্ষুরে
আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা !

(প্রথমা. পৃঃ ৩)

অপর দিকে চারিদিকে ছড়ান জীবনের একটি ক্ষুদ্র এবং পঙ্কক্লিন্ন রূপ কবিকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে,—এবং এই ক্লিন্নতার কারণ স্বরূপে তিনি দেখিয়াছেন 'সর্ব মানবের পাপ'। এই পাপে—

আজ
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর ;
আর কাঁদে পাতকীর বুকে
ভগবান প্রেমের কাঙ্গাল !
—এক দিন মার কোলে জন্ম ল'য়ে, শিরে ল'য়ে মার স্নেহাশিস,
আর দিন সুন্দর আমার
স্বার্থে লোভে ক্রূরতায়, হিংসায় প্রচণ্ড লালসায়

কুৎসিত, জঘন্য, ভয়ঙ্কর মানবের পুরী হতে,
পঙ্কমাখা, শীর্ণ, ক্ষীণ, হিংসায় বিক্ষত,
কদাকার লালসা-জর্জর,
বিদায় লইয়া যান,
একটি করুণ শুধু রাখি দীর্ঘশ্বাস। (প্রথমা, পৃঃ ২১)

যতীন্দ্রনাথের মত প্রেমেন্দ্র মিত্রও দু'একটি কবিতায় জীবনের দুঃখ-ক্রন্দনকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। বিধাতা মানব-সৃষ্টির পূর্বে যেন আনন্দের স্পন্দহীন নিঃসত্তার মধ্যেই নিলীন ছিলেন—নিরন্তর ক্রন্দনের স্পন্দনে জাগ্রত হইয়া উঠিবার জন্যই যেন মানব-সৃষ্টি।—

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে
আপনাতে আপনি মগন,
আনন্দের স্পন্দহীন নিশ্চল গগনে :
তাই বুঝি সৃজিলে আমারে
কাঁদিবার লাগি।
কাঁদিবার সাধ,
তাই তুমি মোর সাথে ছোট হবে, লুটাবে ধূলায়,
আঘাত করিবে আপনারে,—মূঢ় অবিশ্বাসে,
আবার ভাসিবে আঁখিনীরে।

... ...

নিখিল ভুবন ভরি' খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা
অনাদি অতীত কাল ধরি'।

বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি,
সে খেলায় মাতি
কোথায় নেমেছ তুমি মোর সাথে,–
জঘন্য পাপের মাঝে, বীভৎস ক্ষুধায়,
অসহ্য গ্লানির পঙ্কে,
পূতি-গন্ধভরা, অচিন্ত্য কলুষে হীনতায়।

মোর সাথে পাপী হলে
বুকে তুলে নিলে মোর তাপ ;
মোর সাথে দুর্বহ ব্যথার বোঝা স্কন্ধে নিলে তুলে,
পিশাচ সেজেছ মোর সাথে,
কুটিল, নির্মম, ক্রূর, নৃশংস, নির্দয়।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, আর বসে রই
স্তব্ধ হ'য়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে—
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত।
(প্রথমা, পৃঃ ২৪-২৫)

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি',
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছো মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান॥

মিলাইয়া পড়িলেই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রও তৎকালীন জীবনের এই দুঃখম ক্লিন্নতার মূলে দেখিয়াছেন মানুষের একটা সর্বগ্রাসী পৈশাচি লালসার প্রচণ্ডতা—যাহা মানুষের শুভবুদ্ধিকে একটু এক করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রৌ বয়স হইতে বহু লেখায় মানুষের এই লালসার অশুভ প্রচণ্ডতা প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং এই লালস প্রাবল্যের মধ্যেই যে মানুষের বর্তমান সভ্যতার সর্বাপেক্ষ ভয়াবহ সঙ্কট সে বিষয়ে স্পষ্ট সাবধানবাণী উচ্চারণ করি গিয়াছেন। এই অনিয়ন্ত্রিত লালসার অনিবার্য পরিণ শোষণে—সেই শোষণই মানুষের সকল দুর্গতির মূলে। রবী নাথ এই লালসা-জাত শোষণ-স্পৃহার ভিতর দিয়া সমগ্র মান সভ্যতা যে একটা অবাঞ্ছিত সঙ্কটময় পরিস্থিতির দি

আগাইয়া চলিয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া তাঁহার জীবনের শেষের দিকে গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন। তবে তিনি বিশ্বময় যে একটা শোষণ-স্পৃহা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপক রূপই তাঁহার চোখে দেখা দিয়াছিল,—অর্থাৎ দুর্বল অসহায় জাতিগুলি যে কি রূপে অন্যায়ভাবে স্বৈরাচারী লোভী প্রবল জাতিগুলি দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হইতেছে তাহাই তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল; কিন্তু সেই শোষণের ফল সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে—প্রত্যেকটি ব্যক্তিজীবনের মধ্যে যে বেদনা, লাঞ্ছনা এবং ক্রন্দনময় ক্লিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে নাই। সমাজজীবনের সকল স্তরে এবং সকল আনাচে-কানাচে এই শোষণ যে রূপ ধারণ করিতেছিল তাহার বিক্ষোভ এই যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিতেছিল। ইঁহাদের কবিতার ভাঁজে ভাঁজে তাই এই শোষিত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িতদের জন্য বেদনা ও দরদ মাখা রহিয়াছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই একটি কবিতায় বলিয়াছেন,—

আজো যারা আসে পিছে,
অনাগত পৃথিবীর ভ্রূণ-শিশু যত,
তারা যেন পৃথিবীরে এমন করিয়া নাহি দেখে।
আজ যারা বাসিতে পেলো না ভালো,
আমাদের চারিপাশে আজ যত প্রাণ,
অন্যায় দারিদ্র্যে আর হীন লালসায়

অন্ধ পঙ্গু হ'য়ে কাঁদে অশ্রুজলে উষ্ণ অভিশাপ,
তাহাদের সকল বেদনা
আজিকার মানবের যত গ্লানি পাপ,
আমাদের সাথে যেন মোরা সব
মুছে লয়ে যাই। (প্রথমা, পৃঃ ২৭-২৮)

শোষণবিরোধী মনোভাব লইয়া এবং মেহনতী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-দরদ লইয়া প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিন কবিতা লিখিয়াছিলেন,—

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের !
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই ! (ঐ. পৃঃ ৬)

কথাটি এত স্পষ্ট করিয়া এই-ই প্রথম বলা হইয়াছিল বলিয়া কথাটির প্রতিধ্বনি দেখা দিয়াছিল সঙ্গে সঙ্গেই এবং ব্যাপকভাবে। সংস্কারবিহীনভাবে রক্তমাংসের মানুষকে সর্বরূপে শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কোনও অবস্থানেই জীবনকে বরণ করিয়া আস্বাদ করিতে কবির আটকায় নাই। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে মনে করিতে পারিয়াছিলেন,—

জন্ম ল'ব হয়ত সে
কোন্ ঊর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে

ডুবারীর ঘরে,
কিংবা কোন্ জীর্ণ ঘরে কোন্ বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে
দীনা কোন্ পথের নটীর কোলে ;
কিংবা—কোথা কিছু নাহি জানি ! (প্রথমা, পৃঃ ৪২)

ঐশী চেতনার অভাবে এই যুগের অন্যান্য কবিদের ন্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যেও মোক্ষ-মুক্তিতে বিরক্তি ছাড়া কোনও আসক্তি দেখিতে পাই না। সমস্ত তত্ত্বের অনভিপ্রেত আবরণ হইতে জীবনকে মুক্ত করিয়া তাজা জীবনরস পানেই হইল ইহাদের আগ্রহ। তাই দেখি—

যখের কড়ি আগ্‌লে আছিস্ মোক্ষ-আশায় মূর্খ কে ?
অর্ঘ্য দে !
এই দেহ তোর দেবতা শুধু,
দিন দুয়েকের স্বর্গ রে !
অর্ঘ্য দে !
মর দেহের চেয়ে মূর্খ, মোক্ষ নয় মহার্ঘ রে !
অর্ঘ্য দে।
মৃত্যু শাসায়, শুন্‌তে কি পাস্ ?
দেখ্‌তে কি পাস্, শ্মশান পাতা সকল ঠাঁই,
বিশ্ব জুড়ে চিরটা কাল কালের হাতের নেই কামাই !
ওরে অন্ধ, ওরে হতাশ !
লুট করে নে যেথায় যা পাস্,
আকাশ বাতাস,

প্রেমের প্রকাশ,
নারীর দেহে রূপের বিকাশ,
যেথায় যা পাস্।
... ...
দিনের শেষে সব সমান, সব সমান!
পুঁথির পাতায় ধাপ্পাবাজি, পরকালের সব প্রমাণ।
(ঐ, পৃঃ ৫৩-৫৫)

আমরা যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল প্রভৃতি রচিত কবিতার যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি তাহার ভিতর হইতে রবীন্দ্রোত্তর যুগের গোড়ার দিক্‌কার এই সকল কবিতার ভিতরে প্রকাশিত কতগুলি সাধারণ ধর্ম লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ, দৈবে —বা জড়জগতের পিছনে কোনও একক চেতন-সত্তায় অবিশ্বাস বা ঔদাসীন্য। দ্বিতীয়তঃ, দৈবকে অপসারণ করিয়া সেখানে সর্বাতিশয়ী মানবতার প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়তঃ, মানবতাব প্রতিষ্ঠার ফলে মানবতায় পরম শ্রদ্ধাহেতু কঠোর শোষণ-বিরোধিতা। চতুর্থতঃ, ক্রম-অপক্ষীয়মাণ অধ্যাত্ম-বোধেব শূন্যস্থানকে ক্রমবর্ধমান প্রেমবোধের দ্বারা পূর্ণ করা। পঞ্চমতঃ, ভাবপ্রাবল্যের স্থানে বুদ্ধির প্রাধান্য- চিত্তের দ্রুতি অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তির প্রতি আকর্ষণাধিক্য। যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ইহার সহিত যুক্ত করিতে পারি একটি ষষ্ঠ ধর্ম,—তাহা কবিতার নির্মিতি বিষয়ে আত্ম-সচেতনতা। আমরা যদি পরবর্তী আধুনিক কবিতার আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব, বিভিন্ন শ্রেণীর কবির কবিতার ভিতর দিয়া এই লক্ষণগুলিই নানাভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। আধ্যাত্মিকতায় অবিশ্বাস, সংশয় বা ঔদাসীন্য সকল রবীন্দ্রোত্তর কবিতারই সাধারণ লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; দৈবের স্থানে সর্বাতিশয়ী মানবতার প্রতিষ্ঠাকেও আমরা সাধারণ ধর্ম

বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু এ-যুগের অরূপ-বিমুখ রূপাশ্রয়ী কবিমন নিজেকে কাব্যের মধ্য দিয়া দুইভাবে প্রকাশ করিয়াছে,—আধ্যাত্মিকতার স্থান কোনও স্থলে গ্রহণ করিয়াছে বাস্তব প্রেম—সে প্রেমকে আত্মা-পরমাত্মার ছোঁওয়া বাঁচাইয়া একান্তভাবে বিশুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য একান্তভাবেই দেহের সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে; ইহারই একটি পরিণতি দেখা দিয়াছে কাব্যানন্দকে ভোগানন্দের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাদনাস্বাদ অপেক্ষা মোদনাস্বাদের প্রতি আকর্ষণে। অন্যক্ষেত্রে আবার অধ্যাত্মবোধের স্থান অধিকার করিয়াছে একটা তীব্র সমাজবোধ; সেই সমাজবোধের পরিণতি একদিকে সর্বপ্রকার কৃত্রিম ভেদ-বিরোধী মনোভাবে এবং নিখিল মানবের সহিত অসীম সহানুভূতিতে; একটি বিশেষ রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই প্রবণতাই দেখা দিয়াছে অন্যজাতীয় কবিতায়—যাহার মূল মন্ত্র হইল একটি বিশ্ববিপ্লবের দ্বারা সর্ববিধ শোষণের মূল কারণ শ্রেণী-বৈষম্যকে দূর করিয়া একটি শ্রেণীহীন সুস্থ মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এইখানেই আবার অতি প্রাসঙ্গিকভাবে এবং সঙ্গতভাবে একটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে,—উপরে যে সকল লক্ষণকে 'রবীন্দ্রোত্তর' কবিতার লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিলাম ঐ সকল লক্ষণের কি সত্য সত্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে অত্যন্তাভাব? শীতল-সলিল এবং মলয় সমীরের ধর্মই রবীন্দ্র-নাথের কবিধর্ম এ কথা একান্ত অশ্রদ্ধেয়। রবীন্দ্রনাথের বার

বার যে স্বীকৃতি আমরা দেখিয়াছি যে, তেজের ঘনীভূত বিগ্রহ সূর্য হইতেই কবির দীক্ষা—অগ্নিমন্ত্রে ছিল এই দীক্ষা—রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে এ-কথাটা কোনও ভুয়া কথা ছিল না—ইহা ছিল তাঁহার কবি-জীবনের একটা গভীর কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুঁজিলে এই অগ্নিমন্ত্রের কবিতা নেহাৎ কম হইবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে মানবতাবোধের একান্ত অভাব—একথাও স্বীকার্য নয়। মানবতাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এ জাতীয় কবিতাও যেমন প্রচুর – মানবতাকে চরমমূল্য দানে মহিমান্বিত করিয়াছে এইরূপ কবিতাও প্রচুর। কৃষাণ-মজুরের প্রতি শ্রদ্ধা—তাহাদের সহিত অন্তরঙ্গ যোগের অনেক কবিতাও রবীন্দ্রনাথ যখন রচনা করিয়াছেন তখন পর্যন্ত এ-জাতীয় কবিতা বাঙলা-সাহিত্যে সুলভ ছিল না। ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই 'দোদুল-দোলে'র কবি এমন কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত একান্ত অপরিচিত লোক ব্যতীত কেহ বলিবেন বলিয়া আশা করি না। হৃদয়ের দ্রুতি অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তির যে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 'বলাকা' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের দিক্‌কার গদ্য-ছন্দে রচিত কবিতাগুলিতে তাহার শুধু প্রবর্তনা নয়—তাহার প্রতিষ্ঠা। এ-ক্ষেত্রে 'তর-তম'ত্বের পার্থক্যকে যদি স্বীকার করিয়া লওয়াও যায়—তবে তাহা দ্বারা স্পষ্ট কোনও ধর্মভেদ এবং তজ্জাত শ্রেণীভেদ আদৌ স্বীকার্য কি?

কিন্তু তথাপি আমি যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল প্রভৃতির কবিতার ভিতর দিয়া বাঙলা কবিতার একটা

'রবীন্দ্রোত্তর' যুগের সূচনাকে ঐতিহাসিকভাবেই স্বীকার করি। কারণ কাব্য-লক্ষণের বহির্বিস্তারের দিক হইতে হয়ত তর্কের অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে সংশয় নাই। 'রবীন্দ্রোত্তর' কবিতার লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে পাওয়া গেলেও কোথায় ইহা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—কোথায় ইহা অপ্রধান, ইহা লইয়া তর্ক এবং বিচার চলিতে পারে—কিন্তু আমার মনে হয় বহু পার্থক্যেরই মূলে হইল একটি কেন্দ্রগত পার্থক্য। এই কেন্দ্রীয় পার্থক্যটি কি?

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির শেষধারক। শেষধারক কথাটায় কেহ অতিভাষণের অপরাধ গ্রহণ করিলে বলিতে পারি, আমাদের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতি কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে এইখানে একটা স্পষ্ট ছেদ লাভ করিয়াছে। এ-কথা দ্বারা আমি এমন কথা বলিতেছি না যে অধ্যাত্মবিশ্বাস লইয়া বাঙলায় আর কোনও কবিতা রচনা হইতেছে না,—বা আধুনিক কবি যাঁহারা তাঁহারা সকলেই একান্ত বিশুদ্ধভাবে নাস্তিক—অর্থাৎ একটা মঙ্গলময় চেতন-সত্যে অবিশ্বাসী; কিন্তু একটি সূক্ষ্ম-গভীর অধ্যাত্মবোধ রবীন্দ্র-নাথের জীবনধর্ম তথা কবিধর্মকে যেমন করিয়া বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহা আর দেখা যাইতেছে না। একদিক্ হইতে বলা যায়, রবীন্দ্রসাহিত্য একটি 'সবপেয়েছির দেশ'; সুতরাং তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে এই জিনিস আছে, আর এই জিনিস নাই, এইরূপ ভাগ করা বা ঘোষণা করা শক্ত। কিন্তু যত রকমের যত জিনিস থাক্, তাহার কোনও কিছুকে অস্বীকার

না করিয়াও দেখিতেছি শেষ পর্যন্ত, 'তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি',—এবং কবির 'সকল রসের ধারা' একটি সর্বনিলয় 'তোমাতে' হারা হইয়া গিয়াছে। ইহার পিছনকার সত্য হইল সমগ্র ব্যক্তিজীবন এবং বিশ্বজীবনের অর্থকে একটি পরম সচ্চিদানন্দের মধ্যে নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করা। জীবনের 'আসব' যে সৌন্দর্য এবং প্রেম তাহাকেও কবি তাই সেই এক অনন্তের আভাস বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সচ্চিদানন্দের প্রতি সহজাত বিশ্বাসের ঘাট্‌তিই রবীন্দ্রকাব্য-ধারার পাশেই একটি 'রবীন্দ্রোত্তর' ধারাকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের একটি সহজাত অটল বিশ্বাস—একটি অধ্যাত্মবোধের দ্বারা বাস্তব জীবন 'বাসিত' হইয়া আছে—চন্দনের দ্বারা বন যেমন করিয়া বাসিত হইয়া থাকে। যতীন্দ্র-নাথ সেনগুপ্ত হইতে দুর্বার ঝোঁক্‌ দেখিতে পাই বিপরীত দিকে; অধ্যাত্মবোধের দ্বারা মানুষের বাস্তব জীবন আচ্ছন্ন, লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট! অধ্যাত্মবিশ্বাস তাই কবির মনের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-রূপে বা প্রচ্ছন্নভাবে থাক আর না-ই থাক, সাহিত্যের সতেজ প্রেরণারূপে সে আর দেখা দিতে পারে নাই। আশপাশের সকল আশ্রয়ের ভরসা চলিয়া গেলে হাতের কাছের জিনিসটাকেই মানুষ যেমন উগ্র আগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরে—এই সময় হইতে রক্তমাংসের দেহপ্রাণ এবং সেই দেহপ্রাণ হইতে জাত মনকেই উগ্র আগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরিবার ঝোঁক তাই আমাদের সাহিত্যে ক্রম-প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই জীবনাগ্রহের ফলে আমাদের ব্যগ্র বাহু স্বাভাবিকভাবেই

প্রসারিত হইতেছে জীবনের সকল স্তরে—সকল আনাচে কানাচে। জীবনের যে অংশটা ছিল প্রত্যক্ষে নিষ্পিষ্ট—বা পরোক্ষে অবজ্ঞাত—অতি স্বাভাবিকভাবে সেই অংশটাই ক্রমে সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্য অসীম ছাড়িয়া যত সসীমে নামিয়া আসিয়াছে—জীবনাতীতকে ছাড়িয়া জীবনের নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইতেছে—ততই জীবনের সুখদুঃখ, চিন্তাভাবনা, দ্বন্দ্ব-সমস্যাই সাহিত্যের সামগ্রীত্বে উন্নীত হইতেছে। কবিচিত্তের অসীম দরদই 'পরশ পাথর',- সত্যকার দরদের স্পর্শ যেখানে লাগিতেছে সেখানে ছোটবড়, তুচ্ছ-ক্ষুদ্র সকলই সোনা হইয়া উঠিতেছে;—সে স্পর্শ যেখানে নাই সেখানে শুধু জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

মানুষের শিল্পদর্শন বলিয়া পৃথক্ কোনও দর্শন নাই—উহা জীবনদর্শনের শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগমাত্র। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন হইতেই বিংশ শতাব্দীর এই কবিগোষ্ঠীর জীবনদর্শন পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, সে ক্ষেত্রে শিল্পদর্শনের এবং শিল্পায়নের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন হইতে পারে, আধুনিক যুগে অধ্যাত্ম-সত্তায় এই ব্যাপক অবিশ্বাস, সংশয়, ঔদাসীন্যের কারণ কি? উত্তরে ক্রমবর্ধমান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং যুক্তিনিষ্ঠ দর্শনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এত বড় একটা মৌলিক পরিবর্তনের পিছনে আরও সক্রিয় কারণ থাকিবার কথা। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই এই সক্রিয় কারণকে আধুনিক জীবনে শুভবুদ্ধির ক্রমাবক্ষয় এবং একটা অতৃপ্ত উন্মাদ লালসার উদগ্র লীলা নাম

দওয়া যাইতে পারে। আমরা কিছু পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রচণ্ড লালসাকেই রবীন্দ্রনাথ মহাপাপ বলিয়া বারংবার ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। জগদ্ব্যাপী এই যে মহাপাপ ইহা একটু একটু করিয়া ধূমায়িত হইয়া সর্বধ্বংসী অগ্ন্যুদ্‌গীরণের রূপে একদিন ইউরোপের বুকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধ রূপে। সেই পাপ-বিক্রিয়া ইউ-রোপের জীবনকে শুধু ক্ষত-বিক্ষত করে নাই—করিয়াছে সামগ্রিকভাবে বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয়ের প্রভাব আমরা এদেশে প্রত্যক্ষে লাভ বেশি করি নাই—কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব কাজ করিয়াছে অনেকভাবে। এই লালসার মহাপাপ আমাদের দেশে কোনও রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ রূপে দেখা দিল না বটে, কিন্তু ইহার ঘৃণ্য সর্বশোষণ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমাদেরও বৃহত্তর সমাজ-দেহের স্তরে স্তরে। এই জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া যতীন্দ্রনাথ, নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সকলের ভিতরেই দেখিতে পাই তীব্র শোষণ-বিরোধী মতবাদ—এক মোহিতলালেই ছিল তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথ যাহাকে আধুনিক যুগের প্রচণ্ড লালসার মহাপাপ বলিয়াছেন, মার্ক্সপন্থীয়গণ তাহাকেই বলিবেন ধনতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদের মহাপাপ। এই পুঁজিবাদের চরম উন্নতি ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে; তাহার পরে শুরু হইয়াছে পুঁজিবাদের আত্ম-বিরোধী এবং আত্মঘাতী আবর্তন—ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধে তাহারই আত্মপ্রকাশ।

পুঁজিবাদের চরম প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদে—এই সাম্রাজ্যবাদই অনিবার্য করিয়া তুলিল আত্মঘাতী মহাযুদ্ধ—সমগ্র সমাজ-জীবনের দারুণ বিপর্যয়। তাহার ফলে জগৎ হইতে সাম্রাজ্যবাদের বিনাশেরই যে সম্ভাবনা প্রকাশ পাইল তাহা নহে,—সমগ্র জীবনে মানুষের দেহে-প্রাণে-মনে দেখা দিল একটা লণ্ডভণ্ড জীবনের এবং জগতের যে ন্যায়-বিধান, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সৌষম্য-সৌন্দর্য, সুখ-শান্তিকে লইয়া একটি মঙ্গলময় চেতন অধ্যাত্মসত্যে আমাদের বিশ্বাস—বাস্তব জগৎ এবং জীবন হইতে তাহা সকলই যখন চলিয়া গেল তখন আমাদের অধ্যাত্মবিশ্বাস আর দাঁড়াইয়া থাকিবে কি করিয়া? জীবনের বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে যেটুকু নিয়ম-বিধান সাদা চোখে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম বিজ্ঞান তাহার নিত্য নূতন আবিষ্কারে তাহাও দিতেছে ওলটপালট করিয়া। যুক্তিবাদী দর্শনও তখন বলিয়া উঠিয়াছে,—জ্ঞানকেও নিরালম্ব না রাখিয়া বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত কর। ফলে অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের উপর সর্বদিক হইতেই পড়িতে লাগিল আঘাত।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই ক্রমবর্ধমান লালসা এবং তজ্জাত শোষণবুদ্ধির মহাপাপ বিংশ শতাব্দীতে আমাদিগকেও তিক্ত-বিরক্ত এবং উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল; তাহার ফলে জীবনের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন দেখা দিল জাতিগত ভাবেও ব্যক্তিগত ভাবেও। জাতিগত ভাবে আমরা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া ক্রমেই বিপর্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলাম, —আবার বাহিরে উৎপীড়ন উপদ্রবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-

জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেও নিজেকে উৎপীড়িত এবং উপদ্রুত বোধ করিতেছিলাম ব্যক্তিগত সহস্র তিক্ত অভিজ্ঞতায়। আমাদেরও আস্তে আস্তে মনে হইতে লাগিল, ন্যায়-বিধান, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য-সৌষম্য সবই বোধহয় ভুয়া—একটা সামাজিক ঐতিহ্যরূপে প্রাপ্ত সংস্কারের জের মাত্র। মন ক্রমে ক্রমেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। ইহার সহিত যুক্ত হইতে লাগিল ইউরোপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব—আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরন্তর অধ্যাত্মবিরোধী উস্কানি। এই সকল কারণকে অবলম্বন করিয়া বাঙলাদেশে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে অধ্যাত্মসত্ত্য সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস, সংশয় বা ঔদাসীন্য গড়িয়া উঠিতেছিল মার্ক্সের জড়বাদের তাহার উপরে কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মার্ক্সবাদের প্রভাব বাঙালীর মনে সক্রিয় রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে আরও প্রায় বিশ বছর পর হইতে। এই মার্ক্সবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যে বাঙলা কবিতা রচিত হইতে আরম্ভ করিল, আমরা মোটামুটিভাবে তাহাকেই আধুনিক বাঙলা কবিতার তৃতীয় পর্যায় বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। মোটামুটি ভাবে উনিশ শ' দশ হইতে উনিশ শ' তিরিশ পর্যন্ত সময়কে আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়ের কাল, উনিশ শ' তিরিশ হইতে উনিশ শ' চল্লিশ পর্যন্ত কালকে দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং উনিশ শ' চল্লিশের পরবর্তী কালকে তৃতীয় পর্যায়ের বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে এই-জাতীয় কালবিভাগ সম্বন্ধে আমি বার বারই

বলিয়া আসিয়াছি, ইতিহাসের যুগ-বিভাগে কোথাও কোনও স্পষ্ট. সীমারেখা থাকিতে পারে না—রবীন্দ্রযুগ নিঃশেষে থামিয়া গিয়া যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল প্রভৃতির পর্যায়কে সম্ভব করিয়া তোলে নাই—তাঁহাদের বিরতির পরে জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রদত্তের পর্যায় আরম্ভ হয় নাই—বা এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নিঃশেষ বিরতির পরেই তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় নাই। এ-ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রবণতা-প্রাধান্যের ভিতরে ব্যঞ্জিত ধর্মান্তরের দ্বারাই বিভিন্ন পর্যায় লক্ষিত, ইহা ছাড়া পর্যায়-বিভাগের পিছনে আর কোনও নির্দেশক নাই। যাহাকে বাঙলা কবিতার তৃতীয় পর্যায় বলিলাম, মার্ক্সপ্রদর্শিত নূতন জীবনবাদই যে তাহার একক ধর্ম এ-কথাও আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। উনিশ শ' চল্লিশের পরেও পূর্ববর্তী কবিরা অনেকেই সক্রিয়—একেবারে নূতন যাঁহারা লিখিতেছেন তাঁহারাও সকলেই বিশুদ্ধ মার্ক্স-বাদী নন; তবে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে একটা সাম্যের আদর্শ সর্বক্ষেত্রেই আজ একটা সর্বাতিশয়ী প্রভাব বিস্তার করিতেছে—এ কথাকে অস্বীকার করিতে পারি না।
